নাট্যকার শ্রীমধুসূদন

NATYAKAR SRIMADHUSUDAN

[Sri Madhusudan the Playwright]

BY

Professor Dr. Asutosh Bhattacharyya, M.A,, Ph.D., F.N.A.

First Edition 1968

Price Rs. 8·00 (Rupees Eight only)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতামালা, ১৯৬৭

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নাট্যকার শ্রীমধুসূদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক
জাতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমির রত্নসদস্য (Fellow)
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সাহিত্য প্রকাশ
কলিকাতা চৌত্রিশ

প্রকাশক :
সাহিত্য প্রকাশের পক্ষে
শ্রীমতী সুষমারাণী মিত্র
৩০, সন্তোষ রায় রোড
কলিকাতা-৩৪

প্রথম প্রকাশ :
২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮
[১৭ই ভাদ্র ১৩৭৫]

শ্রীধরণীকান্ত ঘোষ কর্তৃক নিউ লক্ষ্মীশ্রী প্রেস, ১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা ছয় হইতে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিক্রয় কেন্দ্র

দে বুক স্টোর্স
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং
১।১বি, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

লিপিকা
৩০।১, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

নিবেদন

১৯৬০ সনে আমার 'গীতিকবি শ্রীমধুসূদন' নামক গ্রন্থখানি যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে ক্রমে 'মহাকবি শ্রীমধুসূদন' এবং 'নাট্যকার শ্রীমধুসূদন' নামে আরও দুইখানি অনুরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিব। ১৯৬৭ সনে আমার 'মহাকবি শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই ধারাই অনুসরণ করিয়া সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বশেষ গ্রন্থ 'নাট্যকার শ্রীমধুসূদন' আজ প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতে হয়ত আরও বিলম্ব হইত। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ১৯৬৭ সনের গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ জানাইবার জন্য আমি এই সুযোগে এই বিষয়টিই আমার বক্তৃতার বিষয়রূপে নির্বাচন করিয়া লইয়াছিলাম; তাহার ফলেই বইখানি এখন প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইল। নতুবা ইহা কবে প্রকাশিত হইত, কিংবা বর্তমান অবস্থায় আদৌ প্রকাশিত হইত কি না, তাহা বলিতে পারি না।

এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদনের সম্পর্কে যে সামগ্রিক আলোচনা আমার সম্পূর্ণ হইল, তাহা বলিতে পারি না; কারণ, আমি মধুসূদনের সাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়াই আলোচনা করিয়াছি; যে জীবন হইতে এই সাহিত্যের প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহার রস এবং রহস্য সম্পর্কে কিছুই বলি নাই। সেই জন্য তাহা বিশ্লেষণ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে এই তিনখানি গ্রন্থেরই ভূমিকাস্বরূপ একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিবার সঙ্কল্প রহিল। তাহা হইলেই বাংলা সাহিত্যের এই বিরাট প্রতিভা সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা করা সম্ভব হইতে পারিবে।

'নাট্যকার শ্রীমধুসূদন' বইখানির মধ্যে মধুসূদনের নাটক এবং প্রহসনগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নাটক রচনা করিবার মধ্য দিয়াই

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই জন্য যদিও তাঁহার অন্যান্য রচনার তুলনায় তাঁহার নাট্যরচনা যথাযথ সাহিত্যিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি মধুসূদনের প্রতিভার সামগ্রিক বিচারে ইহাদেরও একটি বিশেষ স্থান আছে। বিশেষত যে অল্প সময়ের মধ্যে মধুসূদনের সাহিত্য-সৃষ্টি সীমাবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার কোন রচনাই তাঁহার মৌলিক প্রতিভার স্পর্শ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। সুতরাং মধুসূদনের সাহিত্যিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার নাট্যসাহিত্যকে কিছুতেই অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

বিশেষত বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্য অনুযায়ী ট্রাজিডি, ঐতিহাসিক নাটক এবং সামাজিক প্রহসন এই তিন শ্রেণীর রচনারই প্রবর্তক মধুসূদন। এই বিষয়ে তাঁহারই প্রবর্তিত ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত অনুসরণ করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার নাটক-প্রহসনগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের মধ্যে এমন কি শক্তি ছিল, যাহা এত দীর্ঘকাল যাবৎ জাতির নাটক এবং প্রহসন রচনা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহা গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থে বিষয়গুলির বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

আমার ছাত্র বর্তমানে অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্রের আগ্রহ এবং কর্মতৎপরতায় বইখানি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। আমার ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য এম, এ, ইহার কতকাংশের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার কার্যে আমাকে সাহায্য করিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলা বিভাগ
ঝুলন-পূর্ণিমা, ১৩৭৫ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বিষয়-সূচী

বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

এম. এ., ডি. লিট্ (প্যারিস)

অশেষ শ্রদ্ধাভাজনেষু

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়।
যে সময়, দেশময়, নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম ঘোর হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে, বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু, মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো,
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক্ তব তনয়-নিচয়।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

('শর্মিষ্ঠা নাটক'—প্রস্তাবনা)

নাট্যকার শ্রীমধুসূদন

ভূমিকা

১

মধুসূদনের পূর্ববর্তী বাংলা নাটক

গেরাসেম লেবেডেফ নামক একজন রুষদেশীয় পরিব্রাজক ১৭৯৫ সনে কলিকাতায় বেঙ্গলী থিয়েটার নামে এক রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া তাহাতে যে ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদের অভিনয় করাইয়াছিলেন, তাহাই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা নাটক। ইহার সুদীর্ঘকাল পর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাঙ্গালী কর্তৃক বাংলা নাটক রচিত হয়। তাহা তারাচরণ শিকদার রচিত 'ভদ্রার্জুন' নাটক। তবে এ কথা সত্য, তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকই প্রথম মুদ্রিত নাটক রূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পরিচিত। পূর্বোক্ত গেরাসেম লেবেডেফের নাটক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। রুষদেশে ইহার যে পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল, তাহা হইতে সম্প্রতি ইহা মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং এই নাটকখানি আমাদের ঐতিহাসিক কৌতূহল নিবৃত্ত করিলেও তাহা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারার সঙ্গে কোন যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই।

'ভদ্রার্জুন' নাটকখানিই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য দেখিতে না পাওয়া গেলেও, ইহার কাহিনীর মধ্যে যে নাটকীয় গুণ আছে, তাহা ইহার পরবর্তী অনেক নাটকের মধ্যেই নাই। এই নাটকখানির ভূমিকায় তারাচরণের একটি উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পূর্বে বাংলা ভাষায় মৌলিক কোন নাটক না থাকিলেও সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; তিনি লিখিয়াছেন, 'এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায়

তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে।' কিন্তু এই অনুবাদগুলি মুদ্রিত হইয়া ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, এই উক্তি হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই।

এই নাটকখানি সম্পর্কে তারাচরণ ইহার ভূমিকায় যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন,—'এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা-স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই ; যথা —প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে ; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ Scene সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত Scene শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে।···নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।'

তারাচরণ প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি নাটকের আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যে এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নাটকের ভূমিকা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই বিষয়ে প্রথম বাংলা নাটক রচনার মধ্যেই তারাচরণ যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন,

তাহা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই ; কারণ, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তারাচরণের পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্তও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব বাংলা নাট্য-রচনার উপর প্রায় অব্যাহত ছিল। তারাচরণের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের কোন প্রভাবই নাই, কেবলমাত্র তাঁহার নাটকে 'গদ্য পদ্য রচনা'র কথা যে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও সংস্কৃত-প্রভাবজাত নহে, তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের প্রভাবজাত। অতএব সংস্কৃত নাটক কিংবা দেশীয় যাত্রা ইহাদের উভয়ের প্রভাব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তারাচরণ বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা তারাচরণের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নহে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর কেবলমাত্র যে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় তাহাই নহে, এই বৎসর এ'দেশীয় নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কিত সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধিতা করিয়া বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বিয়োগান্তক নাট্য-রচনার সক্রিয় প্রয়াস দেখা দেয়। এই বৎসর প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত রচিত 'কীর্তি-বিলাস নাটক'খানিই তাহার প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকখানি 'ভদ্রার্জুনে'র কয়েক মাস পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু নাটক হিসাবে 'ভদ্রার্জুন' অপেক্ষা ইহার ত্রুটি অনেক বেশী। ইহার কাহিনীও মৌলিক নহে। লেখক ইংরেজি সাহিত্যে প্রচলিত বিয়োগান্তক নাট্যসমূহের সার্থকতা দেখিতে পাইয়া বাংলা ভাষায়ও তাহা প্রবর্তন করিবার জন্য উৎসাহিত হন এবং তাহারই ফলে তাঁহার 'কীর্তি-বিলাস নাটক' রচিত হয়। কিন্তু তিনি এই দেশের রস-সংস্কার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, সেইজন্য যাহাতে তাঁহার বাংলা ভাষায় এই বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রয়াসকে নিতান্ত পরীক্ষামূলক কার্য (experiment) বলিয়া কেহ মনে না করেন, সেই উদ্দেশ্যে এতদ্দেশীয় ভাষায়ও বিয়োগান্তক নাটকের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করিয়া তিনি এক সুদীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করিয়াছেন। এই ভূমিকাটিতে বাংলায় বিয়োগান্তক নাটক রচনা করিবার জন্য যেমন

একদিক দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, আবার অন্য দিকে তেমনই সমসাময়িক সমাজের রসবোধেরও পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

তাঁহার রচিত এই নাটকের ভূমিকা পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে, লেখকের পাশ্চাত্ত্য নাটকের সঙ্গে পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহারই প্রত্যক্ষ প্রভাব বশত তিনি বাংলা ভাষাতেই পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন—এই পাশ্চাত্ত্য আদর্শ দ্বারা এই দেশের চিরাচরিত রীতিসমূহকে আঘাত করা হইতেছে বলিয়া এই সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি তাঁহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী নান্দী ও নান্দ্যন্তে সূত্রধার দ্বারাই তাঁহার নাটকের সূত্রপাত হইয়াছে। একমাত্র নাট্যকাহিনীর পরিণতি সম্পর্কে তিনি পাশ্চাত্ত্য আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বাংলায় বিয়োগান্তক নাটক রচনা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, অন্যান্য বিষয়ে তিনি সংস্কৃত নাটকের আর কোন দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহা গদ্যপদ্যমিশ্র রচনা এবং ইহাতে একটি সঙ্গীতও যোজিত হইয়াছে। নাট্যকার এখানে ইংরেজি scene কথাটিকে 'অভিনয়' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন; যেমন 'প্রথমাঙ্ক প্রথমাভিনয়,' 'প্রথমাঙ্ক দ্বিতীয়াভিনয়' ইত্যাদি।

ইহার পরই যিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম একাধিক নাটক রচনা করিবার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে হয়, তিনি হরচন্দ্র ঘোষ। প্রায় ২০ বৎসরের ব্যবধানে তিনি মোট চারিখানি নাটক রচনা করেন; ইহাদের মধ্যে দুইখানি অনুবাদ, একখানি বৈদেশিক উপাখ্যানমূলক ইংরেজি রচনার ভিত্তির উপর রচিত ও একখানি মৌলিক। যদিও তাঁহার নাট্যপ্রতিভা তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকার দুই জনের তুলনায় নিম্নস্তরের ছিল, তথাপি বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে বাংলা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিবার সর্বপ্রথম কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। তাঁহার রচিত কোন নাটকের

ভূমিকা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার একখানি নাটকও সমাদর লাভ করে নাই এবং তাঁহার কোন নাটকই অভিনীত হয় নাই ; তথাপি দীর্ঘ ২০ বৎসর যাবৎ যে তিনি নাট্য-রচনার ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নাট্যসাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের পরিচায়ক। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহার নাট্যপ্রীতি ইংরেজি শিক্ষারই ফল। এই শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে যদি একটু প্রতিভার মিশ্রণ হইত তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে সেই যুগেই একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নাট্য-প্রতিভা বলিতে যাহা বুঝায়, হরচন্দ্রের মধ্যে তাহার অভাব ছিল।

হরচন্দ্রের সর্বপ্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়া পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ; মনে হয়, ইহা তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকেরও পূর্ববর্তী রচনা। সেইজন্য হরচন্দ্র তাঁহার পূর্ববর্তী কোন বাংলা নাটকের আদর্শ হইতে ইহাতে সহায়তা লাভ করিতে পারেন নাই, অতএব এক হিসাবে হরচন্দ্রকেও 'বাংলা নাটকের অন্যতম জন্মদাতা' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু হরচন্দ্র যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা কোন দিক দিয়া যদি যথার্থই নাট্যিক গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে এই সম্পর্কে কিছু বলিবার ছিল না। এই বিষয়ে হরচন্দ্রের যে নাটকটি মৌলিক, তাহার গুণ বিচার করিয়া দেখিলে তাহা নাট্যগুণ-বিবর্জিত বলিয়াই মনে হইবে। এই সম্পর্কে তারাচরণের যে গুণ ছিল, হরচন্দ্রের তাহা ছিল না ; অতএব 'বাংলা নাটকের জন্মদাতা'র যে গৌরব, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে তারাচরণেরই প্রাপ্য। বিশেষত একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'ভদ্রার্জুন' মৌলিক রচনা এবং হরচন্দ্রের প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' অনুবাদ মাত্র। 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাটক সেক্সপীয়র রচিত *Merchant of Venice* নাটকের অনুবাদ ; অবশ্য এই সম্পর্কে তিনি কতকটা স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু যে চরিত্রের নামগুলিই তিনি ইংরেজির

পরিবর্তে ভারতীয় রূপে রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে, অনেক স্থলে তিনি 'আখ্যানের মর্ম মাত্র গ্রহণ' করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম তিনটি নাটকেই দুইটি করিয়া ভূমিকা —একটি বাংলায় লিখিত, অপরটি ইংরেজিতে। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ যে তাঁহার নাটকগুলি খুব সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাঁহার নাটকও বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় কোনদিক দিয়াই যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালীর সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের বাস্তব উপকরণ অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রথম বাংলা নাটক রচনার কৃতিত্ব রামনারায়ণ তর্করত্নেরই প্রাপ্য। তিনি বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের একজন সুনিপুণ পর্যবেক্ষক ছিলেন এবং আন্তরিক সহানুভূতি দিয়া ইহার নরনারীর চরিত্রসমূহ চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। লেখকের যে সহানুভূতি-গুণের জন্য তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি সার্থক হয়, রামনারায়ণের মধ্যেও তাহার অস্তিত্ব ছিল। প্রথম বাংলা মৌলিক উপন্যাস তখনও প্রকাশিত হয় নাই, অতএব রামনারায়ণই সর্বপ্রথম আধুনিক বাংলায় সাধারণ বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনকে সাহিত্যে স্থান দান করিবার গৌরব লাভের অধিকারী হইয়াছেন। বাংলা নাটকের যথার্থ ইতিহাস রামনারায়ণ হইতেই সূত্রপাত হইয়াছে।

ইতিপূর্বে যে সকল নাটকের কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের কোনখানিই কোনদিন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। অতএব রামনারায়ণই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী নাট্যকার, যাঁহার রচিত নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার গৌরব লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর জীবন যে নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়া রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া সার্থকভাবে রূপায়িত হইতে পারে, রামনারায়ণই সেই সম্ভাবনা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী কোন বাংলা নাট্যকারেরই প্রভাব পরবর্তীকালে অন্য কাহারও উপর বিস্তৃত হইতে পারে নাই, কিন্তু রামনারায়ণই সর্বপ্রথম নাট্যকার যিনি তাঁহার প্রতিভা দ্বারা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম নাটক রচনার প্রেরণার সৃষ্টি

করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই উদ্বুদ্ধ হইয়া সমসাময়িক কালে অনেকেই নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। নিজের সৃষ্টি দ্বারা অন্যকে যিনি সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহার সৃষ্টির স্বাধীন মূল্য যাহাই হউক না কেন, বৃহত্তর পটভূমিকার মধ্যে আনিয়া বিচার করিলে, তাহার গৌরব অনেক বেশী বলিয়া নির্ধারিত হইতে পারে। রামনারায়ণের নাটকের দোষ-গুণ বিচারের মধ্যেই তাঁহার নাটকের মূল্য বিচার করিতে পারা যায় না; বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনার যে প্রেরণা তিনি দিয়াছিলেন, তাহার ফলাফলের উপরও তাঁহার কৃতিত্ব নির্ভর করিতেছে। অতএব তাঁহার সম্পর্কিত আলোচনায় এই দিকটাও উপেক্ষা করিলে চলিতে পারে না। তাঁহার সর্বাধিক পরিচিত মৌলিক নাটকের নাম 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটক।' ইহা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। এই বিষয়ে বাংলার সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, এক অংশ বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, আর এক অংশ বিধবা-বিবাহের বিরোধী। বাংলা সাহিত্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। এই বৎসর এই বিষয় অবলম্বন করিয়া বাংলা সাহিত্যে একখানি শক্তিশালী নাটক রচিত হয়, তাহার নাম 'বিধবা-বিবাহ নাটক'; রচয়িতার নাম উমেশচন্দ্র মিত্র। সেক্সপীয়র-কৃত বিয়োগান্তক নাটকের অনুকরণে প্রধানত ইহা রচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনভিত্তিক নাটকেও যে সেক্সপীয়রের উচ্চ আদর্শ অনুকরণ করা যাইতে পারে, বাংলা নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে, ইহার মধ্যে তাহাই প্রথম প্রত্যক্ষ করা গেল। ইতিপূর্বে 'কীর্তি-বিলাস নাটক' নামে যে বিয়োগান্তক নাটক রচিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিষয়বস্তু ছিল রোমান্টিক এবং কাহিনীর গ্রন্থি ছিল নিতান্ত শিথিল; কিন্তু অনেকখানি দৃঢ়-সংবদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া সেক্সপীয়রের বিয়োগান্তক নাটকের প্রেরণার ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যে ইহাই সর্বপ্রথম নাট্য-রচনা।

ইহার আর একটি প্রধান গুণ, ইহার কাহিনী রোমান্টিক নহে, বরং নিখুঁত বাস্তব। ইতিপূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের মধ্যে যে বাস্তব গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহাতেও তাহারই বিকাশ দেখা গিয়াছে। তবে রামনারায়ণ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তিনি আঙ্গিকের দিক দিয়া ভারতীয় আদর্শে মিলনাত্মক নাটকই রচনা করিয়াছেন, কিন্তু উমেশচন্দ্র মিত্র ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, তিনি সেক্সপীয়র পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ধারায় তিনি বাংলা সাহিত্যে ট্রাজিডি রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার নাটকখানি পরবর্তী অনেক নাটকের প্রেরণা যোগাইয়াছে; মধুসূদনও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না।



২

মধুসূদনের উপর পূর্ববর্তী বাংলা নাটকের প্রভাব

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মধুসূদন যে-সময় বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহার পূর্বেই কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বাংলা মৌলিক এবং অনুবাদ নাটক রচিত হইয়াছিল। রুষদেশীয় পরিব্রাজক গেরাসেম লেবেডেফের ইংরেজী নাটকের অনুবাদের কথা বাদ দিলেও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তারাচরণ শিকদার এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের রচিত যথাক্রমে 'ভদ্রার্জুন' এবং কীর্তি-বিলাস' নাটক রচনার পর হইতে মধুসূদনের প্রথম নাটক রচনার সময় পর্যন্ত বাংলা নাটক রচনার একটি ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। তবে সেই ধারা যে কোন সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে। এ কথা সত্য, মধুসূদনের পর হইতেই বাংলা নাটক এবং প্রহসন রচনার একটি সুনির্দিষ্ট ধারা প্রবর্তিত হয় এবং তাহা প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা নাট্যরচনার আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তথাপি একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, মধুসূদনের নাট্য-রচনার মধ্যে তাঁহার পূর্ববর্তী ধারার কোন যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। সে যোগ যতই ক্ষীণ হোক, তথাপি মধুসূদন তাহার সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন ছিলেন, এমন কথা বলিতে পারা যাইবে না। সুতরাং মধুসূদনের নাটক সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সেই বিষয়েরও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

তারাচরণ শিকদার তাঁহার 'ভদ্রার্জুন' নাটকে সর্বপ্রথম বাংলা নাট্যসাহিত্যে মহাভারতের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া মৌলিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদনের প্রথম নাট্য-রচনা 'শর্মিষ্ঠা' নাটকও তাঁহার তদনুরূপ রচনা। ইহার মধ্যেও মহাভারতেরই বিষয়বস্তু অবলম্বন করা হইয়াছে। 'ভদ্রার্জুন' মিলনাত্মক নাটক,

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক'ও তাহাই। তবে তারাচরণ শিকদার মহাভারতের চরিত্রগুলির অনেকাংশে বাঙ্গালী জীবন-প্রতিরূপ প্রকাশ করিলেও তাহাদের উচ্চ মর্যাদার কোথাও হানি করেন নাই। মধুসূদন তাঁহার নিজস্ব একান্ত রোমান্টিক চেতনার বশবর্তী হইয়া তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক'-এ মহাভারতোক্ত চরিত্রের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। যে কথা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

তারাচরণের 'ভদ্রার্জুন' নাটকখানি সে যুগে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল, এমন মনে করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। মধুসূদন এই নাটকখানি পাঠ করিয়া ইহা দ্বারা কোন ভাবে তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনায় প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহাও মনে করা কঠিন। তবে বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ বিষয় লইয়া নাটক রচনার যে সূচনা হইয়াছিল, মধুসূদন বিষয়বস্তুর ব্যবহারে যে কোন নূতন পথের সন্ধান দেন নাই, ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়।

তারাচরণ তাঁহার নাটকে যে গদ্য এবং পদ্য-সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন, মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলা নাটক রচনায় তাহার ধারা পরিত্যাগ করিয়া যান। অবশ্য এ'কথাও সত্য, তিনি তাঁহার প্রথম রচনা অর্থাৎ 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র মধ্যে তারাচরণের গদ্য সংলাপের আদর্শ অনুকরণ না করিলেও তাঁহার পূর্ববর্তী আর একজন নাট্যকারের বাংলা গদ্য-সংলাপ রচনার আদর্শ নিশ্চিতভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন; তাহা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক অনুবাদের আদর্শ। রামনারায়ণের আদর্শ তারাচরণ হইতে স্বতন্ত্র ছিল, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কোন কারণেই হোক, তারাচরণের প্রভাব সুদূর প্রসারী হইতে পারে নাই, কিন্তু রামনারায়ণের প্রভাব সুদূর প্রসারী হইয়াছিল, মধুসূদন তারাচরণের কোন প্রভাব অনুভব না করিলেও রামনারায়ণের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন, এমন কথা বলিতে পারা যাইবে না। মধুসূদনের প্রহসন দুইখানির কথা মনে হইলে একথা বিশেষ ভাবেই স্বীকার করিতে হয়।

তারাচরণ যে বৎসর তাঁহার 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনা করেন সেই বৎসরেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি বিয়োগান্ত নাটক প্রকাশিত হয়। তাহা যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত রচিত 'কীর্তি-বিলাস' নাটক। মধুসূদন যে তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' বিয়োগান্তক বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়াছিলেন, এখানেই তাহার সূচনা। হয়ত মধুসূদনের সঙ্গে এই নাটকখানির কোনই যোগ ছিল না। তথাপি একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মত বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিবার প্রেরণা ইতিপূর্বেই বাংলা নাট্যকারদিগের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। মধুসূদন তাহার ধারাটিই অনুসরণ করিয়াছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'কীর্তি-বিলাস' নাটকের ভূমিকায় বাংলা সাহিত্যে বিয়োগান্তক নাটক রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক দীর্ঘ ভূমিকা যোগ করিয়াছেন। সামগ্রিক ভাবে বিদগ্ধ সমাজের মধ্যে এই বিয়োগান্তক নাটকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

বিশেষত দেখি যে,সেই ধারা অনুসরণ করিয়া মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে আরও একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'বিধবা-বিবাহ নাটক'। ইহাও ইংরেজি নাটকের আদর্শে রচিত বিয়োগান্তক নাটক। সুতরাং যে সময় মধুসূদন ইংরেজি বিয়োগান্তক নাটক রচনার আদর্শে তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিলেন, তাহার পূর্বেই ইহার একটি ধারা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। মধুসূদন ইতিহাসের মধ্য হইতে ইহার বিষয়-বস্তু সন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বেই ইতিহাস কিংবা পুরাণের পরিবর্তে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের বাস্তব পরিবেশের মধ্য হইতেই একজন নাট্যকার তাহার বিষয়বস্তুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সেক্সপীয়রের আদর্শে রচিত ট্রাজিডি। তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকার উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটক'ও

সেক্সপীয়রেরই আদর্শে রচিত বিয়োগান্ত নাটক। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি আদর্শে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' যেমন ট্রাজিডি নহে, উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটক'ও ট্রাজিডি নহে; তবে উভয়েই একই অভিন্ন আদর্শে রচিত।

পূর্ববর্তী বাংলা বিয়োগান্ত নাটক 'কীর্তি-বিলাসের' সঙ্গে মধুসূদনের কোন পরিচয় না থাকিলেও উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটকে'র সঙ্গে তাঁহার কোন পরিচয় ছিল না, এ' কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, 'বিধবা-বিবাহ নাটক'খানি সে যুগে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি যে বৎসর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়, সেই বৎসরই মেট্রোপলিটান থিয়েটারে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটক'খানি বিপুল আড়ম্বরের সহিত অভিনীত হইয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। এমন কি, মধুসূদনের পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধুও ইহা দ্বারা যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহারও প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং মধুসূদনেরও ইহার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তবে মধুসূদনকে রঙ্গমঞ্চের কতকগুলি বাধ্যবাধকতার উপর তাঁহার নাটকটি রচনা করিতে হইয়াছিল বলিয়া কতকগুলি বিষয়ে 'বিধবা-বিবাহ নাটক' হইতে তাহার নাটকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 'বিধবা-বিবাহ নাটক' হইতে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র নৈতিক সুর অনেকখানি উন্নত। কারণ, 'বিধবা-বিবাহ নাটক' অভিনয়ের উদ্দেশ্যে কোন রঙ্গমঞ্চ আদর্শ করিয়া রচিত হয় নাই, বিশেষ একটি মত প্রচারই ইহার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালার বিশেষ একটি মঞ্চ ব্যবস্থা এবং উন্নত রুচি এক দর্শকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচিত হইয়াছিল। সেই জন্য মধুসূদনকে ইহার অনুসরণ করিতে দেখা যায় না। বিশেষত একটি বাস্তব জীবনের সমস্যা লইয়া 'বিবাহ-বিবাহ নাটক' রচিত হইয়াছিল, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র ভিত্তি এক রোমান্টিক জীবন। তবে এ'কথা স্বীকার করিতে পারা যায় যে, 'বিধবা-বিবাহ নাটক' বাংলা নাট্যসাহিত্যে ট্রাজিডি রচনার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি

করিয়াছিল, তাহার মধ্যেই মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র ট্রাজিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। কারণ, দেখা যায়, মধুসূদন অন্যান্য ক্ষেত্রে যে দুঃসাহসী প্রয়াসই করুন না কেন, নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্যের ধারা অতিক্রম করিয়া অধিক দূর যাইতে পারেন নাই। এমন কি, আপাত দৃষ্টিতে মধুসূদনের মধ্যে যাহা ঐতিহ্য-বিরোধী বলিয়া মনে হয়, গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যেও তাঁহার ঐতিহ্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

নাট্যরচনায় মধুসূদনের স্বাধীন প্রতিভা-বিকাশের কতকগুলি অন্তরায় ছিল। প্রথমত তাঁহার নাটকমাত্রই পরমুখাপেক্ষী রচনা ছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা নাটক রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার অনূদিত নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া মধুসূদন উক্ত নাট্যশালায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যেই যখন বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন স্বভাবতই রামনারায়ণকে অতিক্রম করিয়া বেশি দূর যাইতে পারিলেন না। তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' সেইজন্যই সংলাপে এবং আঙ্গিকে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের বাংলা অনুবাদেরই সমকক্ষ হইল। মধুসূদন তাঁহার প্রত্যেকটি নাটকের এক একটি অংশ রচনা করিয়া তাহা অনুমোদনের জন্য রাজা যতীন্দ্রমোহনের নিকট পাঠাইতেন; যতীন্দ্রমোহন এই বিষয়ে তাঁহার নাট্যশালার একজন সৌখিন অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শ মতই মধুসূদনকে নাট্যরচনা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইত। সুতরাং মধুসূদনের নাটক তাঁহার স্বাধীন প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না এবং সেই সূত্রেই তাঁহার মধ্যে এই বিষয়ক পূর্ববর্তী ধারাকেও তাঁহার পরিত্যাগ করিবার কোন উপায় ছিল না। কেবলমাত্র দেখা যায়, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনায় মধুসূদন কেশবচন্দ্রের সকল পরামর্শ মানিয়া লইতে পারেন নাই, তাহারই দণ্ড স্বরূপ তাঁহার এই

নাটকখানি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্নই হউন, কিংবা উমেশচন্দ্র মিত্রই হউন ইহাদের কাহাকেও তাঁহাদের নাটক রচনা করিতে পরমুখাপেক্ষী হইবার কিংবা নির্দিষ্ট কোন মঞ্চব্যবস্থার উপর নির্ভর করিবারও প্রয়োজন হয় নাই। মধুসূদনের এই সুযোগ ছিল না বলিয়া তাঁহার পক্ষে বাধ্য হইয়াই ঐতিহ্যের ধারা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই।

মধুসূদন তাঁহার নাটকের গদ্যসংলাপ রচনায়ও যে বাংলা গদ্য রচনার তদানীন্তন ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এই বিষয়ে তাঁহার সমসাময়িক কালে দুইটি ধারা প্রচলিত ছিল, একটি পণ্ডিতি বাংলা, আর একটি আলালী ভাষা। মধুসূদন তাঁহার নাটক রচনায় পণ্ডিতি বাংলার ধারা অনুসরণ করিলেও প্রহসন রচনায় আলালী ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের কাল হইতেই বাংলা নাটকের সংলাপ রচনায় দুইটি ধারাই প্রচলিত ছিল। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর চরিত্রে পণ্ডিতি বাংলা এবং ইতর শ্রেণীর চরিত্রের জন্য আলালী ভাষায় সংলাপ রচনার রীতি তখন হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। মধুসূদন এই বিষয়ে সেই ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন।

*

৩

সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চ ও মধুসূদনের নাটক

মধুসূদন বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই এ দেশে পাশ্চাত্তা রঙ্গমঞ্চের অনুকরণ করিয়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সৌখিন রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহাদের মধ্যে ১৮৫৬ সনে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে যে একটি সাহিত্য-সভা ছিল, ইহাও তাহারই সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। অভিনয়যোগ্য মৌলিক বাংলা নাটকের অভাবে ইহাতে সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি অনুবাদের অভিনয় হয়। ইহাতে ক্রমে রামনারায়ণ তর্করত্ন-কৃত 'বেণীসংহার' নামক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের অনুবাদের অভিনয় হয়। অতঃপর কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজে 'সাবিত্রী-সত্যবান নাটক' নামক একখানি পৌরাণিক বিষয়ক মৌলিক নাটক রচনা করেন। ইহাও যথাকালে উক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ইহা যে সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী রচনা ছিল না, বরং তাহার পরিবর্তে সেক্সপীয়রের নাটক রচনার ধারা অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছিল, তাহা ইহার সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকরে'র এই উক্তি হইতেই জানিতে পারা যাইবে। ১৮৫৮ সনের ৪ঠা জুন তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ইহার যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, তাহাতে উল্লেখিত ছিল, 'ইংরেজি সেক্‌সপিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ পঠিত হইবেক।' সুতরাং দেখা যাইতেছে, সেক্সপীয়রকে অনুসরণ করিয়া নাটক রচনা করিবার প্রেরণা এবং ইংরেজি নাটকের অভিনয় অনুযায়ী তাহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করা সে যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশেষ লক্ষ্য হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যেই কলিকাতায় বিভিন্ন সৌখিন রঙ্গমঞ্চ সেদিন স্থাপিত হইয়াছিল।

এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাট্যশালার নাম বেলগাছিয়া নাট্যশালা। বেলগাছিয়ায় পাইকপাড়ার রাজাদের বাগান বাড়ীতে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। সেদিনকার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত কলিকাতার সম্পন্ন বাঙ্গালী সমাজ নানাভাবে ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভাও মুখ্যভাবে ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। শুধু মাত্র নাট্যপ্রতিভাই নহে, ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিবার ফলেই মধুসূদন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ পথের প্রথম সন্ধান পাইলেন। সুতরাং মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনে বেলগাছিয়া নাট্যশালার বিশেষ একটি স্থান আছে।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় যখন একদিন রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত রত্নাবলী নাটকের অভিনয়ের অভ্যাস (rehearsal) হইতেছিল, তখন মধুসূদনের আজন্ম সুহৃদ্ হিন্দু কলেজের সহপাঠী গৌরদাস বসাক মধুসূদনকে সঙ্গে করিয়া প্রথম পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই অভিনয়াভ্যাস দেখিতে দেখিতে মধুসূদনের মনে একটি আশার সঞ্চার হইল। অভিনয়-যোগ্য বাংলা নাটকের যে কি অভাব, তিনি তাহা হইতে বুঝিতে পারিলেন এবং নিজেই এই প্রকার অকিঞ্চিৎকর অনুবাদের পরিবর্তে নূতন মৌলিক নাটক রচনা করিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু মধুসূদন এই পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাঁহার এই সংকল্পের কথা শুনিয়া স্বভাবত কেহই তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না এবং তাহাতে কেহ কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করিতে পারিলেন না। তথাপি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন তাহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি যদি সার্থক নাটক রচনা করিতে পারেন, তবে বেলগাছিয়া নাট্যশালা হইতে তিনি তাহার অভিনয় করিবার এবং মুদ্রণের ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা করিবেন। মধুসূদন উৎসাহিত হইয়া তাহার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অচিরেই সে কার্য সম্পন্ন হইল।

এবং তাহা যতীন্দ্রমোহনের অনুমোদন লাভ করিয়া বেলগাছিয়া নাট্যশালায় যথারীতি অভিনীত হইল।

এই ঘটনার মধ্যে কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমত যে 'রত্নাবলী' নাটকের বাংলা অনুবাদখানির অভিনয়-অভ্যাসের উল্লেখ করা হইল, পূর্বেই মধুসূদন তাহার একটি ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ইংরেজ দর্শকদিগের মধ্যে ইহা বিতরণ করিবার জন্য মহারাজের নির্দেশেই মধুসূদন এই কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মধুসূদনের বিচারে এই নাটকখানির যে মূল্যই থাকুক না কেন, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ইহার অভিনয় প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। একাধিক রাত্রি ইহার অভিনয় হইয়াছিল এবং তৎকালীন কলিকাতার সর্বাপেক্ষা অভিজাত রঙ্গমঞ্চে ইহা অভিনীত হইবার ফলে বাংলা নাটক এবং অভিনয়ের দিক দিয়া 'রত্নাবলীর' অনুবাদ একটি আদর্শ স্থির করিয়া দিয়াছিল। বিশেষত 'রত্নাবলী নাটকে'র একটি বিশিষ্ট অভিনেতৃগোষ্ঠীও ছিল, তাহার বিশেষ প্রকৃতির অভিনয়-কৌশল এবং অভিনয়-কর্ম আদর্শ রূপে সেদিন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। মধুসূদনের ব্যক্তিগত নাট্যাদর্শ যাহাই থাকুক না কেন, তিনি যে-নাটক এই রঙ্গমঞ্চে এই বিশেষ অভিনেতৃগোষ্ঠীর অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচনা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার পরিকল্পনায় এই বিষয়গুলিকে স্বভাবতই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সেইজন্য বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের প্রত্যাশা করিয়া তিনি যে কয়খানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত স্বাক্ষর বহন করিতে পারে নাই। এই বিষয়ে মধুসূদনকে সর্বদাই পরমুখাপেক্ষী হইতেই হইয়াছে। তাঁহার জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু এই বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিস্তৃত বর্ণনা মধুসূদনের নাটকগুলি বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। তবে এ কথা সত্য, নাটক রচনা করিতে গিয়া মধুসূদনের মনে যখন শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন তিনি ক্রমে বেলগাছিয়া নাট্যশালার

সকল প্রকার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেলগাছিয়া নাট্যশালা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহার সব কয়খানি নাটক রচনাই প্রায় শেষ করিবার পর তাঁহার নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে তিনি নাটক রচনার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কাব্যরচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। কেবলমাত্র সর্বশেষ নাটকখানি তাঁহার মৌলিক প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত স্বাক্ষর বহন করিয়াছে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত মধুসূদনের সাধনার মধ্যে প্রতিভার সকল স্পর্শই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

অধিকাংশ নাট্যকারকেই এক একটি বিশিষ্ট মঞ্চ-ব্যবস্থা অনুযায়ী নাটক রচনা করিতে হয় এবং তাহার মধ্য দিয়াই সার্থক নাট্যকারের মৌলিক প্রতিভারও যথাযথ বিকাশ হইয়া থাকে। উইলিয়ম সেক্সপীয়রকেও একটি বিশেষ মঞ্চ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার অমূল্য নাট্যগ্রন্থরাজি রচনা করিতে হইয়াছে। একটি সুনির্দিষ্ট অভিনেতৃগোষ্ঠী তাঁহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু মধুসূদনের আদর্শটি অত্যন্ত দুর্বল ছিল। সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ দিয়া সেই রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহার নাটক এবং অভিনয়ের আদর্শ সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের ছকে বাঁধা হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্যই মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' 'রত্নাবলী'র অনুবাদ হইতে বহু দূর অগ্রসর হইয়া বাংলা নাটকের বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি, তাঁহার ইংরেজী আদর্শে রচিত প্রথম ট্রাজিডিও সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, মধুসূদনের একমাত্র 'শর্মিষ্ঠা নাটক' ব্যতীত কোন নাটকই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। যে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় বিভিন্ন পরামর্শদাতার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল, তাহাও শেষ পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষকদিগের আনুকূল্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহা পরে অন্যত্র অভিনীত হইয়াছিল।

মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করিবার পর রাজস্থানের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া যে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিয়াছিলেন, বেলগাছিয়া নাট্যশালার পরামর্শদাতাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই তাহা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে মধুসূদনের নিজস্ব একটি সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু তাহা বেলগাছিয়া নাট্যশালার পরিচালকদিগের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহার মৌলিক প্রতিভার স্বাভাবিক প্রেরণা বশতঃ যে নাটক রচনায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহা কেবলমাত্র একটি বিশেষ রঙ্গমঞ্চের পরিচালকদিগের অভিপ্রেত বলিয়া যে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বীকার করিতেই হইবে। মধুসূদন সম্রাট্ ইল্‌তুত্‌মিসের কন্যা সুলতানা রিজিয়ার জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং ইংরেজীতে তাহার একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়াও নির্মাণ করিয়াছিলেন ; কারণ, মধুসূদনের বিশ্বাস ছিল মুসলমান স্ত্রীচরিত্রের আচার-আচরণে নাট্যিক উপাদান অধিক পাওয়া যায়।

মাদ্রাজ প্রবাস কালে মধুসূদন *Cuptive Lady* নামে একখানি নাট্যকাব্য (A Dramatic Poem) রচনা করিয়াছিলেন। তাহাকেও বাংলা নাটকের রূপে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি যখন ইহার বিষয় বেলগাছিয়া নাট্যশালার পরিচালকগোষ্ঠীকে জানাইলেন, তখন তাঁহারা ইহার পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া ইহার পরিবর্তে রাজপুত জীবনী-বিষয়ক কোন নাটক রচনা করিবার পরামর্শ দিলেন। মধুসূদনকে বাধ্য হইয়া তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইল। এইক্ষেত্রে পরামর্শদাতা যিনি ছিলেন, তিনি যে নাট্যসাহিত্যের একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাও নহে, তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় একজন সৌখিন অভিনেতা ছিলেন মাত্র, তাঁহার নাম কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার অভিনয়-গুণের উপর মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং সেই অধিকারে

তিনি মধুসূদনের মত ব্যক্তিকেও তাঁহার নাটক রচনায় নিজের অভিমত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন। মধুসূদন তাঁহার আনুগত্য কখনও অস্বীকার করেন নাই, আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিয়াই নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, একখানি ব্যতীত বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে তাঁহার আর কোন নাটকই অভিনীত হয় নাই। যতীন্দ্রমোহনের পরামর্শমত রাজপুত জীবন বৃত্তান্ত হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া লিখিত তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ও শেষ পর্যন্ত তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা বেলগাছিয়া নাট্যশালা কর্তৃক শেষ পর্যন্ত অভিনীত হয় নাই।

বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ইহার পরিচালকদিগের পক্ষ হইতে মধুসূদনকে একখানি প্রহসন রচনা করিয়া দিবার যে অনুরোধ করা হইয়াছিল,তাহা রক্ষা করিয়া মধুসূদন তাঁহার দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহারাও বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই, তথাপি উক্ত প্রতিশ্রুতি দিবার জন্যই যে মধুসূদনের প্রতিভার আর একটি দিক্ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

মধুসূদন কাব্যরচনার ক্ষেত্রে সে যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করা সত্ত্বেও, নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার যে কোন স্বাক্ষর রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতি একান্ত আনুগত্যেরই ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, বেলগাছিয়া নাট্যশালা যেমন তাঁহার কেবল নাট্য-প্রতিভা নহে, নাট্য-প্রতিভার সূত্র ধরিয়া কাব্য-প্রতিভারও উন্মেষক, তেমনই বেলগাছিয়া নাট্যশালাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৌলিক নাট্য-প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় হইয়াও দাঁড়াইয়াছিল।

৪

মধুসূদনের ঐতিহ্য-চেতনা—বাঙ্গালীত্ব ও বাংলা যাত্রা

মধুসূদন যখন প্রথমত হিন্দু কলেজের এবং পরে বিশপ কলেজের ছাত্র, তখন হইতেই কলিকাতায় 'নূতন যাত্রা' এক শ্রেণীর দর্শকের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারপর মধুসূদন যখন বাংলা দেশ ও বাঙ্গালীর সমাজ পরিত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে প্রবাস-জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখনও ইহার লোক-প্রীতির ধারা অব্যাহত ছিল। মধুসূদন বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিবার পরও ইহার জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। মধুসূদন তাঁহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের বিভিন্নমুখী ধারার প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার রচিত নাট্যসাহিত্যের মধ্যে তাহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ মধুসূদন বাংলা যাত্রার ধারা অনুসরণ করিয়া তাঁহার কোন নাটকই রচনা করেন নাই। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, মধুসূদনের পূর্ববর্তী কোন নাট্যকারই বাংলাদেশের যাত্রার ধারা অনুসরণ করিয়াও কোন নাটক রচনা করেন নাই। তাহার পরিবর্তে কেহ সংস্কৃত নাটকের ধারা কিংবা কেহ ইংরেজি নাটকের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। অথচ মধুসূদনের পরবর্তী কালেই দুইজন নাট্যকার মনোমোহন বসু এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ইঁহারা উভয়েই বাংলা যাত্রার ধারা অনুসরণ করিয়া নাটক রচনা করিবার ফলে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন।

বাংলা সাংস্কৃতিক জীবনের ঐতিহ্যের প্রতি মধুসূদনের যে কি সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাহা তাঁহার রচিত মহাকাব্য এবং বিশেষত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার রচিত 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যও এই ধারণারই পরিপোষক। কিন্তু এই

কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, মধুসূদন তাঁহার নাটক রচনায় তাঁহার এই স্বাভাবিক ঐতিহ্য-প্রীতির পরিচয় প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র প্রহসন দুইখানিতে বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের যে নগ্নরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে নাগরিক জীবনের বিকৃতির যে পরিচয়ই থাকুক না কেন, তাহাকে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। ইহার প্রকৃত কারণ কি, তাহা একটু বিশ্লেষণ করিয়া বুঝা যাইতে পারে।

প্রথমত মধুসূদনের নাট্য বা প্রহসন রচনা মাত্রই অপরের অনুরোধে রচিত, অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর নির্দেশও সেখান হইতেই আসিয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার ইহারা বাহক নহে। বিশেষত যে অভিজাত পরিবারের অনুরোধে তাহার সৌখিন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে তিনি নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের রুচি এবং নীতিবোধ তদানীন্তন যাত্রার আদর্শের সমর্থক ছিল না। এমন কি, এ কথা সকলেই জানেন যে, প্রহসন দুইখানি তিনি পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের অনুরোধে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সেখানে অভিনীত হয় নাই। অভিজাত রাজ-পরিবারের উচ্চ রুচি এবং নীতিবোধের অনুকূল ছিল না বলিয়াই যে ইহারা অভিনয়ের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এ কথা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। 'নূতন যাত্রা' বলিয়া তখন কলিকাতার জনসাধারণের সমাজে যাহা পরিচিত ছিল, তাহা যে উচ্চ নৈতিক আদর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। সুতরাং বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার কোন নাটকেই তিনি তাহার পরিচয় দিতে পারেন নাই; তাহার ফলে তাঁহার নাটকগুলি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-রসের সংস্পর্শলাভ করিয়া প্রাণবান্ হইয়া উঠিতে পারে নাই, কেবলমাত্র যেন একটি

শিক্ষাগত (academic) আদর্শের প্রচারক হইয়া রহিয়াছে। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার অন্তরের যোগ না থাকিলে যাহা হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে মাত্র। অথচ মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, একশত বৎসরের পূর্ববর্তী ভারতচন্দ্রের ধারার সঙ্গে তিনি কি ভাবে যোগ রক্ষা করিয়া ছিলেন ; এমন কি, তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়িলেও দেখা যায়, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গেও তাঁহার কি সুগভীর যোগ ছিল।

তারাচরণ শিকদার হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদনের সময় পর্যন্ত কোন নাট্যকারই বাংলার লোক-নাট্য বা যাত্রার সঙ্গে কোন প্রকার যোগ রক্ষা করিয়া তাঁহাদের নাটক রচনা করেন নাই, অথচ স্বাভাবিক নিয়মে তাহাই নিতান্ত সঙ্গত ছিল। ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত নাটকের অনুকরণই ছিল, সে যুগের নাটকের লক্ষ্য। পরবর্তী কালে একদিকে মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অন্য আর একদিকে রবীন্দ্রনাথও কতকটা এই যোগ রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেও, তাঁহাদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক বৈচিত্র্যহীন এক নিষ্প্রাণ অনুকরণের ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। মধুসূদনের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম আশা করা গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনিও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বশবর্তী হইয়া শেষ পর্যন্ত একই ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য হইলেন।

বাংলা যাত্রার মধ্য হইতে যদি মধুসূদন তাঁহার নাটকের প্রেরণা সন্ধান করিতেন, তবে বাঙ্গালীর যাহা সর্বাপেক্ষা প্রিয় অর্থাৎ সঙ্গীত, তাহা তাঁহার নাটকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় স্থান পাইত। কিন্তু তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' মাত্র তিনটি, 'পদ্মাবতী' এবং 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' চারিটি করিয়া গান স্থান পাইয়াছে। এই গানগুলি বাংলা যাত্রার প্রেরণা-জাত মনে করা যায় না। কারণ, সংস্কৃত নাটকেও অনুরূপ সংখ্যক গান থাকিতে পারে ; এমন কি, ইংরেজি নাটকেও অল্প সংখ্যায় গানের ব্যবহার হইয়া থাকে। যাত্রায় বাংলা গানের

ব্যবহারে যে নিজস্ব একটি রীতি আছে, মধুসূদন তাহা অনুসরণ করেন নাই, সংস্কৃতের রীতিটিই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

মধুসূদন তাঁহার নাটকেই সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে সংলাপ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার অভ্যাসের এখানেই সূচনা হইয়াছিল বলিয়া অনুভব করা যায়। তাঁহার রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেশীয় কোন ঐতিহ্যের ধারার অনুসারী নহে, বরং ইংরেজ কবি মিল্টন কিংবা সেক্সপীয়রের নাটকীয় সংলাপের ধারা অনুসরণ করিয়াই রচিত হইয়াছে। তবে এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মধুসূদন তাঁহার প্রথম রচনা 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনায় সাধারণ পয়ার ছন্দে পদ্যসংলাপও রচনা করিয়াছেন। যদিও তাহাদের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য, তথাপি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তকের হাত দিয়া সর্বপ্রথম মিত্রাক্ষর বিশিষ্ট যে পয়ার রচিত হইয়াছিল, তাহাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এখানেই মধুসূদনের নাটক রচনার অন্তত আঙ্গিকের দিক হইতে বাংলার যাত্রা না হইলেও বাংলার তদানীন্তন কাব্যধারার ঐতিহ্য অনুসরণ করিবার নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ ভাবে তিনি কবি ঈশ্বর গুপ্তের অনুসারী, নিজের প্রতিভার তখন পর্যন্ত সন্ধান পান নাই। তাহার একটু নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে,

রাজা। (গদ্য সংলাপ বলিতে বলিতে পয়ার ছন্দে পদ্য সংলাপ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন)

ভুবন মোহিনী যিনি সাধনের ধন,
বিরাগেতে ত্যজ্য তিনি করি ত্রিভুবন,
অতল জলধি তলে কমল-আসনে
বিরাজেন কমলা কমল-উপবনে ;
সেইরূপ তপোধন ভার্গব আশ্রয়,
উজ্জ্বল করয়ে ধনী রূপে নিরুপম !
কে ডরায়, সিন্ধু, তোরে করিতে মথন,
পায় যদি সেই এই রমণীরতন। —'শর্মিষ্ঠা' ২।২

মধুসূদনের পূর্ববর্তী বাংলা নাট্যকারগণ যেমন, তারাচরণ শিকদার,রামনারায়ণ তর্করত্ন,উমেশচন্দ্র মিত্র ইঁহারা সকলেই তাঁহাদের রচিত নাটকে গদ্য-সংলাপ রচনার মধ্যে মধ্যে অনুরূপ পয়ারছন্দে পদ্যসংলাপও ব্যবহার করিয়াছেন।'পদ্মাবতী' নাটক হইতেই মধুসূদন অনুরূপ ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পদ্যসংলাপ ব্যবহার করিলেও তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনায় এই বিষয়ে পূর্ববর্তী বাংলা নাট্যকারদিগের ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, 'শর্মিষ্ঠা নাটক' মধুসূদনের সর্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী রচনা, সুতরাং রচনার দিক দিয়া তিনি প্রচলিত ধারা অতিক্রম করিয়া বেশিদূর যাইতে পারেন নাই, ইহার পরবর্তী নাটক হইতেই তাঁহার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিতে লাগিল এবং সেইভাবেই তিনি তাঁহার নিজের মৌলিক প্রতিভার সন্ধান করিয়া তাহার উপরই তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া লইলেন।

মধুসূদনের 'মায়া-কানন' সহ চারিখানি নাটকই রোমান্টিক, বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে ইহাদের কাহারও কোন সম্পর্ক নাই। এমন কি, তারাচরণ শিকদার তাঁহার 'ভদ্রার্জুন' নাটকে মহাভারতের বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেও কোন কোন স্থানে তাহাতে বাঙ্গালীর জীবনকে আরোপ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের নাটক কয়খানির মধ্যে কোন ঘটনায় কিংবা চরিত্রে বাঙ্গালী জীবনের কোন রূপ প্রকাশ পায় নাই। তবে প্রহসন দুইখানির মধ্যে বাঙ্গালী সমাজের বিশেষ কোন কোন অংশের বাস্তব রূপ নগ্নভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। দুইখানি প্রহসনের মধ্যেই জীবনের সুস্থ সবল কোন রূপের পরিবর্তে বরং তাহার সাময়িক ভাবে বিপর্যস্ত রূপই প্রকাশ করা হইয়াছে। মানব-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া নাট্যকার যেমন নানা দিক হইতে ইহার রস এবং রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, মধুসূদনের প্রহসন দুইখানির মধ্যে তাহার প্রয়াস দেখা যায় না। বরং ব্যধিগ্রস্ত একটি নাগরিক এবং একটি গ্রাম্য সমাজের রূপ ইহাতে প্রত্যক্ষ করা যায়। মধুসূদনের বাস্তব জীবন-

বোধের ইহাদের মধ্যে একটি দিকই প্রকাশ পাইয়াছে। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ যে উদ্দেশ্য লইয়া মধুসূদনকে 'domestic farce' লিখিতে বলিয়াছিলেন, ইহাদের কাহারও দ্বারা যে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই,রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাহা বুঝিতে পরিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাদের অভিনয়ের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মধুসূদনের প্রহসন দুইখানি 'domestic farces' নহে বরং তাহার পরিবর্তে অন্য কিছু। বাস্তব জীবনের রস তাহাতে ছিল সত্য, কিন্তু যাহা সংযম, সৌন্দর্য এবং রুচিবোধকে পীড়িত করে, তাহা সাহিত্যের রস বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন না, সেই অনুসারে ইহারাও সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তবে এই বিষয়ে মধুসূদন নিজের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবকে বিসর্জন দিয়া দেশীয় ঐতিহ্যের ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন; কারণ, মধুসূদন তাঁহার পূর্ববর্তী বাংলা প্রহসন রচয়িতাদিগের ধারাই ইহাদের মধ্যে অনুসরণ করিয়াছেন, নিজের শিক্ষাদীক্ষা এবং সাহিত্যিক আদর্শের প্রতি মমত্ব বিসর্জন দিয়াছিলেন; হয়ত বুঝিয়াছিলেন, ইহাতেই ইহা দেশীয় দর্শক এবং পাঠকের আকর্ষণীয় হইবে। কিন্তু তাহার সেই আশা সেই দিন পূর্ণ হয় নাই।

*

৫

সংস্কৃত নাটক ও মধুসূদন

সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষত কালিদাসের প্রতি মধুসূদনের সুগভীর ঋণের পরিচয় তাঁহার রচনার সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, নাটক রচনার ভিতর দিয়াই মধুসূদন সংস্কৃত সাহিত্যের রসতীর্থে প্রথম অবগাহন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রথমত শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকখানির বাংলা অনুবাদের ইংরেজি তর্জমার ভিতর দিয়াই তাঁহার বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ সম্ভব হইয়াছিল। ইহা তাঁহার জীবনের একটি বাহ্যিক ঘটনা মাত্র নহে, ইহার ভিতর দিয়া তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের যে রস আস্বাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,তাহাই তাঁহাকে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য নাটক, বিশেষত কালিদাস বিশেষভাবে পাঠ করিবার প্রেরণা দিয়াছিল। তিনি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকখানির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চারিখানি নাটক বিভিন্ন বিষয়বস্তু লইয়া রচিত হইলেও ইহাদের বিভিন্ন অংশ রচনায় তিনি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র বিভিন্ন অংশের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। কালিদাসের বহু চিত্র তিনি তাঁহার নাটকে গ্রহণ করিয়াছেন, বহু চরিত্রের নামকরণের সন্ধানও তিনি সেখান হইতেই পাইয়াছেন। কালিদাস সম্পর্কিত একটি চতুর্দশপদী কবিতায় তাঁহার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে পারা যায়, পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শ তাঁহাকে নাটক রচনায় যতখানি উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল. সংস্কৃত নাটকও তাঁহাকে ততখানিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ করিবার যোগ্য। কারণ, মধুসূদনকে পরিপূর্ণ ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবের ফল বলিয়াই আমরা জানি, কিন্তু তাঁহার মধ্যেও ভারতীয় জাতীয় সাহিত্য-ধারার প্রতি যে সুগভীর

শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তাহা অনেক সময়ই আমরা গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখি না।

কিন্তু ইহার সঙ্গে এই কথাও সত্য, কালিদাসের ভাব, ভাষা এবং বিষয়বস্তু আনুপূর্বিক অনুকরণ করিয়া তিনি কোন বাংলা নাটক রচনা করেন নাই। কালিদাস যে আদর্শে তাঁহার নায়ক-নায়িকার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, মধুসূদন সেই আদর্শ পরিপূর্ণ অনুসরণ করিয়া তাঁহার কোন নায়ক-নায়িকার চরিত্রও পরিকল্পনা করেন নাই। কালিদাস মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়া ইহার ঐতিহ্যের ধারাকেই পরিপুষ্ট করিয়াছেন, কোথাও তাহার আদর্শকে তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার নায়ক চরিত্র পরিকল্পনায় প্রচলিত কোন আদর্শ কিংবা ঐতিহ্যের ধারাকে স্বীকার করেন নাই। কালিদাসের কিংবা সংস্কৃত কোন কোন নাট্যকারের রচিত নাটকের বিচ্ছিন্ন কোন কোন সংলাপের বঙ্গানুবাদ ব্যবহারের মধ্যেই যে উক্ত নাট্যকারদিগের পরিপূর্ণ আদর্শ রক্ষা পায়, তাহা নহে, এই বিষয়ে তাহাদের আদর্শকে অবলম্বন করিবারও যে একটি দায়িত্ব আছে, তাহা পালন করা না হইলে এই বিষয়ক দায়িত্ব পালন করা হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, মহাভারতে দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার বৃত্তান্ত যাহা আছে, কালিদাস তাহার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়া তাঁহার 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক রচনা করেন নাই। কিংবা পুরুরবা এবং উর্বশী সম্পর্কে সংস্কৃত সাহিত্যে যে বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে, তাহারও কোন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়া কালিদাস তাঁহার 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটক রচনা করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' মহাভারত হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়াও মহাভারতের কাহিনী এবং চরিত্রের মর্যাদা পরিপূর্ণ রক্ষা করিয়া তাঁহার নাটক রচনা করেন নাই। সংস্কৃত নাটক ঐতিহ্য অনুসারী রচনা, মধুসূদন সংস্কৃত হইতে কাহিনী গ্রহণ করিলেও সংস্কৃত নাটকের মত ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার কাহিনী এবং চরিত্র পরিকল্পনা

করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের এই যুগধর্মের মধুসূদনই প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে কয়েকটি নাট্য-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ঐতিহ্যের প্রতি যে আনুগত্য দেখাইয়াছেন, মধুসূদন তাহাও দেখাইতে পারেন নাই। কালিদাসের রচনার সে প্রসাদগুণ ছিল, তাহা দ্বারা তিনি যত আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার ভাবাদর্শ এবং সৌন্দর্যবোধ দ্বারা ততখানি আকৃষ্ট হন নাই। কালিদাস দেবলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, নর-লীলাও বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উভয়কে একাকার করিয়া ফেলেন নাই; কিংবা তিনি দেবতাকেও যেমন নিতান্ত মানুষের স্তরে নামাইয়া আনেন নাই, তেমনই মানুষকেও দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন সর্বদাই দেবত্বকে মনুষ্যত্বে অবনমিত করিয়া লইয়াছেন, দেবতার উচ্চ মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের মধ্যে রোমান্টিক মনোভাব সর্বদাই সক্রিয় ছিল বলিয়া অনুভব করা যায়। বিশেষত যেখানে দেবতা সম্পর্কে তাঁহার সুনির্দিষ্ট একটি বিশ্বাস তাঁহার সকল চিন্তা এবং সৃষ্টিকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সেখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, অপরের কোন আনুগত্য স্বীকার করেন নাই।

যুগপ্রভাবকে স্বীকার করিয়াই মধুসূদন তাঁহার নাটকে সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ করিয়াছেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকখানি তখনকার নাট্যরসিক সমাজে যে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল, ইহার অভিনয় যে ভাবে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহারই আদর্শ অনুকরণ করিয়া তিনি তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার 'রত্নাবলী' নাটকের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণের ফল নহে, বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থারই প্রভাবের ফল। তবে এই কথাও স্বীকার করিতে হইবে, মধুসূদন তাঁহার কোন নাটকেই সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা অংশের অনুসরণ করিয়া নান্দী,

সূত্রধার, নটনটী কিংবা ভরত-বাক্যের অবতারণা করেন নাই। এই বিষয়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন যাহা করিয়াছেন, সে দিকে তিনি অগ্রসর হন নাই, ইংরেজি নাটকের আদর্শে প্রস্তাবনা অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অঙ্কের মধ্যবর্তী ইংরেজী নাটকের অনুযায়ী scene বা গর্ভাঙ্কের অবতারণা করিয়াছেন। মধুসূদনের প্রতিভা প্রধানত শব্দশিল্পীর প্রতিভা, সংস্কৃত নাটক কিংবা কাব্যের যে সকল নাম তাঁহার নিকট শ্রুতিসুখকর এবং আকর্ষণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, নির্বিচারে তিনি তাহা তাঁহার বিভিন্ন রচনায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভাবে তিনি কেবলমাত্র কালিদাসের নাটক নহে, শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' কিংবা ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' হইতেও নামগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের কাহারও কাহিনী কিংবা চরিত্র-পরিকল্পনা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নাই। সেই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে চলিয়াছেন। সুতরাং দেখা গেল, মধুসূদনের নাটকের উপর সংস্কৃত নাটকের প্রভাব কেবলমাত্র বহির্মুখী বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কোনদিক দিয়াই তাহা অন্তর্মুখী হইতে পারে নাই। সুতরাং কোন কোন সংলাপের ভাষায় বিচ্ছিন্নভাবে কিংবা কোন কোন চরিত্রের নামকরণের মধ্যে তাঁহার উপর সংস্কৃত নাটকের যে প্রভাব অনুভব করা যায়, তাহা কোনমতেই তাঁহার নাট্যসাহিত্যের অন্তর্মুখী পরিচয় বহন করিতে পারে না। বরং মধুসূদনের এই প্রকার পরনির্ভরতা পূর্বসূরীদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার যতখানি পরিচায়ক, তদপেক্ষা তাঁহার নাট্য-প্রতিভার দৈন্যের পরিচায়ক।

সংস্কৃত শৃঙ্গার-রসাত্মক নাটকের মধ্যে যে অশ্লীল বর্ণনা আছে, মধুসূদনের নাটকে তাহা নাই। মধুসূদনের নাটক রুচির দিক দিয়া উন্নত, সংস্কৃত নাটকের দোহাই দিয়া তিনি তাঁহার উন্নত রুচিবোধকে বিসর্জন দিতে যান নাই। ইহা মধুসূদনের সংস্কৃত নাটকের প্রতি আনুগত্যের পরিচায়ক নহে। তবে এ' কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের দুষ্যন্ত চরিত্রের অনুকরণে

যযাতির চরিত্র পরিকল্পনা করিতে গিয়া মধুসূদন মহাভারতের যযাতি চরিত্রের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র দুষ্মন্ত চরিত্রই নহে, শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী' নাটকের নায়ক চরিত্রের প্রভাবও তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের যযাতি চরিত্রের উপর স্থাপিত হইয়া ইহাকে সাধারণ শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের নায়কের পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছে। মহাভারতের যযাতি চরিত্র আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজচরিত্র; শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের নায়ক চরিত্রের যাহা সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাহা তাহার মধ্যে নাই। মধুসূদন সে কথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটককে শৃঙ্গার রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের রূপে গঠন করিয়াছেন, সেইজন্য ইহার নায়ক-চরিত্র মহাভারতের উচ্চ মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই।

মধুসূদন এই কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর যে উচ্চ গুণই থাকুক না কেন, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী পাঠকের নিকট তাহার মূল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কারণ, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবের ফলে বাঙ্গালীর সাহিত্য চিন্তায় নূতন দিগ্‌দর্শন ঘটিয়াছে, তাহার প্রভাব অস্বীকার করিয়া রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের সনাতন আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। যে ভাবে মহাভারতে যযাতির চরিত্রে উচ্চ ক্ষত্রিয়রাজের আদর্শ রক্ষা পাইয়াছে, সেই ভাবে এই যুগে তাঁহার সেই আদর্শ রক্ষা পাইতে পারে না, নূতন আদর্শের প্রেরণা সমাজ-মানসকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। সেইজন্য 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র নায়ককে তিনি শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের আদর্শে গঠন করিয়াও তাঁহার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রেরণার প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছেন। সুতরাং তাহাতে মহাভারতের মর্যাদা রক্ষা না পাইলেও যে নূতন সাহিত্য এবং জীবন-চেতনা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর মনে সেদিন সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার মর্যাদা রক্ষা পাইয়াছিল।

সংস্কৃত নাটকের নায়িকাদিগের চরিত্র নিতান্ত ব্যক্তিত্বহীন ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে নারীজাতির জীবন-আদর্শ সম্পর্কে যে নূতন চেতনা বাঙ্গালীর মনে জাগ্রত হইয়াছিল, বিশেষতঃ যাহা মধুসূদন সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নারীর এই ব্যক্তিত্বহীনতার মর্মমূলেই প্রথম আঘাত করা হইয়াছিল। তাহাদের আত্মবোধের স্বীকৃতিই সেই যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান একটি লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। 'রত্নাবলী' নাটকের আদর্শে মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করিলেও তাহার নায়িকার সঙ্গে 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র নায়িকার যে পার্থক্য অনুভূত হইবে, তাহার ইহাই কারণ। 'রত্নাবলী'র নায়িকা ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র, কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র দেবযানী এবং এমন কি শর্মিষ্ঠাও নিজেদের ব্যক্তিত্বে সুপরিস্ফুট। এই পার্থক্যগুলি আপাত দৃষ্টিতে অনুভূত হয় না।

৬

মধুসূদনের নাটক ও মহাভারত

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'খানি রামায়ণের বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত এবং ইহাই তাঁহার অন্যান্য রচনার তুলনায় সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছে বলিয়া সাধারণ ভাবে মধুসূদন রামায়ণ দ্বারাই অধিক প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের প্রভাব রামায়ণের তুলনায় তাঁহার উপর অধিক বলিয়া অনুভূত হইবে। তিনি একখানি মাত্র যে ভারতীয় পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে মহাভারতের বিষয়বস্তুই মূলতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' যে একাদশটি পত্র আছে, তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি রামায়ণের নায়িকা এবং অবশিষ্ট নয়টিই মহাভারতোক্ত নায়িকা দ্বারা লিখিত। তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে রামায়ণ-বিষয়ক যতগুলি কবিতা আছে, মহাভারতের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া তাহাদের অধিক কবিতা রচিত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে 'মহাভারত' বিষয়েও একটি চতুর্দশপদী কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে মহাভারতের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য,

কল্পনা বাহনে সুখে করি আরোহণ,
উতরিনু, যথা বসি বদরীর তলে,
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি,-ঋষিকুলধন!
শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি; উন্মিলি নয়ন
দেখিনু কৌরবেশ্বরে,মত্ত বাহুবলে;
দেখিনু পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে
হুঙ্কারে! আইলা কর্ণ সূর্যের নন্দন

তেজস্বী। উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামতি,
আলো করি দশ দিশ ধরি বাম করে
গাণ্ডীব—প্রচণ্ড দণ্ডদাতা রিপু প্রতি।
তরাসে আকুল হৈনু এ কাল সমরে,
দ্বাপরে গো-গৃহ রণে উত্তর যেমতি।

অবশ্য রামায়ণ সম্পর্কেও তাঁহার একটি স্বতন্ত্র চতুর্দশপদী কবিতা আছে। তারপর কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাস উভয়ের সম্পর্কেই তিনি পৃথক্ পৃথক্ চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে সকল রচনা তাঁহার প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের কোন কোন চরিত্রের প্রতি কবির সুগভীর সহানুভূতি যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই কোন কোন চরিত্রের প্রতি তাঁহার সমান বিতৃষ্ণাও যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়। মহাভারতের কাহিনীর মধ্যকার বিশেষ কোন চরিত্রের প্রতি তাঁহার সুস্পষ্ট সহানুভূতির পরিচয় সুলভ নহে। এমন কি, রামায়ণের আদর্শ রক্ষা করিয়া যে মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করিতে পারেন নাই, রাম-লক্ষ্মণের চরিত্রকে অবনমিত করিয়া রাক্ষস চরিত্র রাবণকে উন্নত করিয়াছেন, তাঁহার সম্পর্কে এই অভিযোগ প্রায় সকলেই করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি মহাভারতের কাহিনী লইয়া যে সকল রচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের সম্পর্কে এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় না। অথচ মহাভারতের প্রসঙ্গ লইয়াই মধুসূদন অধিক রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। রাবণের চরিত্রের মধ্যে মধুসূদন যেমন তাঁহার নিজের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন, মহাভারতের মধ্যেও অনুরূপ চরিত্রের অভাব না থাকিলেও তাহার কোন চরিত্রকেই তিনি নিজের ভাব-কল্পনার প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত করিতে যান নাই। মধুসূদন মহাভারতের বীররস দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বীররসাত্মক কাব্যরচনায় মধুসূদনের সাধ

থাকিলেও সাধ্য ছিল না বলিয়া মহাভারতের কাহিনী লইয়া তিনি তাঁহার অভিলষিত বীররসাত্মক মহাকাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

এই কথা সকলেই জানেন যে, মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনার পর 'সুভদ্রা হরণ' নামে আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে একখানি নাটক রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নাট্যরচনা অনুমোদন করিলেন না বলিয়া সেই সঙ্কল্প তিনি পরিত্যাগ করিলেন, তারপর 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার পরও 'সুভদ্রা হরণ' নামক আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে একখানি মহাকাব্য রচনার সঙ্কল্প করিয়া তাহার সূচনা পর্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা তখন অস্তমিত হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাহা আর তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং মহাভারতের বীররস মধুসূদনকে সর্বদাই আকর্ষণ করিয়াছিল, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে বীররস পরিবেষণ সার্থক হয় নাই, এই বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন বলিয়াই মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে নানা বিষয়বস্তু তিনি সর্বদা সন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মূল কবি-প্রকৃতিই বীররসাত্মক কাহিনী রচনার বিরোধী ছিল বলিয়া মহাভারতের কোন কাহিনীকেও তিনি এই উদ্দেশ্যে যথাযথ নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ'কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রামায়ণের কাহিনীমূলক রচনা 'মেঘনাদবধ কাব্য' বহুল প্রচার লাভ করিলেও, মহাভারতের প্রসঙ্গই মধুসূদন তাঁহার সাহিত্যরচনায় অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র মহাভারতের কাহিনী লইয়াই তিনি নাটক রচনা করিয়াছেন, রামায়ণের কাহিনী লইয়া কোন নাটক রচনা করেন নাই। সুতরাং নাটক রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের নিকট মহাভারতই গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার মধ্য দিয়াও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, বীররসের প্রতি তাঁহার যে আকর্ষণ ছিল,

তাঁহার একমাত্র মহাভারত বিষয়ক নাট্যরচনার মধ্য দিয়াও তিনি তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই, কিংবা তেমন কোন বিষয়বস্তুও তিনি গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ, তাঁহার বীররসের প্রতি অশ্রদ্ধা নহে, বরং তাহার পরিবর্তে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় যে নাটকখানি অভিনীত হইয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, তাহারই অনুকরণ করিবার স্পৃহা। শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী নাটক' জনপ্রীতি লাভ করিয়াছিল, ইহার আদর্শে তাঁহার নাটক রচিত না হইলে তাহা পৃষ্ঠপোষকদিগের অনুমোদন লাভ করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কাতেই মধুসূদন তাঁহার মনোমত কোন বিষয়বস্তু ইহাতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, প্রচলিত পথেই পদচারণা করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধুসূদনের আবির্ভাবের সময় হইতেই রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লইয়া যাঁহারাই কাব্য-নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই মূলের বিষয়বস্তুর প্রতি আনুপূর্বিক আনুগত্য দেখান নাই। ইহাই নবযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। মধুসূদনই এই পথের প্রবর্তক, এই কথা স্বীকার করিতেই হয়। মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার পূর্বেই তাঁহার প্রথম রচনা 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র মধ্যে ইহার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহার ধারাই তাঁহার জীবনে পরবর্তী কালে প্রশস্ত হইয়াছে মাত্র। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র কাহিনী মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও ইহার মূল চরিত্রগুলি মহাভারতের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই, উনবিংশ শতাব্দীর নূতন সমাজ ও জীবন-চেতনা তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র নায়ক চরিত্র যযাতি; মহাভারতের মধ্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' তাঁহার চরিত্রের সেই উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই। সাধারণ শৃঙ্গার-রসাত্মক নায়কের আদর্শে তাঁহার চরিত্র গড়িয়াছেন। শুক্রাচার্যের চরিত্রও মহাভারতের মধ্যে অতি উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন; তাঁহার কর্তব্যবোধ,ন্যায়পরায়ণতা আদর্শ স্থানীয়; কিন্তু মধুসূদন তাঁহার

সেই উচ্চ চারিত্রিক আদর্শ রক্ষা করিয়া তাঁহারও চরিত্র এখানে গড়িতে পারেন নাই। তাঁহাকে কন্যার প্রতি একান্ত স্নেহাতুর বাঙ্গালী পিতা করিয়া গড়িয়াছেন, মহাভারতের মধ্যে শুক্রাচার্য ন্যায়পরায়ণ, কন্যার প্রতি স্নেহান্ধ হইয়া যযাতির প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করেন নাই, সেখানেও শুক্রাচার্যের যযাতির প্রতি অভিশাপের কথা বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহা যে রূপক হিসাব ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু মধুসূদনের শুক্রাচার্য যযাতিকে যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহাতে অলৌকিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, রূপকের কোন ভাবনা নাই। মহাভারতের কাহিনী লৌকিক এবং বাস্তবধর্মী, মধুসূদনের কাহিনীর কোন কোন অংশ অলৌকিক। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে দুর্বাশার অভিশাপ যেমন রূপক মাত্র, অলৌকিক নহে, মহাভারতেও যযাতির প্রতি শুক্রাচার্যের অভিশাপ রূপক মাত্র, কোন অলৌকিক বিষয় নহে। কিন্তু মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' যযাতির প্রতি শুক্রাচার্যের অভিশাপকে রূপক বলিয়া কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না, বরং তাহা অলৌকিক বলিয়াই মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব জাগরণের যুগে জাতীয় দুই মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতকেও নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই জাতীয় পুনর্জাগরণের মধ্যে যেমন জাতীয় ঐতিহ্যের ধরাই পরিপুষ্ট হয়, বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-ধারার প্রভাব তাহার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল। এই দেশের রামায়ণ-মহাভারতকেও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য এবং জীবনের আদর্শে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস দেখা দিল। মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' পাশ্চাত্ত্য প্রেম-কাহিনীর নায়ক-চরিত্রের অনুরূপ প্রেমিক নায়ক চরিত্র সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সেইজন্য উভয়ের মধ্যে সহজ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে নাই।

কিন্তু তথাপি এ' কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে প্রখর ব্যক্তি-সচেতনতা মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্য দিয়া

প্রকট করিয়াছেন, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' তাহা প্রকাশ পায় নাই। বিশেষত বাঙ্গালীর ঐতিহ্যে রাম-লক্ষণের যে স্থান, যযাতি শুক্রাচার্যের সেই স্থান নহে, কিংবা 'শর্মিষ্ঠা নাটক' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইহার মধ্যে তাঁহার যে সকল ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মত এত ব্যাপক আলোচনার বিষয় হইতে পারে নাই। তথাপি একটি কথা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মধুসূদন তাঁহার প্রথম রচনার মধ্যেই নিজস্ব রোমান্টিক চেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, 'মেঘনাদবধ কাব্য' সেই ধারাতেই রচিত হইয়াছে মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের পরই মহাভারতের কাহিনী ব্যবহারের দিক হইতে নবীনচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এ'কথাও সত্য, নবীনচন্দ্রের প্রেরণা এই বিষয়ে মধুসূদনকে অনুসরণ করে নাই। নবীনচন্দ্রের মধ্যে এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব মধুসূদন অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয় ছিল। মধুসূদনই নব-যুগের বাঙ্গালীকে মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কথা স্মরণীয়। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' ইহারই প্রথম সূচনা।

*

৭

মধুসূদনের নাটক ও কালিদাস

বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগে কালিদাসের কয়েকখানি সংস্কৃত নাটক বাংলাভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), 'মালতীমাধব' (১৮৫৯), নন্দকুমার রায় প্রণীত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক' (১৮৫৫), উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন তাঁহার চারিখানি নাটক রচনার মধ্যে কালিদাসের নাটকের কোন আনুপূর্বিক কাহিনী অবলম্বন করেন নাই সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ক নাটকেই প্রধানত তাঁহার অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের কোন কোন অংশের বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন, কোন কোন চরিত্রের নাম তাহা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এমন কি, কোন কোন চিত্রও তাঁহার কোনও কোনও অংশের উপর নির্ভর করিয়া রচনা করিয়াছেন।

কালিদাস-কৃত সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলমে'র নাট্যাকারে অনুবাদ ব্যতীতও সে যুগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত 'শকুন্তলা' নামক গদ্য অনুবাদ রচনাটিও বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল, মধুসূদনের বিভিন্ন নাটক রচনার মধ্য দিয়া তাহারও পরোক্ষ প্রভাব অনুভূত হইবে। কিন্তু ইহাদের সকলই বহির্মুখী প্রভাব মাত্র। মধুসূদন নাটক রচনার মধ্য দিয়া বাংলা রচনার পরীক্ষামূলক কার্য করিতেছিলেন, সর্বসাধারণ বিশেষত তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের মনোরঞ্জনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যুগের প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া যে তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি জানিতেন; সেইজন্য নানাভাবে তিনি যুগ প্রভাবকে স্বীকার করিয়াই তাঁহার অনুবাদের মধ্যে কালিদাসের রচনাকে এইভাবে স্থান দিয়াছেন এ'কথাও মনে করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি, মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনার মধ্য দিয়া শৃঙ্গার-রসাত্মক নাটক 'রত্নাবলী'কে অনুসরণ করিয়াছেন। কালিদাসের দুষ্মন্ত চরিত্র প্রথমাংশে শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের নায়কেরই অনুরূপ। সুতরাং তিনি তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র নায়ক চরিত্র যযাতির মধ্যে দুষ্মন্ত রাজার আচরণকে অনুকরণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুকরণ মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার অভাবের ফল নহে, বরং তাহার পরিবর্তে প্রচলিত সাহিত্য-রস-সংস্কারের প্রতি আনুগত্যেরই ফল বলিতে হইবে। কারণ, মধুসূদনের প্রতিভা কোনদিনই অনুকরণের প্রতিভা ছিল না, তাহা সর্বদাই স্বাঙ্গীকরণের প্রয়াসী ছিল। কিন্তু তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' কিংবা অন্যান্য নাটকে তিনি কালিদাসের সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। তাহার মধ্যে কিছুই গোপন করিতে চাহেন নাই। বিদ্যাসাগর-কৃত শকুন্তলার অনুবাদ ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অনুবাদ অংশগুলি তাহা হইতে আসাও অসম্ভব কিছু নহে। কালিদাসের 'শকুন্তলা'র তুলনায় তাঁহার অন্যান্য নাটকের প্রভাব মধুসূদনের নাটকে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। কেবল-মাত্র 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকখানির সামান্য প্রভাব এক ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। অন্য আর একটি ক্ষেত্রে যে ইহার প্রভাব কেহ কেহ অনুভব করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সংশয়াতীত নহে। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মধুসূদন শকুন্তলা সম্পর্কে একটি কবিতাও রচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কালিদাস সম্পর্কেও তাঁহার একটি চতুর্দশপদী কবিতা আছে। তাহাতে তিনি কালিদাসকে 'কবিতা-নিকুঞ্জে পিককুলপতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের বহির্মুখী প্রভাব ব্যতীতও অন্তর্মুখী প্রভাব যাহা অনুভব করা যায়, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নহে। শর্মিষ্ঠার কাহিনীর মধ্যে সুদীর্ঘ দুঃখ-তপস্যা উত্তীর্ণ হইয়া শেষ পর্যন্ত কল্যাণময়

মিলনের যে ইঙ্গিত আছে, তাহা শকুন্তলার কাহিনীর মত এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। গুরু শুক্রাচার্য কণ্ব মুনির আদর্শে গড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। কণ্ব মুনির যেমন বাস্তব গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল, শুক্রাচার্যের তাহা ছিল না; মধুসূদনের শুক্রাচার্য কন্যার প্রতি স্নেহান্ধ বাঙ্গালী জনক চরিত্র মাত্র, কিন্তু কণ্ব তাহা নহে, তিনি গৃহস্থ হইলেও স্নেহে হিতাহিতজ্ঞান শূন্য নহেন, তাঁহার চরিত্রের মধ্যে শুচি এবং সংযমের পুণ্য স্পর্শ অনুভব করা যায়। শুক্রাচার্যের যযাতিকে অভিশাপ দিবার মধ্যে অন্ধ সন্তান-বাৎসল্য এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা প্রকাশ পাইয়া তাঁহার চরিত্রে নীচতার প্রশ্রয় দিয়াছে, কিন্তু কালিদাসের কণ্ব মুনি তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং আদর্শ গৃহীর চরিত্র।

কালিদাস-কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের কোন কোন অংশের বাংলা অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদের মধ্য দিয়া কালিদাসের রচনার রস ও সৌন্দর্য যে মধুসূদনের মধ্যে কিছুই ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। কালিদাসের সরস ভাষা কিংবা তাঁহার উপমার যে গুণ, তাহা মধুসূদন তাঁহার অনুকরণে রচিত সে যুগের গদ্য ভাষার ভিতর দিয়া কিছুই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই, তাহা পারিবার কথাও নহে। কালিদাসের যথার্থ মর্যাদা বাংলা সাহিত্যে যিনি রক্ষা করিয়াছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। কালিদাসের সৌন্দর্যবোধ, তাঁহার রস-চেতনা, তাঁহার উপমা সকল কিছুই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বকীয় প্রতিভার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া গদ্যেই হউক কিংবা পদ্যেই হউক তাঁহার রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাসের নাটক কাব্যধর্মী রচনা, মধুসূদনের নাটক বাংলা গদ্য রচনার এক শোচনীয় নিদর্শন। সুতরাং কালিদাসকে অনুকরণ করিবার তাহা যথাযথ ক্ষেত্র ছিল না।

এ' কথা সত্য, মধুসূদন কালিদাসকে কেবলমাত্র তাঁহার নাটক রচনার ক্ষেত্রেই অনুকরণ করেন নাই, তাঁহার কাব্যরচনার ক্ষেত্রেও সর্বত্রই অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু কাব্য-

রচনার ক্ষেত্রেও কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যত ঐক্য ছিল, মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার তত ঐক্য ছিল না। মধুসূদন শব্দশিল্পী কবি, অর্থ বিসর্জন দিয়াও তিনি শব্দ গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী—কালিদাসের মত শব্দের সঙ্গে অর্থের সার্থক সামঞ্জস্য করিতেও দক্ষ ছিলেন না। এই দক্ষতা রবীন্দ্রনাথের ছিল, কিন্তু মধুসূদনের ছিল না। সুতরাং কালিদাসের অনুসরণ কিংবা স্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে, মধুসূদনের সাহিত্য সেই গুণে সমৃদ্ধ হইতে পারে নাই। কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন স্থান হইতে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য সংক্ষিপ্ত অংশের অনুবাদ করিয়া দিয়া সংস্কৃত নাটকের প্রতি তাঁহার আনুগত্যই দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহা দ্বারা তিনি তাঁহার রচনার মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই।

সংস্কৃত নাটক অনুবাদের যে একটি সংস্কার সে যুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল, মধুসূদন তাহার বশবর্তী হইয়া তাঁহার রচিত নাটকে কালিদাসের কোন কোন অংশের বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। নাটক রচনায় মধুসূদন যে যুগধর্মের প্রতি আনুগত্য দেখাইয়াছেন, ইহা তাহারই ফল-স্বরূপ বলিতে হয়।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে, মধুসূদন কেবলমাত্র তাঁহার মহাভারতের কাহিনীমূলক সর্বপ্রথম রচনাতেই যে কালিদাসের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি তাঁহার জীবনের শেষ প্রান্তে অসিয়া যে সর্বশেষ নাটকটি রচনা করিয়াছেন, সেই 'মায়াকানন' নাটকেও এই প্রভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অবশ্য এ কথা সত্য, 'মায়াকানন' রচনায় মধুসূদনের প্রতিভা অস্তমিত হইয়াছে, পূর্ববর্তী রচনার ধারা অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁহার আর কোন উপায় সে দিন ছিল না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, তাঁহার পূর্ববর্তী বিভিন্ন বিষয়ক নাট্যরচনাও কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র বহির্মুখী প্রভাব হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে মুক্ত নহে। গ্রীক্ উপাখ্যান লইয়া রচিত তাঁহার 'পদ্মাবতী'

নাটকে' কিংবা ইংরেজী আদর্শে রচিত ট্রাজিডি রাজস্থানের কাহিনী-ভিত্তিক রচনা 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের বহির্মুখী কিছু কিছু প্রভাব অনুভব করা যায়। কিন্তু কালিদাসের কোন নাটকেরই সুগভীর অন্তর্মুখী প্রভাব মধুসূদনের কোন নাটকের ভাবাদর্শের উপরই স্থাপিত হইতে পারে নাই; 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' শূদ্রক রচিত সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিক নাটকে'র কিছু কিছু অন্তর্মুখী প্রভাব অনুভূত হয় মাত্র। একমাত্র 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র সংলাপই তিনি তাঁহার বিভিন্ন নাট্য-রচনায় অধিক সংখ্যায় বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। অন্যান্য কোন কোন নাটক হইতে তিনি ভাবানুবাদ করিয়াছেন মাত্র।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' হইতে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' বাংলা অনুবাদের কিছু নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যেমন, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অঙ্কের একটি শ্লোক হইতে মধুসূদন নিম্নোদ্ধৃত অংশ অনুবাদ করিয়াছেন।

'আহা সখে তার কি রূপ-মাধুর্য! তার পদ্মনয়ন দর্শন কর্‌লে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রতিসর্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে।'

শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রিয়ম্বদার একটি উক্তিকে মধুসূদন এইভাবে ভাবানুবাদ করিয়াছেন।

'একদিন আমি এক নদীতটে ভ্রমণ কত্যে কত্যে এক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতল কপোলে বিন্যাস ক'রে অশোক বৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হ'ল যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে।' ('শর্মিষ্ঠা' ২।২)

শকুন্তলা নাটকে কণ্ব মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিবার পর দুষ্মন্ত যেমন বলিয়াছিলেন,

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র॥

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র ২য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্কের রাজা যযাতির একটি উক্তির সঙ্গে ইহার তুলনা করা যাইতে পারে,

'একি আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হ'তে লাগলো কেন? এস্থলে মাদৃশ জনের কি ফল প্রাপ্ত হতে পারে? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই মুক্ত রয়েছে। দেখি বিধাতার মনে কি আছে!

ইহা কালিদাসের শ্লোকের সম্পূর্ণ ভাষানুবাদ! এই প্রকার অন্যান্য আরও বহু সংলাপের মধ্যেই কালিদাসের অনুরূপ প্রভাব অনুভূত হইবে।

'পদ্মাবতী নাটকে'র মধ্যেও মধুসূদন অনেক ক্ষেত্রে কালিদাসের ভাষার অনুবাদ করিয়াছেন, যেমন 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অঙ্কেই পাওয়া যায়, পলায়মান মৃগশিশুকে অনুসরণ করিয়া রাজা দুষ্মন্ত দৃশ্যে প্রবেশ করিলেন, 'পদ্মাবতী নাটকে'ও তদনুরূপ দৃশ্যে তদনুসারী সংলাপ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত, সে বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

মধুসূদনের সর্বশেষ নাট্যরচনা 'মায়াকানন'। তাহাতেও কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের ব্যাপক প্রভাব অনুভব করা যায়। ইহা সংস্কৃত নাটকের ধারা অনুযায়ী রচনা নহে, বরং 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মতই ট্রাজিডি, তবে ইহা সেক্সপীয়রের আদর্শে রচিত নহে, বরং তাহার পরিবর্তে প্রাচীন গ্রীক্ নাটকের আদর্শেই রচিত। ইহাতেও কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের প্রসঙ্গে এই প্রকার উল্লেখ আছে।

'শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দেখে রাজা দুষ্মন্তের হৃদয়ই তাঁকে পরিচয় দিয়েছিল, "ঐ যে ঋষিপালিত স্ত্রীরত্ন, উনি কখনই ব্রাহ্মণ-কন্যা নন।" আমার হৃদয়ও তেমনি আমাকে এই কথা বল্‌ছে,—তোমাদের ঐ সখী বণিক-কন্যা নন।'—১।১

ইহা ছাড়া আরও কোন কোন চিত্র, চরিত্র কিংবা চিত্রকল্পে 'মায়াকানন' নাটকে কালিদাসের প্রভাব স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায়, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও মধুসূদন কালিদাসের প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

*

৮

পাশ্চাত্ত্য নাটক ও মধুসূদন

মধুসূদনের নাটকের উপর সংস্কৃত নাটকের বহির্মুখী কিংবা অন্তর্মুখী প্রভাব যাহাই থাকুক না কেন, তাহা যে সংস্কৃত আদর্শ অনুসরণ করিয়া রচনা নহে, বরং তাহার পরিবর্তে এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য প্রেরণাই তাঁহার মধ্যে সক্রিয় ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এমন কি, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র কিয়দংশ রচনা করিবার পর মধুসূদন যখন তাহা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক যতীন্দ্রমোহনের অনুমোদনের জন্য পাঠাইলেন, তখন যতীন্দ্রমোহন তাহা মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিকট পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। মহামহোপাধ্যায় তাহার সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া দিলেন, 'সংস্কৃতরীতি অনুসারে ইহা নাটকই হয় নাই, কাটকুট করিলে রচনাটি সমুদয়ই নষ্ট হইবে, আমার ইহা সংশোধন করিবার ইচ্ছা নাই। বোধ হয় ইহা কোন ইংরেজি শিক্ষিত, নব্যবাবুর রচনা হইবে।'.........

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাহিরের দিক দিয়া 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' কিংবা অন্য কোন সংস্কৃত নাটককে যে ভাবেই অনুসরণ করিয়া মধুসূদন তাঁহার বাংলা নাটক রচনা করুন না কেন, তাহা সংস্কৃত ভাবাপন্ন নাটক বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই, পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শ হইতে ইহার প্রাণের প্রেরণা আসিয়াছিল। সেইজন্যই প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ইহার সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন যে, 'ইহা কোন ইংরেজি শিক্ষিত, নব্যবাবুর রচনা!'

'শর্মিষ্ঠা' কিংবা মধুসূদনের কোন নাটকেই সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী নান্দী-সূত্রধার নাই। নান্দী-সূত্রধারকে পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া নাটক রচনার প্রেরণা যে পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্য

হইতেই আসিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র একটি প্রধান বিষয়ে মহাভারতের আদর্শকে অনুসরণ না করিয়া পাশ্চাত্ত্য জীবন এবং সাহিত্যকে অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। মহাভারতে দেখা যায়, দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা উভয়েই উপযাচিকা হইয়া রাজা যযাতির পাণিপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাতে যযাতির চরিত্র-মহিমা বৃদ্ধি পাইলেও দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার চরিত্র আধুনিক দৃষ্টিতে হীন বলিয়া অনুভূত হয়। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য সমাজ এবং নারীজীবনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানীকে এই হীনতা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। তিনি তাহার পরিবর্তে যযাতিকেই দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা উভয়ের প্রতি অনুরাগী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ভারতীয় আদর্শে ইহাতে রাজা যযাতির চরিত্রে হীনতা স্পর্শ করিলেও দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গিয়াছেন। ইহা কখনও সংস্কৃত পণ্ডিতের অনুমোদন লাভ করিতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রেরণা বশত স্ত্রী-চরিত্র সম্পর্কে এ'দেশের সমাজেও যে নূতন ভাবনার উদয় হইয়াছিল, দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা চরিত্রে মধুসূদন তাহারই প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহার পরবর্তী নাটকগুলিতেও কোন স্ত্রী-চরিত্রকেই তিনি ভারতীয় সনাতন আদর্শের প্রতীকৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান নাই। সুতরাং এখানেই মধুসূদনের নাটকের উপর পাশ্চাত্ত্য নাটকের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় প্রভাব অনুভূত হইবে। ইহা ছাড়াও কেহ কেহ মনে করেন, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে সেক্সপীয়র প্রণীত 'হ্যামলেট্' নাটকের প্রথম দৃশ্যের ভাবগত সামঞ্জস্য আছে। তবে সেক্সপীয়র রচিত *As You Like It* নাটকের দুই সখীর ছদ্মবেশে ভ্রমণ ব্যাপারের সঙ্গে যে 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের দেবযানী ও তাঁহার সখী পূর্ণিকার ছদ্মবেশে ভ্রমণ-বৃত্তান্তের যোগ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাতে সেক্সপীয়রের সংলাপের ভাষার অনুকরণ করা হয় নাই সত্য,

তথাপি চিত্রটির জন্য যে মধুসূদন সেক্সপীয়রের নিকট ঋণী, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনার পর মধুসূদন যে দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ তাহা ফরাসী কৌতুকরসাশ্রিত নাট্যরচয়িতা মলিয়ারের কোন কোন রচনার অনুকরণ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। এ'কথা সত্য, ইহাদের মধ্যে যে সমাজ-দর্শন এবং তাহার প্রতি ব্যঙ্গের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিসুলভ; কিন্তু তাহা হইলেও কাহিনী এবং চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে মধুসূদন মৌলিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

মধুসূদন তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটকে'র কাহিনীটি গ্রীক্ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কেবলমাত্র চরিত্রগুলিতে ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, ইহার কাহিনীই যে কেবলমাত্র পৌরাণিক নহে, তাহা নহে, ইহা ভারতীয় জীবনাদর্শের বিরোধী রচনা। ইহার বিষয় তিনটি দেবীর মধ্যে সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতা। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শে ইহার কোন স্থান নাই, দৈহিক সৌন্দর্য লইয়া নারীচরিত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার কোন কল্পনা ভারতীয় সমাজে স্থান পাইতে পারে না। মধুসূদনের এই নাটকখানির লোক-প্রীতির অভাবের ইহা একটি প্রধান কারণ। পাশ্চাত্ত্য একটি কাহিনীকে অনুপূর্বিক ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যে প্রকাশ করিবার প্রয়াস ইহাতে ব্যর্থতা লাভ করিয়াছে, ইহার সমন্বয় সাধন সার্থক হইতে পারে নাই।

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটক। ইহার বিষয়বস্তু নির্বাচন, চরিত্র-সৃষ্টি এবং কাহিনীর পরিকল্পনা ইত্যাদি সকল বিষয়ের মধ্য দিয়াই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথমত ইহা পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত 'ট্রাজিডি'। ভারতীয় সাহিত্যে 'ট্রাজিডি' কিংবা বিয়োগান্তক রচনার কোন স্থান নাই,

যদিও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিয়োগান্তক নাটক রচিত হইয়াছে, তথাপি পাশ্চাত্ত্য আদর্শে ট্রাজিডি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা মধুসূদনই সর্বপ্রথম রচনা করেন, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ই মধুসূদনের সেই রচনা। পাশ্চাত্ত্য আদর্শের প্রেরণাকে স্বীকার করিয়াও এতদিন মধুসূদনকে এই বিষয়ে পরমুখাপেক্ষিতার জন্য নিতান্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল; কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনাকালে মধুসূদনের মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল, তাহারই ফলে তিনি পরিপূর্ণভাবে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে স্বীকার করিয়া 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ কথা সত্য, ইহার মধ্যেও তিনি কালিদাসের সংস্কৃত নাটক কিংবা শূদ্রক কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় রচিত 'মৃচ্ছকটিকা'র কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়াছেন, কিংবা তাহার অনুরূপ চরিত্র-সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি ইহারা বহিরঙ্গ লক্ষণ ব্যতীত কিছুই নহে; 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র অন্তর্মুখীন পরিচয়ে ইহা পাশ্চাত্ত্য প্রভাব-জাত।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র ঐতিহাসিক কাহিনী এবং ট্রাজিডি পরিণতির মধ্য দিয়াই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের রূপটি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া কোন নাটক রচিত হয় নাই, তেমনই ট্রাজিক পরিণতিও কোন ভারতীয় নাট্য-রচনায় দেখা যায় নাই। 'মৃচ্ছকটিকা' নাটক সংস্কৃতে বিয়োগান্তক নাটকের একমাত্র নিদর্শন, কিন্তু তাহাও একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম বলিয়াই সকলে মনে করেন। ইহার চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

মধুসূদনের নাটকের উপর যেমন সংস্কৃত নাট্যকারদিগের মধ্যে কালিদাসের নাটক বিশেষত তাহার একখানি নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলমে'র প্রভাবই সর্বাধিক, পাশ্চাত্ত্য নাটকের মধ্যে কোন নাট্যকার কিংবা তাঁহার কোন নাটকের প্রভাব তাঁহার মধ্যে সর্বাধিক লক্ষিত হয়, তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য।

মধুসূদন তাঁহার কাব্য রচনায় পাশ্চাত্ত্য কবি হোমর, দান্তে, ভার্জিল, ওভিদ, মিলটন্ ইত্যাদি অনেককে অনুসরণ করিলেও নাট্যরচনার ক্ষেত্রে প্রধানত সেক্সপীয়রকেই অনুসরণ করিয়াছেন। এ'কথা সত্য, প্রাচীন গ্রীক্ নাটকের নিয়তিবাদের প্রভাবও তাঁহার নাটকের কোন কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা গৌণভাবেই তাঁহার নাটকে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়, প্রত্যক্ষভাবে আসে নাই। একটি নাটকের মধ্যে গ্রীক্ কাহিনী অবলম্বন করিলেও প্রাচীন গ্রীক্ নাটকের ব্যাপক প্রভাব তাঁহার নাটকে অনুভব করা যায় না। কেবলমাত্র বিক্ষিপ্তভাবে কোন কোন চরিত্র কিংবা ঘটনার মধ্যে তাহার আভাস পাওয়া যায় মাত্র। সেক্সপীয়রের নাটককেই তিনি ব্যাপকতর ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' সেক্সপীয়রের *As You Like It* নাটকের প্রভাবের কথা পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র বহু অংশেই তিনি সেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকের চিত্র, চরিত্র এবং সংলাপ অনুসরণ করিয়াছেন। সে কথা পরবর্তী নিবন্ধে বিস্তৃততর ভাবে উল্লেখিত হইবে।

৯

মধুসূদনের নাটক ও সেক্সপীয়র

মধুসূদন প্রাচীন গ্রীক্ নাট্যকারদিগের মত নিয়তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, সেক্সপীয়র মানব-চরিত্রের গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার মধ্যেই নিয়তির লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য' দৈব বা নিয়তিবাদ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুসূদন তাঁহার নাট্যরচনায় সেক্সপীয়রের প্রভাবও নানাভাবে অনুভব করিয়াছেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেক্সপীয়রের নাটক আবৃত্তি করিয়াছেন। মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রেরণা যতখানি মিল্‌টনের কাব্যরচনা হইতে আসিয়াছে, ততখানিই সেক্সপীয়রের নাটকের কাব্যসংলাপ হইতে আসিয়াছে। তাঁহারই অনুকরণে মধুসূদন তাঁহার রচিত নাটকেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে সংলাপ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের বিরোধিতার জন্যই তাঁহার সেই অভিলাস নাটক রচনার ক্ষেত্রে কার্যে রূপান্তরিত করিতে পারেন নাই।

মধুসূদন তাঁহার মিলনান্তক কিংবা বিয়োগান্তক উভয় শ্রেণীর নাটক রচনাতেই সেক্সপীয়রের নাটকের কোন কোন চিত্র, চরিত্র কিংবা সংলাপের ভাষা অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথমেই 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে 'হ্যামলেট' নাটকের প্রথম দৃশ্যের তুলনা করা যাইতে পারে। এখানে মধুসূদন সেক্সপীয়রের ভাষার বঙ্গানুবাদ করেন নাই সত্য, তথাপি চিত্রটির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, কিংবা তাহাতে যে সংলাপ যোজনা করিয়াছেন, তাহা সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে। অনুরূপ রহস্যঘন ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা কোন সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় না। সুতরাং যে নাটক-কাহিনী এবং চরিত্র-সৃষ্টির

দিক দিয়া বাহ্যত সংস্কৃত নাটককেই অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইবে, তাহার প্রথম দৃশ্যটিই যে সেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শে রচিত, তাহা হইতে মধুসূদনের উপর সেক্সপীয়রের প্রভাব যে কত শক্তিশালী ছিল, তাহা অনুভব করা যায়। তবে ইহা বহিরঙ্গ গঠনের দিক হইতেই সত্য। পূর্বেই বলিয়াছি, আদর্শ বা ভাবের দিক দিয়া মধুসূদন প্রাচীন গ্রীক্ নাট্যকারদিগের মত নিয়তিবাদে বিশ্বাসী এবং সেক্সপীয়র মানব-চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রহস্যের মধ্যেই নিয়তির লীলা প্রত্যক্ষকারী। প্রবৃত্তির প্রাবল্যের মুখে মানুষ যে কত অসহায়, সেক্সপীয়রের মত মধুসূদন তাঁহার কোন নাটকেই তাহা নির্দেশ করেন নাই, বরং একখানি নাটকে দৈবের সম্মুখে তাহার অসহায়তার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি মধুসূদন তাঁহার নাটক রচনায়, বিভিন্ন সংলাপে সেক্সপীয়রের ভাষা এবং তাহার চিত্র ও চরিত্রের যে পরিমাণ অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা উপেক্ষণীয় নহে।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র আরও একটি দৃশ্যের উপর যে সেক্সপীয়রের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। যযাতির রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরীর সন্নিকটে যমুনা নদীতীরবর্তী একটি অতিথিশালায় গুরু শুক্রাচার্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কন্যা দেবযানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অভিলাসে তিনি নিজের আশ্রম হইতে বাহির হইয়াছিলেন। সেখানে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দেবযানী এবং তাহার সখী পূর্ণিকা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেক্সপীয়রের সুপরিচিত মিলনাত্মক নাটক *As You Like It* হইতে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ গৃহীত হইয়াছে। তবে এ'কথা সত্য, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র উপর সেক্সপীয়রের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ, প্রধানত ইহা তাঁহার পরমুখাপেক্ষী প্রথম রচনা, সেইজন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ইহাতে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। পরবর্তী নাটক দুইখানিতে মধুসূদনের উপর সেক্সপীয়রের প্রভাব অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্যে এই প্রভাব সর্বাধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রথমেই লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় সাহিত্যের সংস্কারকে উপেক্ষা করিয়া মধুসূদন সে দিন যে বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে ট্রাজিডি রচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উপর কেবল মাত্র সেক্সপীয়রের নাটকের প্রভাবের ফল বলিলে ভুল হইবে, ইহাতে মধুসূদনের উপর প্রাচীন গ্রীক্ ট্রাজিডিগুলিরও প্রভাব অনুভব করা যায়। কারণ, গ্রীক্ ট্রাজিডির মূল আদর্শের সঙ্গে মধুসূদনের কাব্যাদর্শের যোগ ছিল বলিয়াই অনুভূত হয়। তথাপি এ'কথা সত্য, কোন প্রাচীন গ্রীক্ ট্রাজিডির ভাষা কিংবা চিত্র তিনি তাঁহার নাটকে অনুসরণ করেন নাই ; হয়ত গ্রীক্ ট্রাজিডির আদর্শ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইয়া থাকিলেও সেক্সপীয়রের চিত্র, চরিত্র এবং সংলাপ তিনি তাঁহার নাটকের অনেক ক্ষেত্রেই অনুকরণ করিয়াছেন।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র বলেন্দ্রসিংহের চরিত্রে মধুসূদন সেক্সপীয়রের *The Life and Death of King Henry IV* নাটকের ফিলিপ চরিত্রের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এখানে সংলাপের যে একেবারে আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে, তাহা নহে, এখানে চরিত্রই আনুপূর্বিক সেক্সপীয়রের উক্ত চরিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছে।

তারপর কৃষ্ণকুমারীর হত্যার পর রাণা ভীমসিংহের উন্মাদ আচরণ সেক্সপীয়রের *King Lear* নাটকের নায়ক চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ। যদিও সেক্সপীয়রের অনুকরণে বাংলা নাটকে উন্মাদ চরিত্রের আচরণ ইতিপূর্বেই দেখা গিয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যে তাহা আরও প্রত্যক্ষ, সে যুগের বাংলা নাটকে তাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত না হইলেও অন্যান্য অনুরূপ সৃষ্টির তুলনায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মদনিকা স্ত্রীচরিত্রটির পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিবার চিত্রটি সেক্সপীয়রের *As You Like It* নাটকের একটি স্ত্রীচরিত্রের প্রভাবজাত, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেক্সপীয়রের ফলষ্টাফ চরিত্রেরও কিছু কিছু প্রভাব 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র কোন কোন অংশে অনুভব করা যায়। মধুসূদনের সর্বশেষ

নাট্যরচনা 'মায়া-কানন'। ইহাও 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মত ট্রাজিডি। ইহার মধ্যেও ট্রাজিডির জন্য নিয়তিকে মধুসূদন যতখানি দায়ী বলিয়া মনে করিয়াছেন, মনুষ্য-চরিত্রের কোন দুর্বলতাকে তত দায়ী করেন নাই। সুতরাং ইহার উপর সেক্সপীয়রের নাটকের প্রভাব অপেক্ষা প্রাচীন গ্রীক্ নাটকের প্রভাব বেশী।

প্রাচীন গ্রীক্ নাটকের প্রভাব সত্ত্বেও 'মায়া-কানন' নাটকে সেক্সপীয়রের নাটকের বহির্মুখী প্রভাবের পরিমাণও নিতান্ত নগণ্য নহে। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের প্রেত-চরিত্রের অনুরূপ ইহাতেও মৃত মহারাজের প্রেত-রূপে আবির্ভাব। ইহার তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের অনুরূপ একটি দৃশ্যের একান্ত সমতুল্য। নিম্নোদ্ধৃত অংশটি একটু অনুসরণ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে,

(শিব মন্দিরের পশ্চাৎ হইতে পট্টবস্ত্রাবৃত বৃদ্ধ রাজর্ষির আকারবিশিষ্ট পুরুষের প্রবেশ)

মন্ত্রী। (সকম্পিত শরীরে গাত্রোত্থান করিয়া) এ কি! এ কি। (করজোড় করিয়া) হে নরনাথ! আপনি স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে, কেন এ পাপ মর্ত্যে পুনরাগমন ক'রেছেন? আপনার কি আজ্ঞা?

আত্মা। (গম্ভীর বচনে) চাণক্য! অজয় কুক্ষণে পাপ মায়া-কাননে গান্ধারাধিপতির কন্যাকে দর্শন করেছেন। এতদিনের পর এই পুরাতন বৃহৎ রাজবংশ ধ্বংস হয়। এখনও যদি পার, তবে পাঞ্চালাধিপতির দুহিতার সহিত তাঁর পরিণয় ব্যাপার সমাধা করাও। নচেৎ আর রক্ষা নাই; সাবধান হও। (অন্তর্ধান)

সুতরাং দেখা যায়, 'মায়া-কানন' রচনায় প্রাচীন গ্রীক্ নাটকের আদর্শ যতই শক্তিশালী হউক না কেন, সেক্সপীয়রের নাটকের বহির্মুখী প্রভাবও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল না। তারপর 'মায়া-কানন' নাটকেও যে রাজার উন্মাদ দৃশ্য আছে, তাহাও সেক্সপীয়রের নাটকেরই প্রভাবজাত।

পূর্বেই বলিয়াছি, মধুসূদনের নাটক সর্ববিষয়ে সেক্সপীরীয় ট্রাজিডির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত নহে। তাঁহার দুইখানি নাটক মিলনাত্মক, ইহাদের সঙ্গে সেক্সপীয়রের জীবন কিংবা সাহিত্য-দর্শনের কোন সম্পর্ক নাই। অবশিষ্ট দুইখানি নাটক ট্রাজিডির আদর্শ অনুসরণ করিয়া লিখিত হইলেও, সেক্সপীয়রের ট্রাজিডির আদর্শ তাহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল না। মধুসূদনের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক্ বিয়োগাত্মক নাটকের প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় ছিল; সেইজন্য তাঁহার ট্রাজিডি দুইখানি অবিমিশ্র সেক্সপীয়রের প্রভাবের ফল বলিয়া কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না। মধুসূদন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়াই হউক, কিংবা প্রাচীন গ্রীক্ ট্রাজিডি অধ্যয়নের ফলেই হউক, নিয়তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। হয়ত ইহার মধ্যে তাঁহার জাতীয় জীবন-সংস্কারেরও প্রভাব ছিল। তিনি তাঁহার ট্রাজিডি এবং মহাকাব্য উভয়ের রচনাতেই অভিন্ন প্রকৃতিরই নিয়তিবাদকে অবলম্বন করিয়াছেন।



১০

কবি মধুসূদন ও নাট্যকার মধুসূদন

কবি মধুসূদনের প্রতিভার আর একটি প্রধান বিস্ময় এই যে, যদিও তিনি প্রধানত কবি এবং গীতিকবি তথাপি নাটক রচনার মধ্যে তাঁহার কাব্য-প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী আর দুইজন কবি-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে কিন্তু এই কথা বলিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথও প্রধানত গীতিকবি, তাঁহার গীতিকবি-সুলভ মনোভাব তাঁহার সকল নাট্যসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনা মাত্রই কাব্যভাবাপন্ন। কারণ, যাঁহারা গীতিকবি তাঁহাদের কবি-স্বভাব কোথাও বিসর্জন দিয়া তাঁহাদের কোন সৃষ্টিকে যথার্থ রূপায়িত করিতে পারেন না? এমন কি, যাঁহারা একান্ত আত্মভাবপরায়ণ (subjective) গীতি-কবিও নহেন, মহাকাব্য কিংবা বর্ণনামূলক অন্য কোন শ্রেণীর কাব্যরচনায় অভ্যস্ত, তাঁহাদের নাট্যরচনার মধ্যেও তাঁহাদের কাব্য-বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ না করিয়া পারে না। মধুসূদনের কোন নাটক পাঠ করিলেই এই কথা বুঝিতে পারা যাইবে না যে, তাঁহার মধ্যে একটি কবি-মানস সুপ্ত হইয়া আছে। ইহা আরও বিস্ময়ের বিষয় এইজন্য যে, তাঁহার নাটক এবং কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রচনাকালের ব্যবধান কিছুই নাই, একই কালে তিনি তাঁহার নাটক এবং কাব্যগ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি?

প্রথমত দেখা যায়, কাব্যই মধুসূদনের প্রতিভার স্বক্ষেত্র ছিল, নাটক কদাচ তাহা ছিল না। কাব্য তাঁহার ভিতর হইতে স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছে, মাদ্রাজ-প্রবাস জীবনেই তিনি তাঁহার ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ধারা তাঁহার মনের ভিতরে কোনদিনই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে নাই। নাটক

কোনদিনই তাঁহার প্রতিভার স্বক্ষেত্র হইতে রচিত হয় নাই। পরের অনুরোধে তিনি নাটক রচনা করিয়াছেন, নিজের প্রেরণায় তিনি কাব্য রচনা করিয়াছেন, নাট্যরচনার সঙ্গে কোনদিনই তাঁহার প্রাণের কোন যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেই কি ইহা সম্ভব হইতে পারে?

আমরা ত জানি যে, নাটক রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বক্ষেত্র হইতে উৎসারিত হয় নাই, তাঁহার প্রতিভারও স্বক্ষেত্র ছিল, গীতি-কবিতা। তথাপি নাটক রচনার মধ্যে তাঁহার কবি-মানসের সমগ্র প্রেরণাই মুদ্রিত হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-মানসকে বিসর্জন দিয়া তাঁহার নাটক রচনা করেন নাই বলিয়াই তাঁহার নাট্যরচনা একান্ত গীতিধর্মী হইয়াছে। তবে একথা সত্য মধুসূদন যেমন অন্যের অনুরোধে অন্যের মনস্তুষ্টির জন্য নাটক রচনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই—রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার প্রেরণাতেই নাটক রচনা করিলেও তাঁহার নিজের প্রেরণাতেই তাহা করিয়াছেন, অন্যের অনুরোধে, অন্যের মনস্তুষ্টির জন্য তাহা করেন নাই। মধুসূদনের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে।

মধুসূদন তাঁহার নাটকের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে যত যত্ন লইয়াছেন, ইহাদের অন্তর্মুখীন ভাববিন্যাসের জন্য সে যত্ন লন নাই। যাহাতে তাঁহার নাটক 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদের কোন ব্যতিক্রম না হয়, সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন ছিল, অথচ নাট্যরচনার যে প্রভাব পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রেরণাও তিনি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারিতেছেন না, সুতরাং তাহা যতখানি আঙ্গিকগত ছিল, ততখানি ভাবগত ছিল না।

পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুকরণে বাংলা নাটক রচনা করিবার প্রথম যুগে নাট্যদেহের গঠনকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিবার যে দায়িত্ব ছিল, তাহাই তিনি পালন করিতে ব্যগ্র ছিলেন—ইহার অন্তর্বস্তুর প্রতি ততখানি মনোযোগী হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ যখন

প্রথম জীবনে তাঁহার গীতিনাট্যগুলি রচনা করিতে থাকেন, তখন পাশ্চাত্ত্য নাটকের আঙ্গিকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রাখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এমন কি, প্রয়োজন থাকিলেও তাহা তাঁহার স্বীকার করিবার কোন কারণ ছিল না। নিজের প্রেরণায় যেমন তিনি গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, তেমনই নিজের প্রেরণায় তিনি গীতিধর্মী নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গীতিনাট্যগুলি নাটক হইল না বলিয়া কেহ অভিযোগ করিবার ছিল না। কিন্তু মধুসূদনকে তাঁহার নাটকের বহির্মুখী আঙ্গিকের উপরই প্রধানত লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল, কারণ, ভাবের কিংবা অন্তর্বস্তুর দিক দিয়া যাহাই হউক না কেন, বহিরঙ্গে তাঁহার রচনাগুলির নাটকের রূপ গ্রহণ করিবার অবশ্য প্রয়োজন ছিল। অবশ্য নিজের প্রয়োজন তাঁহার কিছুই ছিল না, তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের জন্য তাঁহার প্রয়োজন ছিল। সেই জন্যই বহিরঙ্গের দিকে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া তিনি ইহাদের অন্তরঙ্গের সঙ্গে নিজস্ব ভাবনার কোন যোগ স্থাপন করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের নাট্যরচনা তাঁহার জীবনের একটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ইহা তাঁহার কাব্যরচনার সঙ্গে কোন যোগরক্ষা করিতে পারে নাই। কারণ, তাঁহার নাট্যরচনার মধ্যে তাঁহার আত্মস্ফূর্তির অবকাশ হয় নাই, কেবলমাত্র কাব্যের ক্ষেত্রেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তাঁহার আত্মস্ফূর্তি সম্ভব হয় নাই বলিয়াই তিনি যে সেই উদ্দেশ্যে কাব্যের ক্ষেত্র সন্ধান করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা মধুসূদনের জীবনী হইতেই জানিতে পারা যায়।

তবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দেই তাঁহার নাটক রচনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকদিগের তাহা মনঃপূত না হওয়ার জন্য তাঁহার সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তথাপি তিনি তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটক' রচনায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য-সংলাপ রচনা

করিলেন। কিন্তু ইহার আকৃতি এবং প্রকৃতি তাঁহার পরবর্তী কালে অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে স্বতন্ত্র ছিল, ইহারই ধারা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে নাই, 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' হইতে নূতন প্রকৃতিতে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ধারা তাঁহার মধ্যে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল।

'পদ্মাবতী নাটকে' তিনি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রথমতঃ চৌদ্দ অক্ষরের পদ স্বীকার না করিয়া যতি স্থানেই চরণচ্ছেদ করিয়া সংক্ষিপ্ততর পদের সহায়তা লইয়াছেন যেমন,

কলি। (স্বগত) আমি কলি,—
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম ?
সতত কুপথে গতি মোর।
নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার—
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে। ৪।১

সুতরাং এই অমিত্রাক্ষর তাঁহার পরবর্তী কালে মহাকাব্যে রচিত অমিত্রাক্ষর নহে। অত্যন্ত সামান্য পরিমাণেই এই শ্রেণীর অমিত্রাক্ষর তিনি তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটকে' রচনা করিয়াছেন, ইহা পরীক্ষামূলক ভাবেই রচিত হইয়াছিল; সেইজন্য সমগ্র নাটকেও ইহা স্বাভাবিক সূত্রে অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই, নাটকের যেন একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র হইয়া আছে। পরবর্তী অমিত্রাক্ষর রচনায় মধুসূদন যতিস্থানে চরণচ্ছেদের এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অনিয়মিত বিন্যস্ত যতি সত্ত্বেও তিনি চৌদ্দ অক্ষরের পদকে স্বীকার করিয়াছেন।

'পদ্মাবতী নাটকে'র উদ্ধৃত অংশটুকু ব্যতীত আরও একটু সামান্য অংশে মধুসূদন আরও সামান্য কয়েকটি কাব্যসংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাকে যথার্থ অমিত্রাক্ষর বলা যায় না। তাহা নিতান্ত বৈচিত্র্য-বিসর্জিত মিলহীন পয়ারমাত্র, তবে ইহাদের মধ্য দিয়াই যে মধুসূদনের ভবিষ্যৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দ জন্মলাভ

করিতেছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না। তথাপি এ'কথাও সত্য, তিনি তাঁহার পরবর্তী আর কোন নাটকে অনুরূপ প্রয়াস দেখান নাই, 'পদ্মাবতী নাটকে'র বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার সর্বশেষ রোমান্টিক নাট্যরচনা যে 'মায়া-কানন', তাহার মধ্যেও অনুরূপ প্রয়াস আর দেখা যায় নাই। অথচ ইহা রচনার পূর্বে তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সকল কাব্যগ্রন্থেরই রচনা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

তবে এ'কথা সত্য, 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করিতে গিয়া মধুসূদনকে মহাভারত পাঠ করিতে হইয়াছিল, সেইজন্য 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনায় মহাভারতের কাহিনী এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারাও 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র কাহিনীর সঙ্গে কোন যোগসূত্র রচনা করিতে পারে নাই। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' কিংবা 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার সঙ্গে মধুসূদনের নাট্যরচনার ধারা কোনদিক দিয়াই কোন যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। এমন কি, মধুসূদনের প্রহসনগুলিও তাঁহার সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, কোনদিক দিয়াই ইহারা কেবলমাত্র তাঁহার রচিত কাব্যের সঙ্গেই নহে, তাঁহার নাটকের সঙ্গেও কোন যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, মধুসূদনের প্রতিভার স্বক্ষেত্র গীতি-কবিতা। সেইজন্য তিনি তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে যে সকল সঙ্গীত যোজনা করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহাদেরই সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার পরবর্তী গীতি-কবিতার যোগ অনুভব করা যায়। কিন্তু সঙ্গীতগুলি নাট্যকাহিনীতে স্বাভাবিকভাবে অন্তর্নিবিষ্ট নহে; সেইজন্য ইহারাও সামগ্রিকভাবে তাঁহার পরবর্তী কোন রচনার সঙ্গে কোন প্রকারেই যোগ রক্ষা করিতে পারে নাই। দুই একটি মাত্র সঙ্গীতের মধ্যে পরবর্তী কোন রচনার পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে মাত্র। 'পদ্মাবতী নাটকে'র নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সুর ধ্বনিত হইতে শুনিতে পাওয়া যায়।

(শচীর গীত)

মধুর বসন্ত আগমনে,
মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুল কাননে।
কত পিকবরে
পঞ্চমে কুহরে
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে॥
উপবন যত
সৌরভ বাসিত,
সতত মলয় সমীরণে॥
সুখের কারণ,
বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে॥ —৫।১

'পদ্মাবতী নাটক' ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ইহার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচিত হয়। সুতরাং ইহার মধ্যে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে।

নাটকের সঙ্গীতগুলি রচনার দিক দিয়া নাটকের মধ্যে বিচ্ছিন্ন বলিয়া এবং মধুসূদনের কবি-প্রতিভার স্বক্ষেত্রে ইহাদের বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া কেবলমাত্র ইহাদের সঙ্গেই তাঁহার পরবর্তী কোন কোন রচনার যোগ অনুভব করা গেলেও অন্যত্র তাহা সুলভ নহে।

*

১১

মধুসূদনের রোমান্স-চেতনা ও বস্তুবোধ

মধুসূদনের প্রতিভার মধ্যে কতকগুলি পরস্পর বিরোধী শক্তি ছিল। প্রথমত তিনি মহাকাব্য রচনা করিলেও তাঁহার প্রত্যেকটি মহাকাব্যের উপর দিয়াই গীতিকাব্যের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মহাকাব্যগুলি তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত (objective) রচনা হইতে পারে নাই; যদিও মহাকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহাই। অথচ নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার এই আত্মনির্লিপ্ততার গুণ কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যেমন অন্তরে-বাহিরে গীতিকবি, কোন রচনার মধ্য দিয়াই তিনি তাঁহার আত্মগত মনোভাব বিসর্জন দিতে পারেন নাই, মধুসূদন তাহা ছিলেন না; তবে এ'কথা কেবলমাত্র তাঁহার নাট্যরচনা সম্পর্কে যতখানি সত্য, মহাকাব্য রচনা সম্পর্কে তত সত্য নহে। কারণ, মহাকাব্যের মধ্যে তাঁহার যেখানি শ্রেষ্ঠ রচনা, অর্থাৎ 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত রচনা নহে। সংক্ষেপে এ'কথা বলিতে পারা যায় যে, মধুসূদন তাঁহার কাব্য-প্রতিভার সঙ্গে নাট্য-প্রতিভা একাকার করিয়া ফেলেন নাই, দুইটি ক্ষেত্রেরই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পাইলেও কাব্যের ক্ষেত্রে তাহা রক্ষা পায় নাই, তাঁহার গীতিকাব্য এবং মহাকাব্য একাকার হইয়া গিয়াছে।

মধুসূদনের মধ্যে দুইটি সত্তাই সমানভাবে প্রবল ছিল, একটি তাঁহার একান্ত আত্মভাব-পরায়ণতা—তাহা দ্বারা তিনি তাঁহার প্রধানত 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করিয়াছেন, দ্বিতীয় সত্তাটি তাঁহার আত্মনির্লিপ্ততা, ইহা দ্বারা তিনি প্রধানত তাঁহার নাটক ও প্রহসন কয়খানি এবং 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে

গীতিসুর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া তাহা তাঁহার আত্মভাব পরায়ণতা (subjective mood)-রই ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মধুসূদন সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়া তাঁহার নাটক কয়খানি রচনা করিয়াছেন, এ'কথা বলিতে পারা যায়। ইহাদের জীবন এবং জগৎ রোমান্টিক এ'কথা সত্য, তথাপি ইহাদের নিজস্ব জগৎ হইতে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তিনি তাহাদিগকে কোন কল্পনার জগতে আনিয়া স্থাপন করেন নাই। তবে তাঁহার তিনটি নাটকের মধ্যে এই বিষয়ে একটি নাটকে তাহার কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইতে পারে, তাহা তাঁহার রচিত 'পদ্মাবতী নাটক'। তাহাতে প্রাচীন গ্রীক্ পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমিকায় তিনি ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্র কয়টিকে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটক' ভারতীয় পৌরাণিক নাটকের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই, এ'কথা সত্য, তবে তাহা হইতে তাঁহার মধ্যে যে একটি আত্মভাবপরায়ণ রোমান্টিক চেতনাও সম্পূর্ণ সক্রিয় ছিল, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, নাটকের ক্ষেত্রে মধুসূদন তাঁহার স্বকীয় প্রতিভার স্বাধীন বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলিতে পারেন নাই; সেইজন্য তাঁহার রোমান্টিক চিন্তা ইহাদের মধ্যে তাঁহাকে সংযত রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কেবলমাত্র 'পদ্মাবতী নাটক'টির কাহিনী পরিকল্পনার মধ্য দিয়া তিনি স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই বলিয়া তিনি অন্ততঃ নাটক রচনার বিষয়ে আত্মভাব অনেকখানি সংযত করিয়া লওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার অন্য দুইখানি নাটক বা 'শর্মিষ্ঠা নাটক' ও 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' তিনি আত্মনির্লিপ্ত হইয়া মূলের অনুগমন করিয়াছেন। নাটকের বস্তুগুণ তাহাতে বিসর্জিত হয় নাই।

তাঁহার প্রহসন দুইখানিই তাহার সর্বাপেক্ষা বাস্তবধর্মী রচনা। নাটকগুলির জীবন এবং জগৎ যেমন রোমান্টিক, আমাদের প্রাত্যহিক

জীবনের সঙ্গে তাহাদের কোন যোগ ছিল না, প্রহসন দুইখানি তেমন নহে। প্রাত্যহিক জীবন এবং তাহার পরিবেশকে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিবার গুণ না থাকিলে, এই শ্রেণীর রচনা কখনও সার্থক হইতে পারে না। মধুসূদন রোমান্টিক ধর্মী মহাকাব্যের রচয়িতা এবং গীতিধর্মী আত্ম-ভাবপরায়ণ কবি হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার মধ্যে আত্মনির্লিপ্ত হইয়া বস্তুজগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার যে একটি অসাধারণ প্রতিভা ছিল, প্রহসন দুইখানিই তাহার প্রমাণ স্বরূপ হইয়া আছে। অর্থাৎ কল্পনায় যিনি স্বর্ণলঙ্কা রচনা করিয়াছিলেন, বাস্তব জগতের নরককুণ্ডও তাঁহার দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল না। তাঁহার ধ্যান এবং সৃষ্টির জগৎ কেবল মাত্র স্বপ্ন দৃষ্ট ছিল না, তিনি তাহাদের মধ্যে বাস্তব জগতের নগ্নতাকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

অথচ মধুসূদনের সম্পর্কে ইহাই প্রধান বিস্ময়ের বিষয় যে, তিনি যখন বাস্তব জগতের নরককুণ্ডে অবতরণ করিয়াছেন, তখন তাহার উপর স্বর্গের ছায়া বিস্তার করিয়া লইতে যান নাই, তাহাকে সম্পূর্ণ তন্ময় ভাবেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মধুসূদন যদি তাঁহার নাটকগুলি রচনা না করিতেন, তবে তাঁহার প্রতিভার এই দিকটির পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হইত না; কারণ, তাঁহার কাব্যের মধ্যে তিনি রোমান্টিক জগতেরই স্বপ্ন দেখিয়াছেন এবং আত্মভাব-পরায়ণতা তাহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

মধুসূদনের প্রহসন দুইখানিকে আধুনিক বাংলাদেশের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের অগ্রদূত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' এবং উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটকে'র মত বাস্তব জীবনধর্মী নাটক বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বেও রচিত হইয়াছে এ'কথা সত্য, তথাপি মধুসূদনের প্রহসন দুইখানি যে তাহা হইতেও এই পথে আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বিশেষত ইতিপূর্বে বাংলার মধ্যবিত্ত জীবন অবলম্বন করিয়াই বাস্তবধর্মী নাটক

রচিত হইয়াছে; বিশেষতঃ সমসাময়িক কতকগুলি সামাজিক সমস্যাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার প্রহসনের মধ্যে নিতান্ত ইতর শ্রেণীর চরিত্রও অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে কোন সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা নহে, বরং তাহার পরিবর্তে চিরন্তন মানবিক বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেইজন্য রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' কিংবা উমেশ মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটকে'র আজ আর কোন আবেদন নাই, কিন্তু মধুসূদনের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'র আবেদন এখনও বিনষ্ট হয় নাই। কারণ, মানব-চরিত্রের একটি চিরন্তন দুর্বলতাই ইহাতে মধুসূদনের অবলম্বন হইয়াছিল; বহুবিবাহ, কিংবা বিধবা বিবাহের মত সমসাময়িক কোন সমস্যা তাহার অবলম্বন ছিল না।

মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনখানির মধ্যে বাংলা সাহিত্যে বাস্তব জীবনধর্মী ইতর চরিত্রের প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইতিপূর্বে কেবল মাত্র নাটকে কেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোন ক্ষেত্রেই ইহাদিগকে দেখা যায় নাই, ইহারা হানিফ গাজি, তাহার পত্নী ফতেমা এবং পুটী। ইহারা কেবল মাত্র ছাঁচে নির্মিত আদর্শ চরিত্র নহে, ইহারা রক্ত-মাংসের উপাদানে গঠিত সার্থক নাটকীয় চরিত্র। পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধুকে তাঁহার নাটকে এই শ্রেণীর চরিত্র পরিকল্পনার প্রেরণা দিয়াছিল। তারপর সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই শ্রেণীর চরিত্রের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারা যায় নাই, তারপর বিংশ শতাব্দীরও তিন দশক উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর চতুর্থ দশকে নবনাট্য আন্দোলনের যুগে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এই শ্রেণীর চরিত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের উনবিংশ শতাব্দীর এই প্রহসনখানির মধ্যেই আধুনিকতম জীবন-ভাবনার পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুভূত হইবে। ইহার মধ্যেই বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের ভাবগত প্রেরণার প্রথম বিকাশ দেখা দিয়াছিল। তবে দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার ধারা

লুপ্ত হইয়া গিয়া বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার যে পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহার প্রেরণা স্বতন্ত্র দিক হইতে আসিয়াছিল, মধুসূদনের প্রহসনের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাহাতে আর কিছুই ছিল না।

উপরোক্ত চরিত্রগুলির পরিকল্পনায় দেখা যায়, মধুসূদন বাস্তব জীবনধর্মী চরিত্রের রূপায়ণে কখনও রোমান্সকে প্রশ্রয় দেন নাই, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাহার সকল প্রভাব বর্জন করিয়াছেন; সেইজন্য এই দুইখানি প্রহসনের রচয়িতা যে 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র মত রচনা প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহা কল্পনাও করিতে পারা যায় নাই। ভক্তপ্রসাদের প্রজা হানিফ গাজির সঙ্গে স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর রাবণের ব্যবধান রক্ষা করিয়াই মধুসূদন যে তাঁহার রচনাকে সার্থক করিয়াছেন, ইহা মধুসূদনের প্রতিভার অন্যতম বিস্ময়, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মধুসূদন যদি তাঁহার প্রহসন দুইখানি রচনা না করিতেন, তবে তিনি বাংলা সাহিত্যে অবিমিশ্র রোমান্টিক সাহিত্যের রচয়িতা হিসাবেই গণ্য হইতেন। কারণ, তাঁহার কাব্য কিংবা অন্য কোন নাটকের মধ্যে তাঁহার প্রহসন দুইখানি রচনার বিষয়ে ভাষা কিংবা ভাবগত কোন বিশেষত্ব কোন ভাবেই ধরা পড়ে নাই।

কল্পনা-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাও বহুমুখী ছিল। বাংলার পল্লীর ইতর শ্রেণীর চরিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার অভিজাত সমাজের জীবন সম্পর্কে তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহার প্রহসন দুইখানি তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ ছিল বলিয়া তিনি ইহাদের মধ্যে সে যুগের উভয় শ্রেণীর সমাজকেই জীবন্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রহসন দুইখানিও মধুসূদন অন্যের অনুরোধে রচনা করেন; কিন্তু নাটক রচনা করিতে গিয়া যেমন তিনি প্রতি পদেই অন্যের পরামর্শের উপর নির্ভর করিয়াছেন, প্রহসন রচনায়

তাহা করেন নাই। প্রহসনের কাহিনী পরিকল্পনা তাঁহার নিজস্ব এবং চরিত্রগুলিও তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ ইহার মধ্যেই সম্ভব হইয়াছে। অতএব ইহাদের মধ্যে যে বাস্তব জীবনবোধ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মধুসূদনের প্রতিভার একটি বিশেষ গুণ বলিয়াই মনে হইবে। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মধুসূদন তাঁহার এই গুণটিকে তাঁহার অন্যান্য নাটক রচনায় গোপন রাখিয়াছেন।

*

মধুসূদন ও বাংলা নাটকে ইতিহাস-চেতনা

টডের রাজস্থানের কাহিনীকে যদি ইতিহাস বলিয়া মনে করা যায়, তবে মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন, এই কথা স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ই বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর সর্বপ্রথম রচনা। পরবর্তী গবেষণায় টডের রাজস্থানের কাহিনীতে ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব অনুভূত হইলেও, এ কথা সত্য, মধুসূদন যখন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ইহাকে ইতিহাসই মনে করা হইত, মধুসূদন নিজেও ইহাকে ইতিহাস বিবেচনা করিয়াই সেই অনুযায়ীই তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে ঐতিহাসিক নাটকরূপেই বিচার করিতে হইবে।

অবশ্য বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বেই টড-প্রণীত রাজস্থানের কাহিনী রচনা করিয়া মহাকাব্য রচনার সূচনা দেখা দিয়াছিল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনায় ইতিপূর্বেই ইহার বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া বাংলায় আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করিয়াছেন; মধুসূদন তাঁহারই অনুকরণে টডের রাজস্থানের কাহিনী হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন, এই কথা কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্য নহে, মধুসূদন নিজের ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া টডের রাজস্থান হইতে তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিতে যান নাই। বরং এখানেও তাঁহাকে অপরের নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া লইতে হইয়াছে। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী নাটক' রচনার পর মধুসূদন প্রথমত আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'সুভদ্রা হরণ' নাটক রচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা অভিনয়যোগ্য হইবে কি না ভাবিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ তাহা অনুমোদন

করিলেন না। তারপর তিনি ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস হইতে সম্রাট্ ইলতুত্‌মিসের কন্যা সুলতানা রিজিয়ার জীবন-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহার একটি খসড়া তৈয়ারী করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

মুসলমান যুগের ইতিহাস হইতে মুসলমান স্ত্রীচরিত্র-প্রধান নাটক রচনা করা সম্পর্কে মধুসূদনের বিশ্বাস ছিল যে, 'The Mahomedans are a fiercer race than ourselves and would afford splendid apportunity for the display of passion. Their women are more cutout for intrigue than ours.' মধুসূদন এই বিষয়ে যে কোন ভুল করেন নাই, তাহা সত্য। কিন্তু তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ কতকগুলি বহির্মুখী কারণে তাঁহার এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বরং তাহার পরিবর্তে কোন হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করিলে তাহা অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় যথাযথ বিষয়বস্তুর যে মধুসূদন সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। কারণ, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ইঁহারা প্রধানত মধ্যযুগের মুসলমান যুগের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া যে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের আবেদন বাঙ্গালী দর্শকের নিকট সার্থক হইয়াছিল। সুতরাং এখানেও মধুসূদনকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার ইতিহাস-চেতনার যথার্থ স্বরূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। তথাপি তিনি স্বাধীনভাবে 'রিজিয়া নাটকে'র যে পরিকল্পনাটি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই বিষয়টির আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনী লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু এই পরিকল্পনাটি মুদ্রিত করিয়া এই বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন ('মাইকেল

মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত পৃঃ ৪৪০-৪১, ১৯২৫)। দেখা যায়, মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের চরিত্র সুলতানা রিজিয়া সম্পর্কে মধুসূদনের একটি বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি তাঁহার মাদ্রাজ প্রবাস-কালেই *Rizia : Empress of Inde* নামে একটি নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ইংরেজি ভাষায় সেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শে রচিত হইয়াছিল।

ইহা হইতে দেখা যাইবে, মধুসূদন কেবলমাত্র কল্পনা-প্রবণ রোমান্টিক-ধর্মী রচনাতেই দক্ষ ছিলেন না, তাঁহার মধ্যে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া তথ্যনির্ভর নাটক রচনারও প্রতিভা ছিল। তিনি পরের নির্দেশ স্বীকার করিয়া রিজিয়ার বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করিলেন এবং হিন্দুচরিত্র অবলম্বন করিয়া 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেষণ সম্পর্কে নিজে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করিলেন, তথ্যকে বিকৃত কিংবা অনাবশ্যক বিস্তার করিবার মধ্যে পরের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র পরিকল্পনা পাঠ করিয়া যখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক তাঁহাকে ইহাতে আরও কয়েকটি চরিত্র যোগ করিয়া কাহিনীকে আরও জটিল করিয়া তুলিবার পরামর্শ দিলেন, তখন তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি তাঁহার পরামর্শদাতাকে এই সম্পর্কে যাহা লিখিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিলেন, 'As for "variety of action" there is not much of it, to be sure, but that result I could not very well avoid, owing to the original barrenness of the plot.' অর্থাৎ মূলেই যে কাহিনী বৈচিত্র্যহীন, সেখানে কাল্পনিক কাহিনী যোগ করিয়া তাহাকে তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ করিতে চাহেন না। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তাঁহার এই মনোভাবটি কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

যে সকল বিষয়বস্তু লইয়া ঐতিহাসিক নাটক রচনা করা হয়, তাহা সামগ্রিক ভাবেই যে ঐতিহাসিক তথ্য হইবে তাহা নহে,

ইহাদের কিছু ঐতিহাসিক তথ্য, অবশিষ্ট সকলই অনৈতিহাসিক কল্পনা মাত্র। তবে কাল্পনিক ঘটনাকে ঐতিহাসিক ঘটনার ধারায় নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, এই মাত্র। মূলে যদি বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যহীন (মধুসূদনের কথায় 'barren') থাকে, তবু তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার ধারা অনুসরণ করিয়াই কেবলমাত্র কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ করিয়া নূতন বিষয়বস্তুও যোগ করা যায়। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্র দ্বারাই ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয় না, কল্পিত ঘটনার মত কল্পিত চরিত্রও তাহাতে যুক্ত হইতে পারে, তবে চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক পরিবেশ অনুযায়ী পরিকল্পিত হইতে হইবে এই মাত্র। প্রত্যেক ঐতিহাসিক নাটক এবং উপন্যাসেই মৌলিক ঐতিহাসিক তথ্য অপ্রচুর (barren) থাকে। কারণ, ইতিহাস প্রধান-চরিত্রের জীবনের কতকগুলি বহির্মুখী ঘটনা মাত্র উল্লেখ করিয়া থাকে, তাহার চরিত্রের আভ্যন্তরিক কোন বিষয় ইতিহাসে লেখা থাকে না, তাহা ঐতিহাসিক নাট্যকারকে সর্বদাই কল্পনা করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হয়। সুতরাং 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র 'original barrenness of the plot' সত্ত্বেও সে যুগের রাজপুত জীবনের পট-ভূমিকায় নূতন নূতন ঘটনা উদ্ভাবন করিয়া যদি তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে তাহাদিগকে যোগ করিয়া দিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকের ধর্ম বিনষ্ট হইত না। মৌলিক ঐতিহাসিক তথ্যের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া নাটক রচনা করিলে তাহা ইতিহাস হইতে পারে, কিন্তু নাটক হয় না। সুতরাং কেবলমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যই নাটকাকারে পরিবেষণ করা ঐতিহাসিক নাট্যকারের দায়িত্ব নহে, তাহার সঙ্গে যথাযথ কল্পনার সংমিশ্রণ না থাকিলে তাহা কখনও সাহিত্য গুণান্বিত হইয়া নাটক পদবাচ্য হয় না। মধুসূদন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের পরামর্শ সত্ত্বেও 'original barrenness of the plot'-এর দোহাই দিয়া যে নাট্যকাহিনীকে অধিকতর ঘটনা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তাহাতে ইতিহাসের যে মর্যাদাই রক্ষা পাক না কেন, ঐতিহাসিক নাটকের

মর্যাদা পরিপূর্ণ রক্ষা পাইল না। কারণ, ইতিহাসে আমরা যাহা পাই, তাহা সর্বদাই সাহিত্যের পক্ষে অপ্রচুর; এই ঐতিহাসিক তথ্যগত অপ্রচুরতাকে যিনি সার্থক কল্পনা-শক্তির বলে নাটকেই হউক কিংবা উপন্যাসেই হউক, পূর্ণতা দিতে পারেন, তিনিই সার্থক ঐতিহাসিক নাট্যকার; কিংবা ঐতিহাসিক উপন্যাসকার। আর ইতিহাসের তথ্যের অপ্রচুরতার দোহাই দিয়া যিনি কেবলমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যকেই নাট্যাকারে পরিবেষণ করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসই রচনা করেন, ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন না।

কিন্তু মধুসূদনের যে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিবারও দক্ষতা ছিল, তাহা তাঁহার 'রিজিয়া নাটকে'র পরিকল্পনাটি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এখানে প্রকৃত বিষয় এই যে, রিজিয়ার পরিকল্পনা তাঁহার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁহার অন্তরের কোন যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। ইহা অন্যের আদেশ এবং পরামর্শ মত রচনা বলিয়া ইহার বিষয় গভীর ভাবে বিবেচনা করিবারও তাঁহার মধ্যে কোন প্রেরণা ছিল না। সেইজন্য তিনি প্রাণের আবেগ লইয়া ইহা সৃষ্টি করেন নাই, কেবলমাত্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপরের নির্দেশ পালন করিবার জন্যই তাহা করিয়াছিলেন।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে তাঁহার এক পত্রেও লিখিয়াছেন, 'I have tried to represent Juggat Sing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuos fellow, Bheem Sing as a sad, serious man. The other characters are invented, but I had to conform them to the principal character' অর্থাৎ তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি জগৎ সিংহ এবং ভীম সিংহকে ইতিহাস অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যান্য চরিত্রকে কল্পনায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, ঐতিহাসিক নাট্যকারের যথাযথ কর্তব্য সম্পর্কে

তিনি অবহিত ছিলেন। অর্থাৎ 'original barrenness of the plot' সত্ত্বেও কি ভাবে যে ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইতে পারে, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার পরিকল্পিত 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সম্পর্কে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের সমালোচনার উত্তরে 'original barrenness of plot'-এর দোহাই দিবার তাঁহার অন্য কোনই কারণ ছিল না। মনে হয়, পরের মুখাপেক্ষী রচনা বলিয়া ইহার দায় তিনি এড়াইতে চাহিয়াছিলেন ; তাঁহার মধ্যে ঐতিহাসিক নাট্যরচনার প্রতিভা যে ছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

*

মধুসূদনের সমাজ-চেতনা ও তাঁহার প্রহসন

মধুসূদনের নাটকের মধ্যে তিনখানিই রোমান্টিক কিংবা ঐতিহাসিক, একখানিও সামাজিক বিষয়বস্তু লইয়া রচিত নহে; সুতরাং তাঁহার নাটকগুলি হইতে বাংলার বাস্তব সমাজ-জীবন সম্পর্কে তাঁহার কি ধারণা ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই বিষয়ে তাঁহার প্রহসন দুইখানিই অবলম্বন, ইহাদের মধ্য হইতেই বাংলার সমাজ সম্পর্কে তাঁহার ধারণার আংশিক পরিচয় জানিতে পারা যায় মাত্র। আংশিক এই জন্য যে তাঁহার প্রহসন দুইখানির মধ্যে জীবন কিংবা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির কোন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে নাই, কেবলমাত্র কৌতুককর লঘু দিকটিই প্রকাশিত হইয়াছে; বিশেষতঃ প্রহসন রচনার মধ্যে যে চিত্রগত একটু অতিরঞ্জনের দোষ আসিয়া যায়, তাহা হইতে তাঁহার প্রহসন দুইখানি মুক্ত নহে। তথাপি একথা সত্য, বাংলার সমাজ-সম্পর্কে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস তাহা এই দুইখানি প্রহসনের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যত্র তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

মধুসূদনের নাট্যরচনার মত তাঁহার প্রহসন দুইখানিও পরের নির্দেশ মত রচিত হয়; কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কাহারও কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয় নাই। বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যোক্তাদিগের পক্ষ হইতে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁহাকে দুইখানি প্রহসন রচনার জন্য অনুরোধ করেন এবং সেই অনুরোধ পালন করিতে গিয়াই তিনি তাঁহার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন দুইখানি রচনা করেন। কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, মধুসূদন ফরাসী প্রহসনকার মলিয়ারের নিকট হইতে তাঁহার প্রহসন রচনার প্রেরণা পাইয়াছেন।

কিন্তু মলিয়ারের প্রহসনগুলি যতদূর আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তাঁহার কোন প্রহসনের সঙ্গেই মধুসূদনের বিষয়বস্তুর বিশেষ কোন যোগ নাই। তবে আঙ্গিকের দিক হইতে বিচার করিলে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহাতে প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রহসন রচয়িতার আদর্শ অনুসরণ করা হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বিশেষত বাংলা নাট্যসাহিত্যে ইতিপূর্বে যে প্রহসন রচিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে মধুসূদনের প্রহসনের বিষয় কিংবা আঙ্গিকগত কোন যোগ নাই। ইতিপূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক যে 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নামক সামাজিক প্রহসন রচিত হইয়াছিল, তাহার ভিত্তি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের একটি সুগভীর ক্ষতস্থান তাহা দ্বারা উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, মধুসূদনের প্রহসনের বিষয়বস্তুর একখানির মধ্যে নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার নাগরিক জীবনের একটি সাময়িক সমস্যাকে অবলম্বন করা হইয়াছে, এ কথা সত্য, কিন্তু আর একটির মধ্যে বাংলার পল্লীজীবনের পটভূমিকায় মানবিক চরিত্রের চিরন্তন একটি দুর্বলতা অবলম্বন করা হইয়াছে। সাহিত্যিক বিচারে শেষোক্ত প্রহসনটির মূল্য বেশী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁহার প্রহসন রচনার ভঙ্গিটি সংস্কৃত নাটক রচনার ভঙ্গির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদন দত্ত তাঁহার অন্যান্য নাটকের মত প্রহসন রচনায়ও পাশ্চাত্ত্য প্রহসন রচনার আঙ্গিকের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র কথা, তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার সমাজ-চেতনার কি অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহাই দেখিতে হইবে। তাহার পূর্বে প্রহসন দুইখানি সম্পর্কে মধুসূদনের নিজের কি বিশ্বাস ছিল, তাহা দেখা যাইতে পারে।

মধুসূদন তাঁহার প্রহসন দুইখানি প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ রাজনারায়ণ বসুর নিকট হইতে ইহাদের প্রশংসাসূচক যে পত্র পান, তাহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন,'…I am of course proud to think that you like my farces, but, to tell

you the candid truth, I half regret having published those two things.' সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইহাদের রচনার সঙ্গে যে কোন কারণেই হোক, তাঁহার অন্তরের যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। পরে বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে, এখানে কেবলমাত্র বিষয়টি লক্ষ্য করিতে বলি। সুতরাং প্রহসন দুইখানির ভিতর দিয়া যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাংলার সমাজ সম্পর্কে মধুসূদনের বিশিষ্ট চেতনার ফলেই যে সম্ভব হইয়াছে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না। তবু ইহাদের মধ্য দিয়া বাংলার সমাজকে তিনি যতদূর দেখিয়াছেন, তাহা তিনি কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

দুইখানি প্রহসনের মধ্য দিয়াই মধুসূদন বাংলার সমাজ-জীবনের নৈতিক অধঃপতনের রূপটিই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার বৃহত্তর কোন সমস্যার দিকগুলি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। অথচ সে যুগের বাংলার বৃহত্তর সমাজের সমস্যার বিষয় লইয়াই প্রহসন রচনার সূচনা হইয়াছিল। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদির সমস্যা সমাজ-জীবনকে তখন পীড়িত করিতেছিল, তাহাদের উপর মধুসূদনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতে পারে নাই। নাগরিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এই কথা সত্য, তবে তাহা একটি অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর সমাজকে তাহা প্রভাবিত করিতে পারে নাই। Young Bengel-এর মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক নৈতিক ব্যভিচার কলিকাতার বিত্তশালী একটি বিশেষ সম্প্রদায়েরই সমস্যা ছিল; সুতরাং এই সমস্যার উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়াও সেদিনকার সমস্যা-কণ্টকিত বৃহত্তর বাংলার সমাজটি রূপায়িত হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই সমাজটির বিষয়ে মধুসূদনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুব প্রত্যক্ষ ছিল না। সেইজন্য ইহার চিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটু অতিরঞ্জিত হইয়াছে। মধুসূদন তাঁহার যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালীর সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার ফলে

বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। ননদ-ভাজের সম্পর্ক কিংবা বয়স্থা ভগিনীর সঙ্গে বয়স্ক ভাইয়ের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, তাঁহার প্রহসনের কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সংলাপের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অনেক সময়ই বাস্তব জীবন বিরোধী হইয়াছে।

মধুসূদন বাঙ্গালীর সমাজ কিংবা পারিবারিক জীবনের মাধুর্যের দিকটিরও সন্ধান করিতে পারেন নাই। শৈশবে তাঁহার নিজের পারিবারিক জীবনে তিনি সেই মাধুর্যের সন্ধান পান নাই। মাতা বহুপত্নীক পিতার সংসারের বধূ, সুতরাং পারিবারিক জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণ মর্যাদার আসনে তিনি সমাসীন ছিলেন না, অথচ মাতার প্রতি তাঁহার নিজের সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। বিলাসী পিতার সঙ্গে তাঁহার মাতার যে সম্পর্ক ছিল, তাহাতে পিতার প্রতি যেমন তাঁহার শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার কোন প্রেরণা ছিল না, তেমনই পারিবারিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিবারও তিনি কোনও প্রেরণা লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার নিজেরই পারিবারিক জীবনের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল ছিল; তাহারই ফলে অনায়াসেই তিনি অপরিণত যৌবনেই পারিবারিক জীবনের সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদনের প্রহসনগুলির মধ্যে তাহারই প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের পরস্পর সম্পর্কগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যেও দেখা যায়, পিতার প্রতি পুত্র শ্রদ্ধাহীন, পুত্রের প্রতি পিতা সর্বদা সন্দেহযুক্ত। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাংলার পারিবারিক জীবনের যে বন্ধন পিতা-পুত্র-কন্যা-বধূদিগকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়া তাহার মাধুর্যে এবং সৌন্দর্যে সমাজ-জীবনে এক উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল, মধুসূদন তাহার সন্ধান করিতে পারেন নাই। এমন কি, দীনবন্ধু মিত্র প্রায় সমসাময়িক

কালে তাহার 'নীল-দর্পণ' নাটকের মধ্য দিয়া গোলোক বসুর পারিবারিক জীবনের যে সুন্দর আলেখ্যটি পরিবেষণ করিয়াছেন, মধুসূদনের অভিজ্ঞতায় তাহা অনুপস্থিত ছিল।

'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক প্রহসনটির মধ্য দিয়াই বাংলা নাট্যসাহিত্যে সর্বপ্রথম মাতাল এবং বারবনিতার চিত্র প্রবেশ করিল এবং তাহারই ধারা ক্রমাগত নাট্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার বিভিন্ন প্রহসনের মধ্য দিয়া তাহার ধারা প্রশস্ততর করিয়া দিলেন। ইতিপূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলায় যে প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কুলীন কামিনীদিগের ব্যভিচারের যে কথাই থাকুক না কেন, সে যুগের নাগরিক জীবন আশ্রয় করিয়া এ'দেশের সমাজে যে পাপ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ ছিল না। সুতরাং দেখা যায়, বাংলায় যে সুস্থ সমাজ-জীবনের মধ্যে জীবনের বিচিত্র বিকাশ দেখা যাইতেছিল, মধুসূদন তাহা পরিত্যাগ করিয়া সমাজ-জীবনের একাংশে যে পাপ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহার উপরই নিজের দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছিলেন, সমাজ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকটির তিনি সন্ধান করিতে পারেন নাই। বাংলার সমাজ-জীবন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চেতনা তিনি লাভ করিতে পারিলে এই একদেশদর্শিতা কদাচ প্রকাশ পাইত না।

মধুসূদন তাঁহার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসনখানির মধ্য দিয়া তৎকালীন নাগরিক সমাজ পরিত্যাগ করিয়া পল্লীসমাজের একটি ভণ্ডামির চিত্র আঁকিয়াছিলেন। নাগরিক সমাজের মধ্যে যে নৈতিক ব্যভিচারের চিত্র তিনি সন্ধান করিয়াছিলেন, পল্লীসমাজের মধ্যে তিনি তাহারই সন্ধান করিয়াছেন। তিনি দেখাইলেন, নাগরিক সমাজে যেমন ইংরেজি শিক্ষার দোহাই দিয়া নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে, পল্লীসমাজেও তেমনই ধর্মের নাম করিয়া নৈতিক ব্যভিচার চলিয়াছে। সুতরাং সে দিনকার বাংলার সমাজের কোন ক্ষেত্রেই তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার

মতে নৈতিক ব্যভিচার সেদিন কেবলমাত্র নাগরিক সমাজে সদ্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লব্ধ Young Bengal-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া ছিল না, বরং পল্লীসমাজের ধর্মধ্বজীদিগের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল। উভয় প্রহসনের মধ্যেই সমাজ এবং জীবন সম্পর্কে মধুসূদনের দ্বৈত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা একদিক দিয়া যেমন বাংলার সামাজিক জীবন সম্পর্কে নিজস্ব তিক্ত অভিজ্ঞতার ফল, তেমনই পাশ্চাত্ত্য প্রহসনকারদিগের জীবনদৃষ্টির প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বাংলার সমাজ এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি ব্যক্তিগত কারণে মধুসূদন কোন শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে পারেন নাই। সেই দৃষ্টি দিয়াই তিনি সমগ্র বাংলার সমাজকে দেখিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার বিভিন্ন রচনার মধ্যে যে সামান্য অংশে মাত্র বাংলার সমাজ-জীবনকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার পাঠককে কোন আশার কথা শুনাইয়া যাইতে পারেন নাই।

মধুসূদনের নাটকের সংলাপ এবং বাংলা গদ্য

যাঁহারা বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কেবলমাত্র প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্য দিয়াই তাহা অনুসরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্য ব্যতীতও বাংলা নাটকীয় সংলাপ রচনার ধারা যদি আমরা অনুসরণ করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাই যে, তাহাও বাংলা গদ্যের পুষ্টি এবং ক্রমবিকাশের যে পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে, তাহা উপেক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে মধুসূদনের নাটকগুলির গদ্যসংলাপ বিশেষ সাহায্য করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে।

মধুসূদন যখন তাঁহার নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সম্মুখে বাংলা গদ্যরীতির দুইটি আদর্শই বর্তমান ছিল, একটি পণ্ডিতি বাংলা, আর একটি আলালী ভাষা। পণ্ডিতি বাংলার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে প্রসাদগুণ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহা সে দিন সাহিত্যিক গদ্য ভাষার আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। তবে এই কথা সত্য, নাটকীয় সংলাপে ভদ্র শ্রেণীর চরিত্রে পণ্ডিতি বাংলাই ব্যবহৃত হইত; রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রে পণ্ডিতি বাংলাই ব্যবহার করিয়াছেন—স্ত্রীচরিত্রে তাহা অপেক্ষা সহজ ভাষা ব্যবহার করিলেও আলালী ভাষা ব্যবহার করেন নাই। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুসূদনের সময়ে বাংলা সাহিত্যে আলালী ভাষা প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু রামনারায়ণের সময় তাহা প্রচলিত হয় নাই। অথচ রামনারায়ণ তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের ইতর শ্রেণীর চরিত্রে ইতর শ্রেণীর কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। তবে এই কথা সত্য, বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বাংলা গদ্যের যে প্রসাদগুণ ছিল, বিদ্যাসাগরের

পরবর্তী বহু নাট্যকার তাঁহার অনুকরণ করা সত্বেও সেই গুণ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। রামনারায়ণ তর্করত্নও তাহা পারেন নাই। মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র গদ্যসংলাপ ব্যবহারে প্রধানত রামনারায়ণের ভাষারই অনুসরণ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষার রস এবং স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই। নাটকীয় সংলাপের পক্ষে ইহা যে নিতান্ত আড়ষ্ট, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র গদ্য সংলাপ ব্যবহারে মধুসূদনকে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'র অনুবাদের ভাষাই আদর্শ করিতে হইয়াছিল, তাহার ব্যতিক্রম হইবার কোন উপায় ছিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, বহু ভাবেই ইহা পরমুখাপেক্ষী রচনা। এই নাটকে কোন ইতর শ্রেণীর চরিত্রের কথ্যভাষা নাই, কারণ, ইহাতে কোন ইতর চরিত্রও নাই; স্বভাবতই আলালী ভাষারও কোন প্রভাব ইহাতে কিছুমাত্র দেখা যায় না।

মধুসূদন তাঁহার রচিত 'পদ্মাবতী নাটকে'র গদ্য সংলাপ ব্যবহার করিতে গিয়াই সর্বপ্রথম রামনারায়ণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আসিলেন; কারণ, এই বিষয়ে তাঁহার আর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। সেইজন্য 'পদ্মাবতী নাটকে'র গদ্য সংলাপ তাঁহার পূর্ববর্তী রচনা 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র গদ্য ভাষা হইতে অনেকখানি সহজ এবং সরল হইয়া আসিয়াছে। তিনি বহুল পরিমাণে সাধু কথ্যভাষা (standard colloquial) ব্যবহার করিয়াছেন। কথ্যভাষা বলিতে তখন কেবলমাত্র ইতর শ্রেণীর কথ্যভাষাই বুঝাইত, তাহাই আলালী ভাষা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সাধু কথ্যভাষার সাহিত্যে প্রয়োগ ইতিপূর্বে বিশেষ দেখা যায় নাই। 'পদ্মাবতী নাটক' হইতে মধুসূদন বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ সমাস বদ্ধ পদ লুপ্ত হইয়া গিয়া পণ্ডিতি বাংলার একটি সহজ রূপ ইহাতে প্রকাশ পাইল এবং তাহা নাটকীয় সংলাপের উপযোগিতা লাভ করিল। 'পদ্মাবতী নাটকে'র সর্বপ্রথম দৃশ্য হইতেই তাহার কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতে পারে,

রাজা। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) হরিণটা দেখতে দেখতে কোন দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখছি? আর তাই বা কেমন করে বলি। এই ত ভগবান বিন্ধ্যাচল অচল হ'য়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া) এই পর্বতময় প্রদেশে রথের গতিরোধ হয় বলে আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণ-ক্লেশ স্বীকার করে, অবশেষে কি আমার এই ফল লাভ হলো যে, আমি একলা একটা নির্জন বনে এ'সে পড়লাম? —১।১

এই বাংলা পণ্ডিতি বাংলা হইতে সহজ এবং সরস; কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রসাদগুণ বঞ্চিত বলিয়া অনুভূত হইবে না। ইহার মধ্য দিয়া বাংলা নাটকের গদ্য সংলাপের সার্থক ভাষা যে জন্মলাভ করিতেছে, তাহা অনুভূত হইবে।

'পদ্মাবতী নাটকে'র মধ্যে কোন ইতর শ্রেণীর চরিত্র না থাকিলেও বিদূষক চরিত্রের মধ্য দিয়া সংলাপের ভাষা আরও সহজ হইয়া আসিয়াছে, তবে একেবারে আলালী ভাষার পর্যায়ে পৌঁছায় নাই। সংস্কৃত নাটকে বিদূষক পুরুষ চরিত্র হইয়াও প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, সেই সংস্কার অনুসরণ করিয়াই মধুসূদন 'পদ্মাবতী নাটকে'র বিদূষকের মুখে অত্যন্ত সহজ ভাষা আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু সে ভাষা গ্রাম্য ইতর ভাষা নহে। বিদূষকের চরিত্রানুযায়ী সার্থক বাস্তবধর্মী ভাষা। গ্রাম্য আলালী ভাষায় ইতিমধ্যে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, তথাপি মধুসূদন 'পদ্মাবতী নাটকে'র মধ্যে তাহা ব্যবহার না করিয়া যে সংযমবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য। অথচ মধুসূদনের ব্যবহৃত ভাষা যেমন সহজ কথ্যভাষা, তেমনই সাহিত্য গুণান্বিত। বিদূষকের সংলাপের ভাষার একটু নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা যায়,

বিদূষক।...যুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর সিন্দুর চুপড়ি থেকে খানকতক আলতা চুরি করে টেঁকে গুঁজে রেখেছিলাম। আর কেন যে

> রেখেছিলাম, তা সামান্য লোকের বুঝে ওঠা দুষ্কর। ওহে! যেমন সিংহের অস্ত্র দাঁত, ষাঁড়ের অস্ত্র শিঙ, হাতীর অস্ত্র শুঁড়, পাখীর অস্ত্র ঠোঁট আর নখ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধনুর্বাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ত্র বিদ্যা আর বুদ্ধি।...

স্মরণ রাখিতে হইবে যে তখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রই পণ্ডিতি বাংলা এবং আলালী বাংলার মধ্যবর্তী পথের সন্ধান করিয়া সাহিত্যে আদর্শ গদ্যভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু মধুসূদনের উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনিই ইতিপূর্বে বাংলা নাটকের গদ্য-সংলাপ রচনায় সেই ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র গদ্য-সংলাপের ভাষা আরও সহজ হইয়া আসিয়াছে এবং ইহার মধ্যে প্রসাদগুণের স্পর্শ অনুভব করা যায়। ইতিমধ্যে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা বাংলা সাহিত্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, নাটকীয় সংলাপে তাহার উপযোগিতার বিষয় কোন দিক দিয়া পরীক্ষা না করিয়াই মধুসূদন তাঁহার সংলাপ রচনায় নিজস্ব আদর্শে পরিচালিত হইতে লাগিলেন। ইহার মধ্যেও তিনি কোন ইতর শ্রেণীর চরিত্রের ভাষা ব্যবহার করেন নাই।

এখানে মধুসূদনের প্রহসন দুইখানির ভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আবশ্যক।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের গদ্য সংলাপের ভাষা গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাতে মধুসূদন সমসাময়িক গদ্য রচনায় কোন কথ্যভাষাকে আনুপূর্বিক অনুসরণ করিবার পরিবর্তে এই বিষয়ে নিজস্ব মৌলিক প্রতিভাই নিয়োজিত করিয়াছেন। কারণ, যদিও ইহাদের মধ্যে অতি গ্রাম্য স্তরের কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি ইহা আলালী কিংবা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ভাষা নহে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ভাষা গ্রাম্যভাষা হইলেও আলালী ভাষা নহে। আনুপূর্বিক আলালী ভাষা কোন উচ্চ শিল্পসম্মত সাহিত্য রচনার যে উপযোগী নহে, তাহা

মধুসূদন যেমন বুঝিয়াছিলেন, বঙ্কিমও তেমনই বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য বঙ্কিম আলালী এবং পণ্ডিতি বাংলার মধ্যবর্তী স্থানে আদর্শ গদ্য-ভাষার সন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের দায়িত্ব বঙ্কিমের অনুরূপ ছিল না। মধুসূদনকে প্রহসনের চরিত্রগুলিকে বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের পরিচয়োচিত মুখের ভাষা যথাসম্ভব রক্ষা করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি গ্রাম্য জীবনের প্রকৃত চাষার মুখে যে ভাষা শুনিয়াছিলেন, তাহাকেই তাঁহার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র কৃষক চরিত্র-রূপায়ণে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু দীনবন্ধু যেমন কৃষকের মুখের ভাষা নাট্যসংলাপে ব্যবহার করিতে গিয়াও তাহার নিতান্ত স্থূল গ্রাম্য অংশও পরিত্যাগ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই, মধুসূদন সে পথে অগ্রসর হন নাই। চরিত্রের বাস্তবধর্ম রক্ষা করিয়াও চরিত্রের মুখের ভাষাকে সাহিত্য পরিবেষণ করিবার যোগ্যতা দিতে হইবে; পথে ঘাটে অশিক্ষিত কৃষকের মুখে যে ভাষা শুনিতে পাই, তাহাই আনুপূর্বিক আনিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবেষণ করিতে পারি না, এই দায়িত্ব সম্পর্কে মধুসূদন দীনবন্ধু হইতে অধিকতর সচেতন ছিলেন এবং সেই অনুযায়ীই তিনি তাঁহার গ্রাম্য-জীবনমূলক প্রহসনের চরিত্রগুলির ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা মধুসূদনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা-লব্ধ, আলালের অনুকরণের ফল বলিয়া মনে হইবে না। দীনবন্ধু এই ভাষাকেই অধিকতর বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিবার আগ্রহে ইহাকে সাহিত্যিক মর্যাদা হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্যুত করিয়াছেন। মধুসূদন তাহা করেন নাই।

মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' কলিকাতার নাগরিক সমাজ অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহার মধ্যে অধিকাংশ চরিত্রই শিক্ষিত চরিত্র—কেহ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, কেহ দেশীয় প্রথায় শিক্ষিত। এই শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে তখন পর্যন্তও বাংলা নাটকে পণ্ডিতি ভাষায় সংলাপ রচনার প্রথাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু, মধুসূদন প্রহসন খানিতে তাহার ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিলেন। তিনি আনুপূর্বিক কলিকাতার সহজ

কথ্যভাষায় ইহার সংলাপ রচনা করিয়াছেন। কলিকাতার আঞ্চলিক কথ্যভাষা তখন পর্যন্তও বাংলা সাহিত্যের রচনায় আনুপূর্বিক স্থান লাভ করিতে পারে নাই। মধুসূদনই তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা'র রচনায় ইহাকে এই মর্যাদায়ই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অথচ এই ভাষাও আলালী ভাষার মত ইতর শ্রেণীর ভাষা নহে, সাহিত্যের ভাষা হইবার উপযোগিতা হইতে ইহা বঞ্চিত হয় নাই। বাংলা সাহিত্যে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে মধুসূদন ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। শিক্ষিত লোকমাত্রই যে পণ্ডিতি বাংলায় কথা বলিবে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে মধুসূদন সেই সংস্কার হইতে ইহাতেই সর্বপ্রথম মুক্তি দিলেন।

১৫

মধুসূদনের উত্তরাধিকার—নাটকে ও প্রহসনে

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন যে উত্তরাধিকার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, নাটক এবং প্রহসন রচনায়ও তাহা তাঁহার পক্ষে কতদূর সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। মধুসূদন মহাভারতের বিষয়বস্তু লইয়া যে 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ধারা পূর্ব হইতেই বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল সত্য, তবে ইহার আঙ্গিকের মধ্যে মধুসূদন যে কতকগুলি নূতনত্বের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পরবর্তী কালের নাট্যকারগণও অনুসরণ করিয়াছেন। আধুনিক যুগের প্রথম বাঙ্গালী নাট্যকার বলিয়া যাঁহাকে উল্লেখ করা হয়, সেই তারাচরণ শিকদার মহাভারত হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়াই তাঁহার 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনা করিয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহার পরবর্তী নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষও মহাভারত হইতেই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া তাঁহার একমাত্র মৌলিক নাটক 'কৌরব বিয়োগ' রচনা করেন; সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক হইতে মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' পূর্ববর্তী নাট্যকারদিগকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তথাপি বিস্তৃত গদ্য-সংলাপের ব্যবহারের দিক দিয়া মধুসূদন তাঁহার নাটকে যে নূতন রীতি প্রবর্তন করিলেন, তাহাই পরবর্তী নাট্যকারদিগের আদর্শ হইয়াছিল। মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র গঠন এবং বিষয়-বিন্যাসের দিক হইতে যে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকারদিগের অপেক্ষা স্বতন্ত্র, ইহারই ধারা পরবর্তী কাল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকারদিগের নাট্যরচনার কোন আদর্শ পরবর্তী আর কোন নাট্যকারকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই।

কিন্তু মধুসূদন রামায়ণ-মহাভারতের একান্ত আনুগত্যকে কোন দিনই স্বীকার করেন নাই। রামায়ণ-মহাভারতের পটভূমিকাতেও স্বকীয় উপলব্ধি অনুযায়ী তিনি চরিত্র গঠনের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, মধুসূদনের পরবর্তী কাল হইতে বাংলার নাট্যকারদিগের তাহাই আদর্শ হইয়াছিল। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র কাহিনী মধুসূদন মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মহাভারতের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলি রূপায়িত করেন নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র প্রধান চরিত্রগুলি, অর্থাৎ যযাতি কিংবা শুক্রাচার্য অথবা দেবযানী বা শর্মিষ্ঠা, ইঁহাদের কেহই মহাভারতের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চিত্রিত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণের চরিত্রগুলি যে যুগোচিত নূতন আদর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র উপরোক্ত চরিত্রগুলির মধ্যে তাহারই প্রথম নিদর্শন দেখা দিয়াছিল। তারপর পুরাণের কাহিনীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া রোমান্টিক কাহিনীর পরিকল্পনাও মধুসূদনের মধ্য হইতেই সর্ব প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'পদ্মাবতী নাটক'। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ সম্পর্কে জাতির যে বিশ্বাস এতদিন পর্যন্ত নানা বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয়াও রক্ষা পাইয়া আসিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া তাহা এক অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। মধুসূদনই প্রধানত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের সম্মুখে তাহাদিগকে আনিয়া এই পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছিলেন। মধুসূদনের ধারাই পরবর্তী কালের কবি-নাট্যকারগণ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের 'পদ্মাবতী নাটকে'র মধ্যে দেখা গেল, প্রাচীন গ্রীক্ পুরাণই হোক, কিংবা ভারতীয় পুরাণই হোক; তাহাদের মৌলিক রূপে আর এই জাতির বিশ্বাস নাই। পুরাণের চরিত্রগুলি লইয়া যথেচ্ছ কাহিনী উদ্ভূত হইতে পারে। তাই দেখা

যায়, দেবরাজ ইন্দ্রের মহিষী শচীদেবী, কামবধূ রতি ইহারা পরস্পর সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতীয় সংস্কারে দৈহিক সৌন্দর্যের কোন মূল্য দেওয়া হয় না, সুতরাং ভারতীয় চরিত্রের সম্পর্কে এই ধারণা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জীবনের প্রভাব এমন ভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই দিন প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, জাতীয় জীবনের সংস্কার বিসর্জন দিয়াও এই পরিকল্পনা আমাদের সাহিত্যে সেইদিন প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। মধুসূদনই এই ধারণাকে আমাদের সাহিত্যে সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ-ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নতুবা এই শক্তি সে দিন আর কাহারও ছিল না। জাতীয় চরিত্রগুলি সম্পর্কে আমাদের মন হইতে ক্রমে যে সকল সংস্কার দূর হইবার উপক্রম হইয়াছিল, মধুসূদনের মধ্যেই তাহার সূচনা দেখা দিয়াছিল।

'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার মধ্য দিয়াই মধুসূদন তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উত্তরাধিকার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাংলা নাট্যসাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য নাটক অনুযায়ী ট্রাজিডি রচনার উত্তরাধিকার। মধুসূদনের পূর্বে এই বিষয়ে যে প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেখা যায় নাই, বিশেষতঃ কাহিনীকে যথাযথ ভাবে ট্রাজিডির আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে নাট্যরূপে প্রকাশ করিবার মধ্যে কোন সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এই বিষয়ে যাঁহারাই কোনও প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাদের কাহারও মধ্যে যথার্থ নাট্যকারের প্রতিভা এবং অন্তর্দৃষ্টি ছিল না; সেইজন্য তাঁহাদের রচনা যতখানি বিয়োগান্তক নাটক মাত্র হইয়াছে, ততখানি ট্রাজিডি হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বাংলা সাহিত্যে ট্রাজিডি রচনার ভিতর দিয়া দীর্ঘকালের সংস্কারের একটি বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল; 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার অব্যবহিত পরবর্তী কাল হইতেই মুক্তধারার মত ইহা বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল।

দীনবন্ধু মিত্র সেই পথেই অগ্রসর হইয়া আসিয়া এই ধারাটিকেই প্রশস্ততর করিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যেই নিজের প্রতিভার সন্ধান পাইয়াছিলেন। পরবর্তী কালেও নানা পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক রচনার মধ্য দিয়াও ইহার ধারা অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার বেগ আর কোন দিক হইতে রোধ মানিল না। তবে এই কথা সত্য, মধুসূদনের এই বিষয়ে যে জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারদিগের তাহা ছিল না; সেইজন্য 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অনুযায়ী তাঁহারা নাটক রচনা করিতে গিয়া ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টি করিলেও যথার্থ ট্রাজিডির আদর্শে তাঁহাদের পরিকল্পিত ঘটনারাশিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেন না। তাহার ফলে ট্রাজিডির পরিবর্তে তাঁহারা যাহা রচনা করিলেন, তাহা অতি-নাটক বা melo-drama-র পর্যায়ে নামিয়া গেল। তথাপি মধুসূদনকেই এই ধারার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবর্তক বলা যায়।

উল্লেখযোগ্য এইজন্য বলি যে, মধুসূদনের পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন বাঙ্গালী নাট্যকার কর্তৃক ট্রাজিডি-ধর্মী একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হইয়াছিল,তাহার নাট্যকারের নাম উমেশচন্দ্র মিত্র এবং নাটকের নাম 'বিধবা-বিবাহ'। কিন্তু এই নাটকখানি উদ্দেশ্যমূলক রচনা মাত্র ছিল, সমসাময়িক কালে ইহা যে উত্তেজনারই সৃষ্টি করুক, শাশ্বত সাহিত্যগুণের অভাবে তাহা যুগোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনা নহে, সমসাময়িক উত্তেজনামূলক কোন বিষয়বস্তু ইহার নির্ভর ছিল না, ইহাকে স্থায়ী ভাবে সাহিত্য গুণান্বিত করাই রচনার উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং 'বিধবা-বিবাহ নাটক' অপেক্ষা ইহার সাহিত্যিক আবেদন অধিকতর সার্থক হইয়াছিল। সমসাময়িক সমস্যাকে সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করিয়া কেবল সাহিত্যিক উপকরণ লইয়া ট্রাজিডি রচনা ইহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই।

কেহ কেহ এই সম্পর্কে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তি-বিলাস' নাটকখানিরও উল্লেখ করিতে পারেন; কিন্তু 'কীর্তি-বিলাস' নাটকে বাস্তব জীবনের উপকরণের অভাব দেখা যায়, ইহা একটি রূপকথার কাহিনীর রোমান্টিক নাট্যরূপ; সুতরাং ইহার ট্রাজিডির সম্ভাবনা অত্যন্ত গৌণ। সুতরাং সকল দিক হইতেই দেখা যাইতেছে যে, মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্য দিয়াই বাংলা সাহিত্যে ট্রাজিডি রচনার সার্থক উত্তরাধিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই পথ অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে শত শত এই শ্রেণীর বাংলা নাটক রচিত হইয়াছিল, ট্রাজিডি হিসাবে ইহারা সার্থক না হইলেও ইহারা সকলেই যে মধুসূদন-প্রবর্তিত পথেই পদচারণা করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কেবলমাত্র মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভার অভাবে তাঁহাদের প্রয়াস সকল ক্ষেত্রে সার্থক হইতে পারে নাই।

মধুসূদনের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রহসন (Farce) বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটক'কে প্রহসন বা Farce বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। কারণ, তাহাতে জীবনের সুগভীর বেদনার কথা আছে, কেবলমাত্র অর্থহীন অসঙ্গতিই যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে; এমন কি, প্রহসনের মধ্যে চিত্রগুলি যেমন অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে, 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকে' তাহা উল্লেখযোগ্য ভাবে কিছুই হয় নাই। সুতরাং ইহাকে প্রহসন (Farce) বলা যায় না। যদি তাহাও হয়, তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মধুসূদনের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনা আর কেহই প্রকাশ করেন নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এই দুইখানি রচনার ভিতর দিয়া মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে যে এক নূতন রস-বস্তুর প্রবর্তন করিলেন, তাহা ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর জনপ্রিয় হইতে লাগিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই দুইখানি মাত্র প্রহসন অবলম্বন

করিয়া শত শত এই শ্রেণীর রচনা প্রকাশ পাইল, তবে মধুসূদনের প্রতিভা অধিকাংশেরই ছিল না বলিয়া তাহা কেবল অনুকরণজাত সৃষ্টি হইয়াই বাংলা সাহিত্যের একাংশে আবর্জনার মত স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিল, ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক সম্ভাবনার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

মধুসূদনের প্রহসন দুইখানি অবলম্বন করিয়া তাঁহার পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র উপর ভিত্তি করিয়া যেমন রচিত, তাঁহার 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। মধুসূদন তাঁহার প্রহসন দুইখানির মধ্য দিয়া জীবনের যে সত্যকে ইঙ্গিতে মাত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, দীনবন্ধু তাহাই বিস্তৃততর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রহসন রচনার মধ্য দিয়াও মধুসূদন জীবনের গভীরতম রূপটি প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; সেইজন্য কেবলমাত্র যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া তাহা সমসাময়িক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করে নাই।

মধুসূদন তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটকে'র মধ্যে যে এক শ্রেণীর পদ্য-সংলাপ সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাই গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিবার ফলে তাহা 'গৈরিশ ছন্দ' বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছে, কিন্তু মূলতঃ তাহা মধুসূদনেরই সৃষ্টি। একটু দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে:

(সারথি বেশে কলির প্রবেশ)

কলি। (স্বগত) আমি কলি,—
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম?
সতত কুপথে গতি মোর।
নলিনীরে স্বজেন বিধাতা—

জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে।
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায়।
ময়ূরের চন্দ্রকলাপ দেখি, রাগে
কদাকারে পা দু'খানি গড়ি তার আমি! —৪।১

ইহাকে ভগ্ন অমিত্রাক্ষর বলা যায়; কারণ, চৌদ্দ অক্ষরের কোন বন্ধনকে ইহাতে স্বীকার করা হয় নাই, যতিস্থানে চরণচ্ছেদই ইহার নিয়ম। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার এখানেই প্রথম প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, এই ভাবেই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার অভ্যাস করিয়াছেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি চৌদ্দ অক্ষরের বন্ধনকে স্বীকার করিয়া লইয়া অনিয়মিত ভাবে বিন্যস্ত যতি-সহকারে তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পদগুলিকে সাজাইয়াছেন—যতিস্থানে চরণচ্ছেদ করিয়া পদগুলিকে হ্রস্ব-দীর্ঘ করিতে যান নাই। গিরিশচন্দ্র কিন্তু তাহাই করিয়াছিলেন, তিনি মধুসূদনের 'পদ্মাবতী নাটকে'র উদ্ধৃত অংশেরই অনুকরণে যতিস্থানে চরণচ্ছেদ করিয়া পদগুলির হ্রস্ব-দীর্ঘ আকৃতি দিয়াছেন। তাহাই গৈরিশ ছন্দ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া গৈরিশ ছন্দ নূতন কিছুই নহে। মধুসূদনের পরিকল্পনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্বপ্রথম যে রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ইহা তাহারই রূপান্তর মাত্র। তথাকথিত এই গৈরিশ ছন্দের প্রভাব বাংলার পৌরাণিক এবং রোমান্টিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের অনুকরণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যাঁহারা নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই মধুসূদন কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত এই ছন্দ অনুসরণ করিয়া তাহাদের নাটকীয় সংলাপ রচনা করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রেও মধুসূদন যে উত্তরাধিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার ধারা বাংলা সাহিত্যে আজিও অব্যাহত আছে। মধুসূদনের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে একখানিও ঐতিহাসিক

নাটক রচিত হয় নাই, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ই বাংলা সাহিত্যে রচিত প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। অবশ্য তখন টডের রাজস্থানের কাহিনী ইতিহাস বলিয়াই গৃহীত হইত, পরবর্তী গবেষণার ফলে অবশ্য দেখা গিয়াছে যে, ইহার কাহিনীগুলির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। তথাপি মধুসূদন ইতিহাস-জ্ঞানেই ইহার উপকরণগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ অভিনয়ের সুবিধার জন্য যখন ইহাতে দুই একটি কাল্পনিক চরিত্র এবং কাল্পনিক ঘটনা সংযোগ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তখন ইতিহাসেরই দোহাই দিয়া তিনি তাঁহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার মধ্যে প্রশংসনীয় ঐতিহাসিক সচেতনতা ছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। এমন কি, যদিও তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের কথায় অস্বীকৃত হইয়া কাল্পনিক কোন চরিত্র কিংবা ঘটনা 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্যে সংযোগ করিলেন না, তথাপি ঐতিহাসিক নাটক যে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যেই পরিপূর্ণ থাকে না, বরং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত কাল্পনিক উপাদানও ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই বিষয়েও তাঁহার যথার্থ জ্ঞান ছিল, সে' কথা তিনি তাঁহার বন্ধুর নিকট লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁহার সম্যক্ ধারণা ছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। পরবর্তী কালের বাংলা ঐতিহাসিক নাটক এই আদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছে।

*

১৬

প্রত্যক্ষ প্রভাব

সমসাময়িক বাংলা নাট্যসাহিত্যের উপর মধুসূদনের নাটক প্রত্যক্ষ ভাবে কি প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। মধুসূদনের পরবর্তী কালে যে পৌরাণিক নাটক রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়, তাহার উপর মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' কিংবা 'পদ্মাবতী নাটকে'র কোন প্রভাব স্থাপিত হইতে পারে নাই। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত নাটক হইলেও কিংবা 'পদ্মাবতী নাটক' পৌরাণিক নাটকের পটভূমিকার উপর রচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক নাটক নহে। বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের তখনও জন্মই হয় নাই; এমন কি, মধুসূদন বাংলা নাটকের বিভিন্ন শাখার জনক হইলেও তিনি পৌরাণিক নাটক রচনার কোন প্রেরণা লাভ করিতে পারেন নাই। পৌরাণিক নাটকের মূল সুর ভক্তি; বাংলা নাটকে সেই চেতনা তখন পর্যন্ত সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। মধুসূনের অব্যবহিতকাল পর হইতেই বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়। অবশ্য মধুসূদনের পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধুর নাটকের মধ্যেও তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে তাহারও পরবর্তী কালে মনোমোহন বসু এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের মধ্যেই পৌরাণিক নাটক সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়।

দীনবন্ধু মিত্র মধুসূদনের নাটক দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই প্রভাবের কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল, দীনবন্ধু তাঁহার নাটক রচনার সর্বস্তরেই যে মধুসূদনের নাটক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রকৃত পক্ষে মধুসূদনের প্রহসন দুইখানি যে ভাবে দীনবন্ধুকে প্রভাবিত

করিয়াছিল, তাঁহার অন্যান্য নাটক সেইভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। দীনবন্ধু কোন পৌরাণিক বিষয়বস্তু লইয়া নাটক রচনা করেন নাই; এমন কি, মধুসূদনের অনুসরণ করিয়া কোন ঐতিহাসিক নাটকও রচনা করেন নাই। দীনবন্ধু 'নীল-দর্পণ' নামে যে বিয়োগান্তক নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। কারণ, উভয়ের রচনাগত বৈশিষ্ট্য, কাহিনী-বিন্যাস এবং চরিত্র-উপস্থাপনার রীতি এখানে বিভিন্ন। বিশেষত মধুসূদন ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী জীবনের বহির্ভূত একটি কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন, দীনবন্ধু সমসাময়িক সমাজ-জীবন হইতে প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা অবলম্বন করিয়াছেন। উভয় নাটকের মধ্যে বক্তব্য বিষয়েও পার্থক্য আছে। বিশেষত রচনার দিক দিয়া 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ট্রাজিডির লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, 'নীল-দর্পণ' অতি-নাটক বা melodrama ব্যতীত কিছুই নহে। বক্তব্য বিষয়ের দিক হইতে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র আবেদন চিরন্তন; কারণ, মানব-জীবনে নিয়তির নিগূঢ় লীলা সম্পর্কে ইহাতে যাহা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা জীবনের একটি শাশ্বত সত্য, কিন্তু 'নীল-দর্পণে' এই চিরন্তন জীবন-সত্যের সামগ্রিক কোন উপলব্ধি নাই।

সুতরাং মধুসূদনের কোন নাটকেরই প্রত্যক্ষ কোন প্রভাবের পরিচয় দীনবন্ধুর নাটকে পাওয়া যায় না; তবে দীনবন্ধুর প্রহসনে তাহার অভাব নাই, তবে তাহাতে মধুসূদনের নাটকের প্রভাব নহে, বরং তাহার পরিবর্তে তাঁহার ক্ষুদ্র প্রহসন দুইখানিরই প্রভাব অনুভব করা যায়। ইহার একটি নিগূঢ় কারণ আছে। মধুসূদনের নাটক যে তাঁহার প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি নহে, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি নহে বলিয়াই তাহা অন্যের মধ্যে প্রভাব বিস্তার কিংবা প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারে নাই। কিন্তু মধুসূদনের প্রহসন দুইখানি তাহা নহে, ইহারা তাঁহার মৌলিক প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করিতেছে; সেইজন্য ইহাদের

শক্তি তাঁহার নাটকগুলি হইতে অধিক। বিশেষত দীনবন্ধুর প্রতিভা হাস্যরসিকের প্রতিভা; জীবনের সর্বস্তরেই তিনি হাস্যরসের উপাদানের সন্ধান করিয়াছেন এবং তাহার অভিব্যক্তিই তাঁহার মধ্যে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মধুসূদনের প্রহসন দুইখানির মধ্যে তিনি হাস্যরসের যে সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভাকে নিজের সৃষ্টিকর্মে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। সেইজন্য তাহাদের দ্বারাই তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন; নাটকগুলি দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইতে পারেন নাই।

মধুসূদন বাংলা নাটকের আঙ্গিক বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছিলেন সে কথা পূর্বেও বলিয়াছি এবং তাহা নিখুঁতভাবে অনুসরণ করিয়া তাঁহার পরবর্তী কাল হইতেই বাংলা নাটক রচনার সূচনা হইয়াছিল। এই বিষয়ে কিছুকাল পর্যন্ত দুই একজন নাট্যকার নিজের নিজের আদর্শ মত অগ্রসর হইলেও দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু কিংবা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইঁহারা সকলেই মধুসূদনের নাট্যরচনার আঙ্গিক আনুপূর্বিক অনুসরণ করিয়াছেন। মধুসূদনের রচনার আদর্শের মধ্যেই তাঁহারা নিজেদের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

দীনবন্ধু রচিত 'নীল-দর্পণ' নাটকের বহুল প্রচার সত্ত্বেও এই কথা সত্য, তাঁহার প্রহসনগুলিই অধিকতর সাহিত্যিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধুর মধ্যে এই বিষয়ে যে সহজাত প্রেরণা ছিল, তাহা মধুসূদনের প্রহসনগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রত্যক্ষভাবে চোখের সম্মুখে ছিল বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও দীনবন্ধু তাঁহার 'সধবার একাদশী'র মত দুঃসাহসিক রচনা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার দ্বারা তাহা সম্ভব হইত না।

দীনবন্ধুর পর হইতেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক নূতন যুগের আবির্ভাব হয়, তাহাতে পৌরাণিক নাটক রচনাই প্রাধান্য লাভ করে। মধুসূদনের নাট্যরচনার ভাবগত কোন প্রভাব তাহার

মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই, তবে এই যুগে মধুসূদনের একটি বিষয়ের প্রভাব সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি গৌণ প্রভাব, গৈরিশ ছন্দের মধ্য দিয়া তাহার রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

মধুসূদন কোন সামাজিক নাটক রচনা করেন নাই, অথচ বাংলা নাট্যসাহিত্যে ক্রমে সামাজিক নাটক রচনার ধারাও প্রবর্তিত হইয়াছিল, এই বিষয়ে দীনবন্ধুকেই নূতন যুগের অগ্রদূত বলা যায়। কারণ, তাঁহার পূর্বে যে কয়খানি সামাজিক নাটক রচিত হইয়াছিল, যেমন 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটক' কিংবা 'বিধবা-বিবাহ নাটক' ইহারা পরবর্তী কালের সামাজিক নাটক রচনার ধারার সঙ্গে কোন যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। বরং দীনবন্ধু সামাজিক নাটক রচনার যে ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার ধারা তখন হইতে অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

মধুসূদন সামাজিক নাটক রচনা না করিলেও তাঁহার প্রহসনগুলি বহু সামাজিক নাটক রচনায় প্রেরণা দিয়াছিল। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'ই তাহার প্রমাণ। 'সধবার একাদশী'কে কেবলমাত্র প্রহসন রূপে গ্রহণ না করিয়া পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটকরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে, তবে সে কথা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য। মধুসূদনের মধ্যেই বাংলার সমাজকে খুঁটিনাটি করিয়া নানাদিক হইতে দেখিবার প্রবণতা দেখা দেয়—কেবলমাত্র একদিক হইতে অর্থাৎ কৌতুককর হাস্যতরল দিকটি কিংবা কেবলমাত্র সমস্যামূলক দিকটি হইতেই তাহাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। যদিও মধুসূদনের প্রহসনগুলিতে সমাজ এবং জীবনের পরিসর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তথাপি ইহাদের মধ্যেও জীবনকে আত্মনির্লিপ্ত হইয়া প্রত্যক্ষ করিবার ভঙ্গিটি প্রকাশ পাইয়াছে, দীনবন্ধু বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাহাই আরোপ করিয়া তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনভিত্তিক রচনা 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' ইত্যাদি রূপদান করিয়াছেন। সকল সংস্কারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া

জীবন এবং সমাজ সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দুঃসাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ করিবার শক্তি মধুসূদন ব্যতীত আর কাহারও ছিল না। ধর্মভণ্ডের মুখোস খুলিয়া দিবার, নব্য বঙ্গের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্‌ঘাটন করিবার সাহস সেদিন তাঁহার মত আর কাহার ছিল? দীনবন্ধু এবং তাঁহার পরবর্তী প্রহসন রচয়িতৃগণ সেই পথই প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন।

মধুসূদনের পরবর্তী বাংলা প্রহসন রচনার ধারা যদি অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বাংলা প্রহসন প্রধানতঃ দুইটি ধারায় বিভক্ত হইয়াছে, একটি ধারা নৈতিক ব্যভিচারমূলক, আর একটি ধারা ধর্মের নামে ভণ্ডামি করিবার কাহিনী লইয়া রচিত হইয়াছিল। এই দুইটি ধারাই মধুসূদনের দুইটি প্রহসনের ভিতর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। তবে মধুসূদন ইহাদের মধ্যেও যতখানি সংযম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিল, তাঁহারা তাহার কোন ধারই ধারেন নাই, তাহার ফলে তাঁহাদের রচনায় অসংযত জৈব লালসার উদ্দাম নৃত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তারকেশ্বরের মোহান্ত এবং এলোকেশীর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ধর্মের নামে ব্যভিচারের কাহিনীর ধারাটিকে প্রবলতর করিয়াছিল।

※

মধুসূদনের হাস্যরস—নাটকে ও প্রহসনে

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুনির্মল হাস্যরসের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন। এই বিষয়ে মধুসূদনের কথাও নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হইয়াছিল; কিন্তু মধুসূদনের মধ্যে যদি রবীন্দ্রনাথ ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতেন, তবে তিনি কদাচ এই অভিমত প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অভিমত অনুযায়ী স্বীকার করিতে হয় যে, মধুসূদনের সাহিত্যেও সুনির্মল হাস্যরসের প্রকাশ দেখা যায় না। বিষয়টি বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক; কারণ, মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, তিনিও প্রথমত হিন্দু কলেজ এবং তারপর বিশপ্‌স্‌ কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সাহিত্যে হাস্যরসের যাহা আদর্শ, তাহার সঙ্গে তাঁহার যত নিবিড় পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল, এমন আর কাহারও হয় নাই। সুতরাং তাঁহার মধ্যেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য অনুযায়ী সুনির্মল হাস্যরসের অস্তিত্ব অনুভব করিবার কথা; কিন্তু কি কারণে তাঁহার মধ্যে তাহার অভাব দেখা যায়, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনকাল হইতেই হাস্যরসের যে সনাতন ধারা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা যতদূর জানি, তাহা হইতে মনে হইবে যে, তাহা অত্যন্ত স্থূল প্রকৃতির ছিল, ভারতচন্দ্র পর্যন্ত তাহারই ধারা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। তবে ভারতচন্দ্র শিল্পী ছিলেন, তাঁহার শিল্পবোধ দ্বারা তিনি ইহার স্থূলতাকে অনেক ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু স্থূলতাকে স্থূলভাবে অনুভব করার রীতিই এই দেশের রসিক-সমাজের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল, সেইজন্য তাঁহার শিল্পচাতুর্য সত্ত্বেও স্থূলতা হইতে ইহাকে

বেশি দূর রক্ষা করিতে পারেন নাই। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে কবি ঈশ্বর গুপ্ত সেই ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার উপর এই বিষয়ে ভারতচন্দ্রেরই প্রভাব স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু মধুসূদন কেন ঈশ্বর গুপ্তের পথে অগ্রসর হইলেন? তাঁহার হাস্যরসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যসুলভ মার্জিত জীবনবোধ প্রকাশ না পাইবার কি কারণ বলিয়া অনুভব করা যাইতে পারে? বিষয়টি গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

মধুসূদনের তিনখানি নাটক অর্থাৎ 'শর্মিষ্ঠা নাটক', 'পদ্মাবতী নাটক' এবং 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ইহাদের কাহারও মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টির বিশেষ কোন অবকাশ ছিল না; কিন্তু তাহা হইলেও সার্থক নাট্যকার এই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্যেও হাস্যরসের অবতারণা করিয়া লইতে পারেন, মধুসূদন এই কাজ কতদূর করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র মধ্যে বিদূষকের চরিত্র আছে, সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রের অনুরূপ আদর্শে তাহার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতই 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র বিদূষকও নিতান্ত স্থূল দৃষ্টি এবং স্থূল আচরণসিদ্ধ চরিত্র। মধুসূদন এখানে সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া বিদূষকের চরিত্রের মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য দান করিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীহর্ষ রচিত সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটকের বিদূষক এবং কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের বিদূষক চরিত্রেরই অনুকরণ করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, নাটকখানি মধুসূদনের পরমুখাপেক্ষী রচনা; সুতরাং ইহার মধ্যে এই বিষয়ে মধুসূদনের অন্যথা করিবার উপায় ছিল না; অতএব ইহার মধ্য দিয়া মধুসূদনের নিজস্ব হাস্যরসবোধেরও সন্ধান পাইবার কোন উপায় নাই।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র মধ্যে দুইজন নাগরিকের চরিত্র আছে। সাধারণত বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর চরিত্রের অকারণ কৌতূহল কিংবা অহেতুক উৎসাহ প্রকাশের মধ্য দিয়া হাস্যরসের অবতারণা

করা হইয়া থাকে। বিশেষত এই শ্রেণীর চরিত্র যদি নাগরিক না হইয়া গ্রাম্য হয়, তবে তাহাদের মূর্খতা এবং নাগরিক জীবন সম্পর্কিত অনভিজ্ঞতা লইয়াও হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়া থাকে ; কিন্তু এখানে নাগরিক চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া কোন প্রকার হাস্যরসের অবতারণা করা হয় নাই। ইহারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গুরুগম্ভীর আলোচনা করিয়াছে, বরং তাহারা নীতিবাক্য বর্ষণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে হাস্যরস অবতারণার কোন ইঙ্গিত মাত্রও প্রকাশ পায় নাই। এক বিদূষকের গতানুগতিক স্থূল হাস্যরস-চর্চা বাদ দিলে 'শর্মিষ্ঠা নাটক' সম্পূর্ণ হাস্যরস বিবর্জিত রচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, তাহার ফলে যদিও ইহা মিলনাত্মক নাটক, তথাপি ইহার কাহিনী অকারণ গুরুত্বে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদনের 'পদ্মাবতী নাটকে'র মধ্যেও বিদূষক চরিত্র আছে এবং তাহার মাধ্যমে তিনি কাহিনীর কোন কোন অংশে স্থূল হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'শর্মিষ্ঠা নাটক' কিংবা 'পদ্মাবতী নাটকে' বিদূষক চরিত্রের মাধ্যমে যে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা যতই স্থূল হউক না কেন, তাহা নির্মল নহে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, সংস্কৃত নাটকে বিদূষক চরিত্র রাজা চরিত্রেরই সহচর, মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের এই আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিয়াই তাঁহার বিদূষক চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছেন। পরবর্তী কোন কোন নাট্যকার প্রধানত গিরিশচন্দ্র ঘোষ সংস্কৃত নাটকের এই আদর্শ রক্ষা করেন নাই, তাঁহার পরিকল্পনায় বিদূষক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বিদূষকের স্ত্রীর একটি চরিত্রও কল্পিত হইয়া উভয়ের ভাঁড়ামির মধ্যে হাস্যরসের নির্মলতা মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু মধুসূদন তাহা করেন নাই, বিদূষকের কোন স্ত্রীর চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়া উভয়ের কোন গ্রাম্য রসিকতার অবতারণা করেন নাই। তাঁহার বিদূষক চরিত্র রাজা চরিত্রেরই নিত্যসহচর বলিয়া রাজার মর্যাদা

রক্ষা করিয়াই তাঁহার সঙ্গে রসিকতা করিয়াছেন, ইহাতে স্থূলতা থাকিলেও নির্মলতার অভাব ছিল না।

তবে মধুসূদনের প্রহসন দুইখানি সম্পর্কে এই কথা বলিবার উপায় নাই। প্রহসন বলিতে মধুসূদন কি মনে করিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন ; কিন্তু প্রহসন হইলেই যে তাহাতে স্থূল বাস্তব জীবনের অতিরঞ্জিত চিত্র থাকিতে হইবে, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'ও একটি সার্থক প্রহসন ; কিন্তু তাহার মধ্যে হাস্যরসের নির্মলতা যেমন রক্ষা পাইয়াছে, জীবনের গভীরতাও তেমনই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন সে পথে অগ্রসর হন নাই। কেন হন নাই, সেই বিষয়ে কয়েকটি কথা অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র।

মধুসূদন যখন তাঁহার নাটক-প্রহসনগুলি রচনা করেন তখন বাংলার বিদগ্ধ সমাজে সংস্কৃত সাহিত্যজাত রুচিবোধের প্রবল প্রভাব বর্তমান ছিল। মধুসূদন অন্যের অনুরোধেই তাঁহার নাটকগুলির মত প্রহসনগুলিও রচনা করিয়াছেন, পরের অনুরোধের অর্থ সেদিন যে কি ছিল,তাহা মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন ; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত কাব্য-নাটকের আদর্শ দ্বারা সে যুগের সমাজের হাস্যরসের আদর্শও গড়িয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের হাস্যরসবোধ নিতান্ত স্থূল ছিল, অনেক সময় সেই স্থূলতা নির্মলতাকেও স্পর্শ করিত। মধুসূদন সংস্কৃত কাব্য-নাটক পড়িয়া এই ধারণাতেই বিশ্বাসী হইয়াছিলেন যে, স্থূলতা ব্যতীত হাস্যরসাত্মক রচনা সে যুগের বাঙ্গালী সমাজের অনুমোদন লাভ করিতে পারিবে না। সেই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যে স্থূল প্রকৃতির হাস্যরসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের যুগ এক ছিল না, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় হাস্যরসের যে আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিংবা হাস্যরস সম্পর্কে যে ধারণা নিজের মধ্যে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, মধুসূদন তাহা পান

নাই। কারণ, মধুসূদন যে শিক্ষায়ই শিক্ষালাভ করুন না কেন, তাঁহার পরমুখাপেক্ষী রচনা প্রহসন দুইখানির মধ্যে নিজস্ব উন্নত রসবোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যুগ-প্রবাহে যে পঙ্কিলতা ভাসিয়া আসিতেছিল, তাহাকে অস্বীকার করিয়া যুগের সমর্থন লাভ করা তাঁহার পক্ষে সে দিন সম্ভব ছিল না। সেইজন্য প্রহসন দুইখানিকে যুগোচিত রূপ দিতে গিয়াই তিনি তাহাদের মধ্যে স্থূলতার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন।

মধুসূদন যে যুগে তাঁহার নাটক ও প্রহসনগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সেই যুগে হাস্যরসাত্মক বাংলা সাহিত্যের আদর্শ রচয়িতা ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। তাহার রস এবং রুচিবোধের মধ্যেই সে যুগের রস এবং রুচিবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। মধুসূদন তাঁহার প্রহসন দুইখানিকে সেই যুগোচিত রূপ দিবার জন্য স্বভাবতই ঈশ্বর গুপ্তের পথই সেদিন অনুসরণ করিয়াছিলেন, নিজস্ব রস এবং রুচিবোধের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

১৮

মধুসূদনের নীতি ও রুচিবোধ—নাটকে এবং প্রহসনে

মধুসূদন উচ্চ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, সুতরাং এই কথা নিতান্তই স্বাভাবিক যে তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের উন্নত রুচিবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবেন। তাঁহার নাটকের মধ্যে তাহার নিদর্শন সন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, মহাভারতের কাহিনীকে আধুনিক যুগের রুচি অনুযায়ী মার্জিত করিয়াই তিনি তাহা তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন। মহাভারতের প্রতি আনুগত্য দেখাইতে গিয়া সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন রুচিবোধের তিনি মর্যাদা রক্ষা করিবার প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' তিনি মহাভারতের কাহিনী যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহা প্রমাণিত হইবে। মহাভারতের মধ্যে দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা উভয়েই উপযাচিকা হইয়া যযাতির পাণি-প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে যযাতি কোন ইচ্ছা প্রকাশ ত দূরের কথা, তাহাদের অনুরোধ বার বার উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আদর্শ অনুযায়ী দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠাকে এই হীনতা হইতে মুক্ত করিয়া যযাতিকেই তাহাদের প্রতি অনুরাগী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মহাভারতের মধ্যে বিশেষত শর্মিষ্ঠা যে ভাবে উপযাচিকা হইয়া রাজার সঙ্গ কামনা করিয়াছে, তাহা আধুনিক রুচির দিক হইতে অত্যন্ত দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে শর্মিষ্ঠা চরিত্রের উচ্চ নায়িকা-সুলভ গুণও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মধুসূদন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাহা পরিহার করিয়া শর্মিষ্ঠাকে গৌরবান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহা মধুসূদনের উচ্চ নীতি ও রুচিবোধের ফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। প্রণয়ীরূপে কল্পনা করিয়াও যযাতির আচরণের মধ্যেও মধুসূদন

তাঁহার উচ্চ রাজমর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ভোগী রাজা যযাতির চরিত্রকে লম্পটরূপে উপস্থাপিত করেন নাই।

মধুসূদনের উপর ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ যে প্রভাব স্থাপনই করুক না কেন, তিনি সংস্কৃত নাটককে আদর্শ করিয়াই তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কিন্তু তিনি সংস্কৃত নাটকের নীতি এবং রুচিবোধ অনুসরণ করেন নাই। এই সম্পর্কে শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের বাংলা অনুবাদকে মধুসূদন আদর্শ বলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটককেও নানাদিক হইতে অনুকরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যেখানে আধুনিক নীতি এবং রুচিবোধের বিষয় আসিয়াছে, সেখানে তিনি সংস্কৃত আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া প্রধানত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সুলভ উচ্চ নীতিবোধকেই অনুসরণ করিয়াছেন। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' সংস্কৃত শৃঙ্গার রসাত্মক নাটকের আদর্শে রচিত নাটক, অথচ সংস্কৃত শৃঙ্গার রসাত্মক নাটকগুলিতে পরিপূর্ণ যে আদর্শ গৃহীত হইয়া থাকে, যে সকল দৃশ্যের সাধারণত উপস্থাপনা করা হয়, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' কেবলমাত্র রুচির মুখ রক্ষা করিয়াই তাহা করা হয় নাই। এই সম্পর্কে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কদলী গৃহের প্রণয়-দৃশ্যের উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে কালিদাস রচিত নায়ক-নায়িকার এই প্রণয়-দৃশ্যের অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালের সকল শৃঙ্গাররসাত্মক সংস্কৃত নাটকের প্রণয়-দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র আদর্শে 'রত্নাবলী নাটকে'ও অনুরূপ একটি প্রণয়-দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন তাহাদেরই অনুসরণে শৃঙ্গার রসাত্মক কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করা সত্ত্বেও উপরোক্ত সংস্কৃত নাটকগুলির অনুরূপ নায়ক-নায়িকার কোন প্রণয়-দৃশ্যের অবতারণা করেন নাই। ইহা মধুসূদনের আধুনিক নীতি এবং রুচিবোধের ফল। অথচ মধুসূদনের অনুরূপ দৃশ্য অবতারণা করিবার যেমন সুযোগও ছিল, তেমনই দাবীও ছিল।

দাবী ছিল এই জন্য যে, যে 'রত্নাবলী নাটকে'র অভিনয় বেলগাছিয়া নাট্যশালায় সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, মধুসূদন তাঁহার নাটককেও অনুরূপ সার্থকতা দিবার জন্য স্বভাবতই তাহারই অনুকরণে তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করিবার কথা ছিল। 'রত্নাবলী নাটক' তিনি নিজে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার প্রতিটি দৃশ্য এবং সংলাপের সঙ্গে তাঁহার নিগূঢ় পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল ; তিনি ইহার অভিনয় দেখিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও নীতি এবং রুচির দিক দিয়া যাহা পরিত্যজ্য বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা তিনি পরিত্যাগ করিয়াই তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক'কে আধুনিক নীতি এবং রুচিসম্মত রূপ দিয়াছেন। সেইজন্য 'রত্নাবলী নাটকে'র মূল শৃঙ্গার-রসাত্মক দৃশ্যগুলিকে তিনি পরিত্যাগ করিয়াই তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করিয়াছেন। 'রত্নাবলী নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় সাফল্য লাভ করিলেও আনুপূর্বিক তিনি তাহারই অনুকরণ করিয়া তাঁহার নাটক রচনা করেন নাই।

কিন্তু এই কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অতিরিক্ত পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে, ভারতীয় জীবনের নীতি এবং রুচিবোধ সম্পর্কে মধুসূদনের মনে কোন কোন সময় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মধুসূদনের 'পদ্মাবতী নাটকে'র কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। নারীর দৈহিক সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার বিষয় লইয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে। ভারতীয় জীবনাদর্শে নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের কোন মূল্য স্বীকার করা হয় নাই। রামায়ণ-মহাভারত প্রমুখ জাতীয় মহাকাব্যগুলির মধ্যে তাহার কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ পাশ্চাত্ত্য দেশে ইহার সামাজিক মূল্য আছে। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া 'পদ্মাবতী নাটকে'র কাহিনীটি পরিকল্পনা করিয়াছেন, প্রাচ্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া নহে। তবে এ'কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, দৈহিক সৌন্দর্য 'পদ্মাবতী নাটকে'র লক্ষ্য হইলেও, তাহা কোথাও দেহজ লালসার বর্ণনা-পর্যায়ে নামিয়া যায় নাই, ইহাতে নীতি কিংবা

রুচির দিক দিয়া দূষিত কোন অশালীন চিত্র নাই। কেবলমাত্র মূল লক্ষ্যের দিক দিয়া ইহার মধ্যে যে আপত্তিকর বিষয়ই থাক না কেন, চিত্র কিংবা চরিত্র বর্ণনায় ইহার মধ্যে উন্নত নীতি এবং রুচিবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অন্ততঃ রুচির দিক দিয়া রামনারায়ণ এবং ঈশ্বর গুপ্ত হইতে যে আমরা বহু দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি, তাহা এই নাটকটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। 'পদ্মাবতী নাটকে'র প্রত্যেকটি চরিত্রই দেবদেবীর চরিত্র, দেবদেবীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াই এখানে তাহারা চিত্রিত হইয়াছেন। পূর্ববর্তী শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র দেবদেবীকে লইয়া যেমন লৌকিক-কৌতুকরস উপভোগ করিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহা হইতে দেব-দেবীর চরিত্রকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার নাটকের মধ্যে যথাযথ মর্যাদার আসনে স্থাপন করিয়াছেন। 'পদ্মাবতী নাটকে'র মূল লক্ষ্য যাহাই থাকুক না কেন, ইহার কোন চিত্র কিংবা চরিত্র নৈতিক কিংবা রুচির দিক দিয়া কলুষিত নহে।

'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ও যে উন্নত রুচিবোধের পরিচায়ক, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। অথচ ইহার মধ্যে বারবনিতার একটি চরিত্রও আছে। বারবনিতার চরিত্রটি সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিকা' নাটিকার একটি অনুরূপ চরিত্র হইতে আসিয়াছে। তবে বারবনিতার জীবনকে বাস্তব রূপে প্রকাশ করিবার জন্য অত্যন্ত সংযত ভাবেই তাহার সংলাপের ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহার জীবন ও আচরণ অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। বিশেষত 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র কাহিনী মূলত শৃঙ্গার রসাত্মক কিংবা প্রেমের কাহিনী নহে; সুতরাং ইহার মধ্যে তাহার অবকাশও খুব বেশী ছিল না।

মধুসূদনের সর্বশেষ নাট্যরচনা 'মায়া-কানন'ও উন্নত নীতিবোধ এবং রুচিজ্ঞানের ফল। অথচ ইহাও প্রেমেরই কাহিনী। তবে সংস্কৃত শৃঙ্গার রসাত্মক নাটক অনুযায়ী ইহার কাহিনী পরিকল্পিত হয় নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মধুসূদন তাঁহার রচিত সব কয়খানি নাটকের মধ্য দিয়াই উন্নত রুচিবোধের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত কুরুচির যে নগ্নলীলা চলিতেছিল, মধুসূদন তাঁহার নাটক রচনার ভিতর দিয়া তাহারই প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটক', 'বিধবা-বিবাহ নাটক' ইহাদের মধ্যে সে দিন জীবনের যে বাস্তব রূপই প্রকাশ পা'ক না কেন, ইহারা যে ভাবে সে দিন শিক্ষিত সমাজের রুচি এবং নীতিবোধকে আঘাত করিয়াছিল, তাহারই ফলে সে যুগের বাংলা নাটক শিক্ষিত জনসাধারণের উপেক্ষা এবং অবহেলার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনই বাংলা নাটককে সেই দুর্গতি হইতে সর্বপ্রথম রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই মধুসূদন সম্পর্কে শেষ কথা ছিল না। তিনি যদি তাঁহার প্রহসন কয়খানি রচনা না করিতেন, তবে অবশ্য এই কথাই তাঁহার সম্পর্কে শেষ কথা হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার প্রহসন দুইখানি এই বিষয়ে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছে।

পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে একখানি প্রহসন (Farce) রচনা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শ শিরোধার্য করিয়া লইয়া তিনি বাঙ্গালী পাঠককে দুইখানি প্রহসন উপহার দিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের একখানি 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং আর একখানি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। প্রহসন দুইখানির ভিতর দিয়া মধুসূদনের প্রতিভার নূতন একটি দিক বিকাশ লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার মধ্যে ইহারা কয়েকটি ত্রুটিরও সন্ধান দিয়াছে। তাহা রুচি এবং নীতিগত ত্রুটি। প্রহসন বলিতে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ যে অনুরূপ রচনা মনে করেন নাই, তাহা ইহাদিগকে যে উদ্দেশ্যে রচনা করিবার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিবার মধ্য হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রহসন দুইখানিকে

'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'য় অভিনয় করাইবার উদ্দেশ্যেই রচনা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ইহারা কোনদিনই অভিনীত হয় নাই। নিন্দিত রুচি এবং নীতিবোধই ইহার কারণ, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

মধুসূদন তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে তৎকালীন কলিকাতার ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের একটি চিত্র আঁকিয়াছেন। এই চিত্র বহুলাংশে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে পারে, তবে প্রহসনে অতিরঞ্জন কোন দোষ নহে। আধুনিক বাংলা নাট্যরচনায় শিক্ষিত মাতাল এবং বারাঙ্গনা জীবনের বাস্তব চিত্র ইহাতেই সর্বপ্রথম প্রবেশ করিল এবং ক্রমে বাংলা নাটক এবং প্রহসন রচনার মধ্য দিয়া তাহার ধারা উত্তাল হইয়া উঠিল। মধুসূদন তাঁহার চারিখানি নাটক রচনায় যে সংযম এবং উচ্চ নীতিবোধের পারিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইহার মধ্যে নির্মম ভাবে পদদলিত হইল। শুধু মাতাল এবং বারাঙ্গনার বাস্তব চিত্রই নহে, মধুসূদন ইহার মধ্যে পারিবারিক জীবনের যে চিত্র পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহাও সুনির্মল নহে। অথচ সেদিন শিক্ষিত বাঙ্গালীর বহির্জীবনে যে অনাচারই দেখা দিক না কেন, পারিবারিক কিংবা অন্তঃপুরের জীবন সেই তুলনায় বিশেষ কিছুই দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় নাই। মধুসূদন যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই কলিকাতার সমাজ-জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া মাদ্রাজে প্রবাস-জীবন যাপন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল পর মাদ্রাজ হইতে পরিপূর্ণ সাহেব হইয়া যখন পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহার পরিণত বয়স, শুধু তাহাই নহে, যে বিজাতীয় জীবন-সংস্কারে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে তখন তিনি আর বাঙ্গালীর পারিবারিক কিংবা অন্তঃপুরের জীবন সম্পর্কে নূতন করিয়া কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন নাই। তাহার ফলেই বাঙ্গালী পরিবারের কতকগুলি সম্পর্কের রস এবং রহস্য তিনি কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি তাঁহার 'একেই কি

বলে সভ্যতা'র মধ্যে ননদ-ভাজের যে সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যেমন দুর্নীতি এবং কুরুচির পরিচায়ক, তেমনই অবাস্তব।

মধুসূদনের রচিত পৌরাণিক, রোমান্টিক কিংবা ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে বাংলার পারিবারিক জীবনের কোন চিত্র প্রকাশ পাইতে পারে নাই। এমন কি, তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকার তারাচরণ শিকদার তাঁহার 'ভদ্রার্জুন' নাটকের বিষয়বস্তু মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াও তাহার মধ্যে নানাস্থানে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের ছায়াপাত ঘটাইয়াছেন, কতকগুলি চরিত্রও বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন-রসে জারিত করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদন তাহা করিতে যান নাই। তিনি তাঁহার পরবর্তী নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মত মহাভারতের জীবনের সঙ্গে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনকে মিশাইয়া ফেলেন নাই; কিংবা রাজপুত-জীবনের ইতিহাসের মধ্যেও বাঙ্গালী জীবনের রসচেতনা-সঞ্চারিত করিয়া দেন নাই। ইহা মধুসূদনের নাটকের একটি প্রধান গুণ। মধুসূদন প্রহসন দুইখানির মধ্যেই একদিক দিয়া সেদিনকার বাঙ্গালীর নাগরিক জীবন এবং আর এক দিক দিয়া তাহার গ্রাম্য জীবনের চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রাম্য জীবনের চিত্রটি তিনি তাঁহার শৈশব এবং কৈশোরের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি ইহার বাস্তব গুণ অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তবে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র মধ্যে পল্লীর পারিবারিক জীবনের কোন চিত্র প্রকাশ না পাইলেও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে নাগরিক জীবনের অন্তঃপুরের চিত্রটি প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সম্পর্কে মধুসূদনের ধারণা খুব প্রত্যক্ষ ছিল না বলিয়াই তাহার উপর একটু রুচিহীনতার ছাপ পড়িয়াছে।

*

১৯

শেষ নাটক

মধুসূদন তাঁহার জীবনের অন্তিম অবস্থায় উপনীত হইয়া তাঁহার সর্বশেষ নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'মায়া-কানন।' এই নাটকখানি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিশেষ কোন আলোচনা করি নাই; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইহা মধুসূদনের সকল প্রতিভা যখন সম্পূর্ণ অস্তমিত হইয়া গিয়াছে, রোগ এবং অর্থাভাবে যখন তিনি পীড়িত হইয়া মৃত্যুর দিন গণনা করিতেছেন, তখন "বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষ ও অনুষ্ঠাতৃগণ, এই সময় তাহাদিগের রঙ্গশালার জন্য একখানি নাটক রচনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও তাহা রচনা করিতে" আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা তিনি সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। সেইজন্য ইহা কোন মতেই মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতে পারে নাই। বিশেষত তিনি তাঁহার নাটক-প্রহসন রচনার যুগ উত্তীর্ণ হইয়া বহুদূর অগ্রসর হইবার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া ইহা রচনা করিয়াছেন; তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সূচনাতে যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার নাটক এবং প্রহসনগুলি রচনা করিয়াছিলেন, ইহার রচনার সময় সেই আদর্শ তাঁহার সম্মুখে তখন আর কোন মতেই বর্তমান ছিল না। সেইজন্য তাঁহার পূর্ববর্তী নাটক-প্রহসন সম্পর্কে যে কথা প্রযোজ্য, ইহার সম্পর্কে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না।

পূর্বেই অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি যে, মধুসূদন কবি এবং প্রধানত গীতি-কবি হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার নাটক-প্রহসন রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,

কিন্তু 'মায়া-কানন' সম্পর্কে তাহা বলিবার উপায় নাই। এই বিষয়ে তাহার জীবনীলেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না, তিনি লিখিয়াছেন, "মধুসূদন তখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে ধীরতার সহিত গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর ছিল না; নিজের বিষাদময় জীবনের প্রতিবিম্বপাত করিয়াই তিনি স্বরচিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাহার নিজের জীবনের ন্যায় মায়া-কাননও মর্মভেদী আর্তনাদের ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সমাপ্ত হইয়াছে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে আত্মনির্লিপ্ততার গুণ মধুসূদনের প্রথম যুগে রচিত নাটক এবং প্রহসনগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, 'মায়া-কাননে'র মধ্যে সেই গুণ প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা হইতেই মধুসূদনের নাটকের ইহা একটি সাধারণ ত্রুটি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না, কারণ, যে অবস্থার মধ্য দিয়া সে সময় তাঁহাকে নাটকটি রচনা করিতে হইয়াছে, তাহার বিষয়ও বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

'মায়া-কানন' রচনার পূর্বে মধুসূদন তাঁহার কাব্য রচনার যুগ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্য রচনার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব জীবনানুভূতি প্রকাশ করিবার যে সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সংস্কার তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল; কিন্তু তিনি যখন তাঁহার নাটকগুলি রচনা করেন, তখন তাঁহার মধ্যে সেই চেতনা জাগ্রত হইতে পারে নাই। বিশেষত জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি নিজের জীবনের ব্যর্থতার বেদনা হইতে কিছুতেই মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই আত্মনিরপেক্ষ হইয়া জগৎ কিংবা জীবনের কোন সমস্যাকেই অনুভব করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই 'মায়া-কানন' নাটকে অনিবার্য ভাবে তাঁহার জীবনের কথা আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্য হইতে তাঁহার নাট্যরচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, 'মায়া-কানন' নাটকটি "লেখা সমাপ্ত হয়। তবে তিনি পরিমার্জনা করতে পারেন নি।" কিন্তু মধুসূদনের জীবনী-রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, তিনি 'মায়া-কানন' "স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাহার অসংবদ্ধ কতকগুলি অংশ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন মাত্র। বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ সেই সকল খণ্ডিত অংশ স্বেচ্ছানুরূপ সংযোজিত করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।" এই উক্তিই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। কারণ, অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানিকে কোন উপায়ে সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে যাঁহারা ইহার জন্য অগ্রিম অর্থ সাহায্য করিয়া রোগ-শয্যায় মধুসূদনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়িক ক্ষতি হইত, এই কথা সত্য। মধুসূদনকে অগ্রিম অর্থ সাহায্য করিবার মধ্যে তাহাদের কোন ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল না তাহাও বলিতে পারা যায় না। সুতরাং গ্রন্থরচনা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই যখন তিনি দেহত্যাগ করিলেন, তখন স্বভাবতই সেই ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তাঁহারা ইহাকে কোন মতে অন্য কাহারও সাহায্যে সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার উপর অন্যের হস্তক্ষেপ আছে বলিয়াই মধুসূদনের নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় ইহা তাঁহাব প্রথম যুগের নাটক প্রহসনগুলির সঙ্গে কিছুতেই সমান মূল্য লাভ করিতে পারে না।

'মায়া-কানন' প্রথম প্রকাশের সময় ইহার প্রকাশক শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় নাটকখানির জন্য যে একটি 'ভূমিকা' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে দেখা যায় 'সংবাদ-প্রভাকরে'র সহ-সম্পাদক শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।' ইহার অন্য অংশ ছিল না, সুতরাং তাহা দেখিয়া দিবার কোন প্রশ্ন হইতে পারে না, সেই অংশ তিনি নিজে রচনা করিয়া তাহাতে যোগ করিয়া

থাকিবেন। যদি তাহাই হয়, তবে নাট্যকাহিনীর পরিণতিও মধুসূদনের পরিকল্পিত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না এবং তাহার ভালমন্দের জন্যও তাঁহাকে দায়ী করা সঙ্গত হয় না।

প্রকাশকদিগের রচিত এই 'ভূমিকা' হইতে জানিতে পারা যায় যে, দুইখানি নাটক রচনার জন্য তাঁহারা মধুসূদনকে রোগশয্যায় অগ্রিম অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কথায় 'মায়া-কানন' নামে এই নাটক ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে 'আর একখানি নাটকের কতকাংশ রচনা করেন।' প্রকাশকদিগের এই দাবী সমর্থন করা যায় না। তাঁহার জীবনী-লেখকের উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি 'মায়া-কানন'ই সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, সুতরাং 'বিষ না ধনুর্গুণে'র 'কতকাংশ রচনা' করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাঁহার 'মায়া-কাননে'র প্রকাশকদিগের আর একটি উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা নিতান্ত ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই 'ভূমিকা'য় এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের সাহিত্যিক দায়িত্ববোধ কিছুই ছিল না, কারণ, তাঁহারা একটি অত্যন্ত আপত্তিকর কথা এই 'ভূমিকা'তে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, "বিষ না ধনুর্গুণ' সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র প্রকাশ করা যাইবে।" তাঁহারা উক্ত ভূমিকায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছেন যে মধুসূদন "বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন।" তারপর পাঠক সমাজকে আশ্বাস দিয়াছেন, ইহা 'সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র প্রকাশ করা যাইবে।' কিন্তু কে, কোন অধিকারে ইহা 'সমাপ্ত' করিয়া মধুসূদনের নামে তাহা প্রচার করিবেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এই প্রকার দায়িত্বহীন কাজের সম্ভাবনা যে তাহাদের মনের মধ্যে সে দিন উদিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, 'মায়া-কানন নাটক' সম্পর্কে তাহারা যে আভাস দিয়াছেন যে তাহা সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কদাচ সত্য নহে। তাঁহারা ব্যবসায়ী ব্যক্তি ছিলেন, অর্থক্ষতির

আশঙ্কায় মধুসূদনের অসম্পূর্ণ লেখাকে কোন রকমে জোড়া-তালি দিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার নামে চালাইয়াছেন, যে বই মধুসূদন কদাচ লেখেন নাই, সেই বইও কাহাকেও দিয়া লিখাইয়া লইয়া তাঁহার নামে প্রচার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু সে কাজ আর সম্ভব হয় নাই। সাহিত্যিক দায়িত্ববোধ তাঁহাদের কিছু মাত্র ছিল না, থাকিলে তাঁহারা এই প্রকার দায়িত্বহীন প্রতিশ্রুতি দিতেন না।

এই কথা একটু বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে; তাহা এই যে, অনেকে প্রকাশকের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার 'মায়া-কানন' সম্পূর্ণ রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং ইহার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া ইহার ভিত্তিতেও মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে সাধারণ ভাবে বিচার করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার জীবনী লেখকের উক্তিকে গ্রহণ না করিবার কোনই যুক্তি নাই। তিনি সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন, '"মায়া-কাননে"র দোষগুণ সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করাই সঙ্গত।'

তবে সাধারণ ভাবে দেখা যায়, 'মায়া-কানন' রচিত হইবার সময় দীনবন্ধুর সব কয়খানি নাটক প্রকাশিত হইয়া গেলেও দীনবন্ধুর ভাব এবং ভাষা দ্বারা মধুসূদন বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হন নাই। ইহা মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার গুণেই সম্ভব হইয়াছে। তিনি ইহার মধ্যে তাঁহার পূর্ববর্তী নাটকগুলি রচনার ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন সত্য, তবে তিনি তাঁহার কাব্য রচনার যে যুগ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্য দিয়া যে আত্মবোধের বিকাশ করিয়াছেন ইহার মধ্যে তাহারও অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। সুতরাং স্বভাবতই ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত রচনা হইতে পারে নাই, সে কথা পূর্বে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, বাঙ্গালীর বিজয়া-দশমী সম্পর্কে তাঁহার যে মনোভাব তাঁহার 'মেঘনাদবধ

'কাব্য' কিংবা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, এই নাটকের মধ্যেও তাহারই সুগভীর বেদনার অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তাঁহার 'মায়া-কানন' নাটকেরও একেবারে শেষ অংশে আসিয়া তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মত 'বিজয়া-দশমী'র চিত্রটি দিয়াই ইহার উপসংহার করিলেন, তিনি পঞ্চম অঙ্কে অরুন্ধতীর মুখ দিয়া প্রকাশ করিলেন, 'আজ এ সিন্ধুনগরের বিজয়াদশমী।' তারপর 'ইন্দুমতীর প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সখীর সহিত প্রস্থান'। অবশ্য এই অংশ যদি তাঁহারই রচনা হইয়া থাকে, তবে এই কথা সত্য নতুবা নহে।

বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তাঁহার প্রথম যুগের নাটকগুলির মধ্য দিয়া যে নির্লিপ্ততার ভাব দেখা গিয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহা অনেকখানি দূর হইয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে মধুসূদনের কবি-মানসের নাট্য এবং কাব্যের মিশ্র-চেতনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহার করুণরসের অনুভূতির মধ্যে কোন কোন স্থলে মধুসূদনের ব্যক্তি গত জীবনের বেদনার অনুভূতি অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল বলিয়া ইহার করুণ পরিণতি 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মত এত প্রাণহীন হইতে পারে নাই। তবে ইহাতেও সেক্সপীয়র এবং কালিদাসের নাটকের অনুকরণের প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তিনি তাহার প্রথম যুগের নাটকের ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন।

মধুসূদনের নাটক ও প্রহসনের গঠন-রীতি

বাংলা নাট্যরচনার আদি যুগে ইংরেজি নাটকের আঙ্গিক বা গঠন-রীতি অনুসরণ করিয়াই বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা দেখা দিয়াছিল সত্য, তথাপি মধুসূদনের পূর্বে এই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করা হয় নাই। বিশেষত ইংরেজি গঠন-রীতি আদর্শ করিয়া নাটক রচনা করিতে গিয়াও অনেকেই সংস্কৃত নাট্যরচনার গঠন রীতির প্রভাব হইতেও মুক্ত হইতে পারেন নাই; কারণ, সেই যুগে ইংরেজি এবং সংস্কৃত নাটক দুই-ই সমান ভাবেই অনূদিত হইয়াছিল এবং উভয়েরই প্রভাব বাংলা নাট্য-রচনার মধ্যে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদনের আবির্ভাবের পর হইতেই ইংরেজি রীতিটিই বাংলা নাট্যরচনায় স্থায়ী ভাবে গৃহীত হইল। তবে এ' কথাও সত্য, মধুসূদনকেও পরমুখাপেক্ষী হইতে গিয়া এই পথে অতি সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, প্রথম হইতেই তিনি এই বিষয়ে ইংরেজি নাটকের আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র কথাই উল্লেখ করিতে পারা যায়। মধুসূদন তাঁহার রচিত প্রথম নাটকটিতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী নাটকে'র অনুবাদটিকে অনুসরণ করিতে গিয়া পাশ্চাত্ত্য গঠন-রীতির প্রয়োগ করিতে পারেন নাই, বরং সংস্কৃত নাটকের গঠন রীতিকেই সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কতকগুলি বিষয়ে তিনি ইংরেজি নাটকের আঙ্গিক দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছেন। যেমন 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'ও তিনি ইংরেজি নাটকের

'sence'-এর অনুকরণে অঙ্কের মধ্যে দৃশ্যবিভাগের স্থান দিয়াছেন, তবে দৃশ্য শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন নাই, তাহার পরিবর্তে তিনি 'গর্ভাঙ্ক' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার পর হইতেই প্রত্যেক নাট্যকারই এই ধারা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহার অনুকরণে 'sence' অর্থে গর্ভাঙ্ক শব্দটিই প্রচলিত হইয়া গেল।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে' মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের নান্দী সূত্রধারকে বর্জন করিয়াছেন। তথাপি এ'কথা সত্য যে, ইহার আরম্ভটি নান্দী-সূত্রধরকে পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা অংশের অনুরূপই হইয়াছে। অর্থাৎ মধুসূদন ইংরেজি নাটকের গঠন-রীতি তাঁহার নাটকে গ্রহণ করিবার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, আকস্মিক ভাবে আনুপূর্বিক কোন অভিনব রীতি যাহাতে নাটকের দর্শক এবং পাঠক গোষ্ঠীকে আঘাত করিতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যে তিনি এই কার্য করিয়াছিলেন তাহা নহে, রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত 'রত্নাবলী নাটকে'র অনুবাদ-খানিকে অনুকরণ করিতে বাধ্য হইয়াই তিনি এই কাজ করিয়াছেন। নতুবা মধুসূদনের মধ্যে সকল প্রচলিত জীর্ণ সংস্কারকে ধ্বংস করিয়া অভিনব রস-রূপ প্রকাশ করিবাব প্রেরণা সর্বদাই বর্তমান ছিল। কিন্তু এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও দেশীয় পণ্ডিত সমাজ 'শর্মিষ্ঠা নাটক'খানিকে সংস্কৃত নাটকের সম্পূর্ণ ছায়ারূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র পাণ্ডুলিপি পড়িয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, 'ইহা কোন নব্য বাবুর রচনা হইবে।' যাহাই হউক মধুসূদন এই কার্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজি গঠন-রীতিকেই পরিপূর্ণ ভাবে নিজে যেমন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনই তাহা বাংলা নাট্যরচনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-গিয়াছেন। কি ভাবে তিনি তাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এখন তাহাই দেখা যাইবে।

সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে মঞ্চোপকরণের যে দৈন্য ছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তাহাতে বহু বিষয়ের অভিনয় নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল বিষয় কেবলমাত্র পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। মধুসূদন রামনারায়ণের 'রত্নাবলী নাটক'কে অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'ও কেবলমাত্র পাত্রপাত্রীর সংলাপের ভিতর দিয়া অভিনয়যোগ্য বহু বিষয়ের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে মধুসূদন এই ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সর্বশেষ নাটক 'মায়া-কাননে'র মধ্যে দেখা যায়, বিভিন্ন অপ্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়া অভিনয়যোগ্য বিষয়গুলিকে রঙ্গমঞ্চের ভিতরে প্রকাশ করিয়াছেন। একই দৃশ্যের মধ্যে দুই দল চরিত্রের উপস্থিতি পাশ্চাত্ত্য এবং সংস্কৃত নাটক উভয়েরই লক্ষণ। মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' এই রীতিটি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হইতে পারে যে, তিনি ইহা কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার মধ্যে তাঁহার উপর পাশ্চাত্ত্য প্রেরণাও যে সক্রিয় ছিল, তাহাও অনুভব করিতে পারা যায়। তাহা সে যুগে ফরাসী নাটকেরই একটি রীতি ছিল, মধুসূদন এই রীতিটিকে যে অনুমোদন করিতেন, তাহা নহে, কারণ, দেখা যায়, তিনি তাঁহার এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, 'as for the French idea of not allowing one set, of actors to retire and introduce another, I have no great respect....'

সংস্কৃত নাটক বলিতে মধুসূদন প্রধানত কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকখানি দিয়াই যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায়। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' যযাতি-শর্মিষ্ঠার প্রণয় দৃশ্যের বর্ণনায়, পদ্মাবতী নাটকে রাজা ও পদ্মাবতীর প্রণয়-দৃশ্যের বর্ণনায় কিংবা 'মায়াকানন নাটকে'ও অনুরূপ দৃশ্যে মধুসূদন কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকেরই গঠন-রীতি অনুসরণ করিয়াছেন.

এমন কি, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার ভাষা পর্যন্ত অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। ইহা কেবল মাত্র অন্ধভাবে অনুকরণ করিবার ফল বলিয়াই মনে হইতে পারে না, বরং তাহার পরিবর্তে মধুসূদনের এই বিষয়ে কালিদাসের প্রতি যে বিশেষ একটি শ্রদ্ধা বোধও ছিল, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। নতুবা যে 'পদ্মাবতী নাটক' রচনা সম্পর্কে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী নাটক'কে অনুকরণ করিবার তাঁহার কোন দায়িত্ব ছিল না, তাহাতেও তিনি ইহার অনুকরণ করিতে যাইতেন না।

মধুসূদন তাঁহার নাটকে ব্যাপক ভাবে স্বগতোক্তির ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু স্বগতোক্তির ব্যবহারে তিনি প্রধানতঃ ইংরেজি নাটকের আদর্শের পরিবর্তে সংস্কৃত নাটকের রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে উপকরণের অভাবের জন্যই প্রধানত তাহাতে স্বগতোক্তির ব্যবহারের আধিক্য দেখা যায়। অভিনয়-কর্মে যে সকল বিষয় নিষিদ্ধ ছিল, অথচ যে সকল ঘটনা দর্শকের অবগতির পক্ষে অনিবার্য, তাহাই ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে এককভাবে উপস্থিত চরিত্রের স্বগতোক্তির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। সেক্সপীয়রের স্বগতোক্তিগুলি তাহা নহে, বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিলেও তাহা এক একটি খণ্ড-কবিতা। সুগভীর জীবন দর্শন তাহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মধুসূদন প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র স্বগতোক্তি রচনায় সংস্কৃত নাটকের ধারাটি অনুসরণ করিবার ফলেই তাঁহার স্বগতোক্তিগুলির ভিতর দিয়া সেক্সপীয়রের কাব্যরস প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বগতোক্তিগুলি কেবল-মাত্র সংবাদ পরিবেষণ করিয়া কাহিনীর ধারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই প্রচার করিয়াছে। স্বাধীন ভাবে ইহাদের মধ্য দিয়া কোনও সাহিত্যগুণ প্রকাশ পাইতে পাইতে পারে নাই। সংস্কৃত নাটকে স্বগতোক্তি করিবার সময় যেমন 'পরিক্রমণ' ও 'চিন্তা' নামে আরও দুইটি আঙ্গিকের ব্যবহার প্রায়শই করা

হইয়া থাকে, মধুসূদনের নাটকের মধ্যেও তাহাই অনুসরণ করা হইয়াছে।

কিন্তু মধুসূদনের প্রহসনগুলিতে ইহার কতকটা ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের স্বগতোক্তির ধারা পরিত্যক্ত হইয়া প্রধানত ফরাসী প্রহসন রচয়িতা মলিয়ার রচিত স্বগতোক্তির রীতি অনেকখানি ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মধুসূদন তাঁহার প্রহসন দুইখানির রচনাতেই পাশ্চাত্ত্য প্রহসনের গঠনরীতি ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বাংলা দেশে প্রহসন বলিয়া যাহা পরিচিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কাহিনী অত্যন্ত শিথিলবদ্ধ এবং তাহাদের পরিণতি অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। সুস্পষ্ট নাটকীয় পরিণতি-যুক্ত দৃঢ়-সংবদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে প্রহসন রচনার যে ধারা প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাই দীনবন্ধু এবং অমৃতলালের মধ্য দিয়াও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির মধ্যেও ভাবের দিক দিয়া যে অভিনবত্বই প্রকাশ পা'ক না কেন, একই গঠন-রীতি প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। মধুসূদন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়েই ফরাসী প্রহসন রচনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেইজন্য উভয়েরই রচনায় অভিন্ন গঠন-রীতি অনুসরণ করিতে দেখা যায়।

ফরাসী প্রহসন রচয়িতা মলিয়ার প্রহসনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, 'The most beautiful passages in a serious moral are most frequently less powerful than those of a satire; and nothing admonishes the majority of the people better than the portrayal of their faults. To expose vices to the ridicule of all the world is a severe blow to them.' এই আদর্শ অনুসরণ করিয়াই মলিয়ারের প্রহসন-গুলি রচিত হইয়াছে। মধুসূদনের প্রহসন দুইখানিও এই

আদর্শেই আনুপূর্বিক রচিত। সুতরাং মনে হয়, প্রহসনের বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনা এবং গঠন-রীতির দিক হইতে মধুসূদন মলিয়ারকেই অনুসরণ করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকের গঠন-রীতি নাটক রচনায় তাঁহার সম্মুখে যে আদর্শই স্থাপন করুক না কেন, দেশীয় প্রহসন রচনার আদর্শ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই; বরং তাহার পরিবর্তে এই বিষয়ে তিনি ফরাসী প্রহসন রচয়িতার আদর্শকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহার রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্য দিয়া যেমন নব্য-বঙ্গের দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া ইহাকে হাস্যাস্পদ (ridicule) করিয়াছেন, তেমনই তিনি প্রাচীনপন্থী ব্যক্তির চরিত্রের দুর্বলতাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া তাহাকেও সমাজের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। উভয় প্রহসনের কাহিনীতে যে ষড়যন্ত্র করিবার কথা আছে, তাহাও ফরাসী প্রহসন রচয়িতা মলিয়ারের রচনার প্রভাবজাত বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া কোন পদস্থ চরিত্রকে অপদস্থ করা ফরাসী প্রহসনেরও একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল, মধুসূদন তাঁহার প্রহসনগুলিতে তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন।

মধুসূদন কেবলমাত্র তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যেই সংগঠনগত একটি সামগ্রিক অখণ্ডতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এমন কি, নাটকগুলির কাহিনী অপেক্ষাও ইহাদের সংগঠন অধিকতর দৃঢ়-সংবদ্ধ হইয়াছে; তাহার কারণ এই যে, প্রহসনগুলির মধ্যে তিনি একটি আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নাটকগুলির মধ্যে সংস্কৃত এবং পাশ্চাত্ত্য উভয় আদর্শের প্রভাবই তাঁহার উপর সক্রিয় ছিল। সেইজন্য গঠন-রীতির দিক দিয়া তাহাদিগকে অনুরূপ সার্থকতা দিতে পারেন নাই।

সেক্সপীয়রের ট্রাজিডি অপেক্ষা মধুসূদন তাঁহার ট্রাজিডি রচনায় গ্রীক্ নাটকের ট্রাজিডি-পরিকল্পনা দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া অনুভব করা যায়। ইহার কারণ, তিনি তাঁহার

'কৃষ্ণকুমারী নাটক' এবং 'মায়া-কানন নাটক' উভয়ের মধ্যেই মানুষের চারিত্রিক দৌর্বল্যের পরিবর্তে নিয়তিকেই উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। কেবলমাত্র নাটক নহে, মধুসূদন তাঁহার কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও নিয়তিকেই বিশ্বাস করিয়াছেন। 'যে মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণ চরিত্রের পতনের মধ্যে তাঁহার কোন চারিত্রিক দুর্বলতাই সক্রিয় ছিল না, বরং তাহার পরিবর্তে দৈবই তাঁহার নিকট দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠিয়া তাঁহার পতনকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' এবং 'মায়া-কানন' নাটকেও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকের পরিকল্পনাও তাঁহার নাট্যরচনার কোন কোন অংশে কার্যকর হইয়াছে। যেমন ট্রাজিডির মধ্যে তিনি যে হাস্যরসের সংমিশ্রণ করিয়াছেন, সে সম্পর্কে সেক্সপীয়রের পরিকল্পনা যে তাঁহার লক্ষ্য ছিল, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। (This I belive to be Shakespear's plan)। কারণ, তাঁহার মতে ইহা দ্বারা রসবৈচিত্র্য (agreeable variety) সৃষ্টি হইয়া থাকে।

কিন্তু মধুসূদন তাঁহার ট্রাজিডির মূল-কাহিনীর পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে যে উপকাহিনী সংযোগ করিয়াছেন, তাহা সেক্সপীয়রের নাটকের প্রভাবের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সেক্সপীয়র যে ভাবে, তাঁহার উপকাহিনী-গুলিকে মূল কাহিনীর একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন, মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র উপকাহিনীকে তাহার মূল কাহিনীর সঙ্গে সেভাবে যুক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। সেক্সপীয়রের প্রভাব সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত নাটকের গঠন-পদ্ধতি দ্বারাও বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া অবিমিশ্রভাবে সেক্সপীয়রকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রটি গ্রহণ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া হাস্যরস সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্যে বিদূষক চরিত্রের

কোন অবকাশ না থাকা সত্ত্বেও অন্য একটি চরিত্রের ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া বিদূষকের পরিচয়টি প্রকাশ করিয়াছেন, চরিত্রটির নাম ধনদাস। ধনদাস যে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রেরই একটি রূপ-মাত্র, তাহা তাহার সংলাপ এবং আচরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এখানেই ইহার পরিচয় শেষ হইয়া যায় নাই; দেখা যায়, ক্রমে এই চরিত্রটি সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত সেক্সপীয়রের নাটকের খল (villain) চরিত্রের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ এই চরিত্রটির মধ্য দিয়া একদিকে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক এবং অপর দিকে সেক্সপীয়রের খল (villain) চরিত্রের সংমিশ্রণ হইয়াছে। সেক্সপীয়রের মিলনান্তক নাটকের চরিত্রকে আদর্শ করিয়া মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' নাট্য-কাহিনীর স্থান এবং কালগত ঐক্য রক্ষা করিয়াছেন। এই বিষয়ে সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অত্যন্ত শিথিল।

মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম—নাটকে এবং প্রহসনে

মধুসূদনের নাটকগুলি রচিত হইবার পূর্ব হইতেই বাংলা নাটকে সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা দেখা দিয়াছিল। সমাজকে সংস্কার করিয়া দেশকে উন্নত করিতে হইবে, ইহাই ইহাদের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং সমাজ-সংস্কারের প্রেরণার মধ্যে গৌণভাবে হইলেও দেশপ্রেমের প্রেরণা প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। মধুসূদনের সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই গৌণভাবে সমাজ-সংস্কারকে লক্ষ্য করিয়া যেমন এই দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজে দেশপ্রেম বিকাশ লাভ করিতেছিল, তেমনই কাব্য-সাহিত্যের ভিতর দিয়াও সেদিন এই ভাবনা আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়ই সর্বপ্রথম স্বদেশ এবং দেশাত্মবোধের অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, সেই ধারা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত আখ্যায়িকা-কাব্যগুলির মধ্য দিয়াও অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া যে তাঁহার মধ্যে দেশাত্মবোধের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ভিতর হইতে বিশেষত হিন্দুকলেজে তাহার শিক্ষক ডি. রোজিওর নিকট হইতে এই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাদ্রাজ-প্রবাস জীবনে রচিত কোন কোন ইংরেজি কবিতার মধ্য দিয়া তাহার অস্পষ্ট আভাস থাকিলেও, বাংলা নাটক রচনার মধ্য দিয়া তাহা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে।

এই সম্পর্কে মধুসূদনের প্রথম বাংলা রচনা 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র উৎসর্গ পত্রটি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী রাজ-ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিতে গিয়া তিনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এইসম্পর্কে উদ্ধৃতিযোগ্য।

'মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এ দেশের যে কি পর্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে, আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যে বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্ধারণ করেন। ইতি— শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তস্য

এখানে 'দেশহিতৈষিতা' এবং 'ভারতভূমি'র 'প্রাচীন শ্রী' পুনরুদ্ধারের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে মধুসূদনের স্বদেশ-প্রীতির আভাস সূচিত হইতেছে।

মধুসূদন প্রথম হইতেই এদেশে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ (National Theatre) প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। যাহা পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যেও সম্ভব হইয়া উঠে নাই, তাঁহার মনে সর্বপ্রথম তাহার পরিকল্পনার উদয় হইয়াছিল। মধুসূদন তাঁহার এক পত্রে মনীষী রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছেন, as yet we have not established a National Theatre, I mean, we have not as yet got a body of sound, Classical Dramas to regulate the National taste'.........

'ন্যাশানেল থিয়েটারে'র মধ্য দিয়া জাতীয় রস-সংস্কার অনুযায়ী নাটক রচিত হইয়া তাহাদের অভিনয় হইবে, মধুসূদনের ইহাই পরিকল্পনা ছিল। ইহার মধ্যেই মধুসূদনের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুকরণ করিবার পরিবর্তে জাতীয় রস-বোধকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে সঙ্কল্প ঘোষিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার সুগভীর দেশপ্রেমের পরিচায়ক।

ইংরেজি শিক্ষা এবং সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন সেদিন যে ভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, মধুসূদন সুগভীর উদ্বেগের সঙ্গে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি কেবলমাত্র তাহার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলেন নাই। তিনিও নব্য বাংলা বা young Bengal-এর একজন সদস্য ছিলেন বলিয়াই ভিতর হইতেই ইহার ত্রুটিগুলি গভীরভাবে লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ-দেহে তাহার যে বিষ-ক্রিয়া অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও

মধুসূদনকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনখানিই তাহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র আচার-আচরণ জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য-বিরোধী বলিয়াই ইহার নগ্নরূপটি প্রকাশ করিয়া দিয়া ইহার যথার্থ স্বরূপটি তিনি ইহাতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার প্রহসনখানি রচনার মূল উদ্দেশ্যটি সাধিত হইয়াছিল। অর্থাৎ 'ইয়ং বেঙ্গল' ইহার মধ্যে নিজের প্রকৃত রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, দেখা যায়, 'ইয়ং বেঙ্গল' নাটকটির অভিনয় বন্ধ করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিল এবং মনে হয়, তাহার ফলেই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ইহা অভিনীত হয় নাই। বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় একটি বিবরণ আছে, তাহাতে এই প্রহসনটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত না হইবার রহস্যটি এইভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে,—'A few of the 'young Bengal' class getting a scent of the farce "একেই কি বলে সভ্যতা?" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they know, had influence with the Rajas, deputed him to dissuade them from producing the farce on the Board of their Theatre. This gentleman (also a young Bengal) fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajas would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce.'

মধুসূদন 'একেই কি সভ্যতা'র মধ্যে আত্মসমালোচনা করিয়াছিলেন, সেইজন্যই ইহার রচনা এত শক্তিশালী হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জীবনাচরণের অন্ধ অনুকরণ করিবার মধ্য দিয়া জাতীয়-জীবনের যে সর্বনাশ সেদিন দেখা দিয়াছিল, তাহা তিনি কেবলমাত্র

দূর হইতে নির্লিপ্ত ভাবে যদি দেখিতেন, তবে তাহার এত বাস্তবরূপ তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেন না। এই জীবনে নিজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া ইহার ক্রটি এবং অন্তঃসারশূন্যতা সেদিন নিজেও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন; সেইজন্য জাতীয় কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইহার ভয়াবহ স্বরূপটি সেদিন তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার আত্মসমালোচনার ভিতর দিয়া আত্মকৃত অপরাধের যেন তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটক যেমন নীলকরের অত্যাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে, 'একেই কি বলে সভ্যতা' নব্যবঙ্গের দর্পণ স্বরূপ হইয়া 'ইয়ং বেঙ্গলে'র স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া এই বিষয়ে সতর্ক হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। স্বদেশের কল্যাণ বাসনা যদি মধুসূদনের লক্ষ্য না থাকিত, তবে এইভাবে তিনি দেশের শিক্ষিত সমাজের দোষ ক্রটিগুলি দেখাইয়া দিতেন না, এমন নির্মম ভাবে আত্মসমালোচনাও করিবার কোন প্রেরণা পাইতেন না।

নব্য বাংলার ব্যঙ্গচিত্র রচনা করিয়া যেমন তিনি সেদিনকার সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার নাগরিক জীবন সম্পর্কে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, তেমনই প্রাচীনপন্থী সমাজের মধ্যেও যে ভণ্ডামি এবং ব্যভিচার ধর্মের ছদ্মবেশে সেদিন আত্মগোপন করিয়াছিল, তাঁহার আর একটি প্রহসনে তাহারও তিনি মুখোস খুলিয়া দিয়াছিলেন, সেই প্রহসনটির নামই 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। দেশ এবং সমাজের হিতসাধন যদি উদ্দেশ্য না থাকিত, তবে সমাজদেহের ক্ষতস্থানগুলিকে তিনি এমনভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে যাইতেন না। প্রথম প্রহসনটির মধ্যে ইংরেজিয়ানা এবং দ্বিতীয় প্রহসনটির মধ্যে হিন্দুয়ানার অর্থহীন আচারকে অনুসরণ করিবার মধ্যে যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না, মনুষ্যত্ব যে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহাই তিনি তাঁহার এই দুইখানি প্রহসনের মধ্যে দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁহার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের উপসংহারে

ধর্মভণ্ডের মুখোস খুলিয়া দিয়া যে নীতিবাক্য বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,

বাইরে ছিল সাধুর আকার
মনটা ছিল ধর্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য
ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া॥

অর্থাৎ ধর্মের অর্থহীন আচার পালনের মধ্যেই যে সমাজের এবং দেশের কল্যাণ তাহা নহে, নাগরিক জীবনেই হউক কিংবা পল্লী জীবনেই হউক, জীবনের শাশ্বত নীতির পথেই সমাজ এবং দেশের কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। সেদিনকার সমাজের দুইটি দিকেরই বিকৃতরূপ প্রকাশ করিয়া তিনি ইহা নির্দেশ করিয়াছেন। স্বদেশের অবস্থা সম্পর্কে যে সচেতনতা মধুসূদন ইহাদের মধ্যে সেদিন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই তাঁহার স্বদেশের কল্যাণবোধ সেদিন স্পন্দিত হইয়াছিল।

সে যুগের দেশপ্রেমিকদিগের একটি ব্যঙ্গ চিত্র তিনি তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, নববাবু এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিতেছেন,

জেণ্টলম্যান, তোমাদের মেয়েদের এডুকেট কর, তাদের স্বাধীনতা দাও, জাতিভেদ তফাৎ কর, আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তাহলে এবং কেবল তাহলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে, নচেৎ নয়।

ইংরেজের অনুকরণ করিতে গিয়া সেদিন যাহারা লোক-দেখানো স্বদেশপ্রেমে মাতিয়াছিলেন, মধুসূদন এখানে তাহাদেরই নিন্দা করিতে চাহিয়াছেন। স্বদেশপ্রেম যে পরের অনুকরণে কখনও সার্থক হইতে পারে না, তাহা যে জাতির একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক প্রেরণা, কৃত্রিম স্বদেশ প্রেমকে এইভাবে ব্যঙ্গ করিয়াই তিনি তাহা এখানে নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। অবশ্য এখানে সমাজের সংস্কার করিয়া দেশের উন্নত করিবার স্পৃহাকেই স্বদেশপ্রেমলব্ধ হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমের বাস্তবরূপ বলিতে ইহাকেই বুঝাইত। ঈশ্বরগুপ্ত কিংবা রঙ্গলালের নিকট দেশপ্রেম কিংবা স্বাধীনতা একটি ভাব-স্বপ্ন মাত্র ছিল, মধুসূদনের নিকট তাহা সমাজ-সেবার প্রত্যক্ষ আচরণের মধ্যে তাহার বাস্তব পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টার মধ্যে যে দেশপ্রেমের প্রেরণা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই পরবর্তী কালে রাজনৈতিক চিন্তার সূত্রে গ্রথিত হইয়া দেশের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে আত্মহুতি দান করিবার প্রেরণা দিয়াছিল। মধুসূদনের যুগে দেশের স্বাধীনতার কল্পনা স্বপ্নাতীত ছিল, সমাজ-সংস্কারই অলক্ষ্যে তাহার প্রথম সোপান রচনা করিয়াছিল, কিন্তু কর্মশক্তির পরিবর্তে মদ্যাসক্তি এবং সভা করিয়া বক্তৃতা দিবার মধ্যে যে দেশপ্রেম সেদিন তাহার অন্তঃসারশূন্য পরিচয়টি প্রকাশ করিয়াছিল, মধুসূদন তাঁহার প্রহসন দুইখানির মধ্যে তাহাকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন। মদ্যপান করিয়া বাংলা-ইংরেজি মিশ্রভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার মধ্যেই যে দেশপ্রেম সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, মধুসূদন এই কঠিন সত্যটি নব্যবঙ্গকে তাঁহার প্রহসন দুইখানির মধ্য দিয়া শুনাইয়াছেন।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্যে মধুসূদনের স্বদেশপ্রেমের আরও সুস্পষ্ট বিকাশ অনুভব করা যায়। অবশ্য 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র বিষয়বস্তু মধুসূদনের স্বনির্বাচিত নহে, তিনি স্বদেশপ্রেম প্রচার করিবার জন্যই যে নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও নহে। অন্যের নির্দেশে যখন তিনি টড্-রচিত রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন, তখন প্রধানতঃ ট্রাজিডি রচনা করিবার উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীটিকে নির্বাচন করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যে রাজপুত জাতির ইতিহাসের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা রঙ্গলালের রচনার মধ্যেই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুসূদন রঙ্গলালের ধারা অনুসরণ করিয়াই 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' স্বদেশ-প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে। রাজপুত

জীবনের ইতিহাসের মধ্যে যে বীরত্ব, স্বদেশ এবং স্বধর্মরক্ষায় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তের তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কল্পনা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর জাতীয় পুনর্জাগরণের যুগে টডের রাজস্থানের কাহিনী যে ভাবে বাঙ্গালীর রসচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, মধুসূদনও সেই ভাবেই তাহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণকুমারীর আত্মদান 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র প্রধান বিষয়। তাঁহার আত্মদানের মধ্যে কিসের প্রেরণা ছিল? ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধি কিংবা মানসিক বিকার-বশত যে তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে—তাঁহার আত্মত্যাগের মধ্যে দেশপ্রেমের যে সুমহতী প্রেরণা ছিল, তাহা মধুসূদন গোপন করেন নাই। স্বদেশ এবং স্বজাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই কৃষ্ণকুমারী আত্মবলিদান করিয়াছিলেন। রাজপুত রমণীর জীবনে সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য আত্মবিসর্জনের ঘটনা বিরল ছিল না, মধুসূদন স্বদেশ এবং স্বজাতির রক্ষার জন্য কৃষ্ণকুমারীকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিলেন।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই মন্ত্রী রাজাকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিতেছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলি আত্মকলহ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সহযোগিতার ভিতর দিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যত্নবান হওয়া যে আবশ্যক, সে বিষয়ে মন্ত্রী রাজাকে বলিতেছেন :

মন্ত্রী—ধর্মাবতার, এ কি ঘরাও বিবাদের সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা—আঃ, দেশবৈরিদল! তুমি যে দেশ বৈরিদলের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বাতুল হলে।

—১।১

মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা জগৎসিংহ কোনও গুরুত্ব দেন নাই, কিন্তু রাজপুতানার সকল রাজাই জগৎসিংহের মত ছিলেন না, উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহ নিজ হইতেই এই বিষয়ে চিন্তিত হইয়াছিলেন।

তিনি মোঘল-শক্তির অধীন ভারতবাসীর দুর্দশার কথা এই ভাবে চিন্তা করিয়াছেন :

এ ভারতভূমির আর কি সে শ্রী আছে ! এ' দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলেও, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই ত এ বিশ্বাস হয় না···হায় ! হায় ! যেমন কোন লবণাম্বু তরঙ্গ কোন সুমিষ্ট বারি নদীতে প্রবেশ করেও তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে ।—২।১

রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহ রাজাকে আশ্বাস দিতেছেন,

'মহারাজের কিংবা স্বদেশ-হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি ।'

স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জন করিবার প্রত্যক্ষ সঙ্কল্প ইহাতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। স্বদেশের কল্যাণ-কামনার মধ্যেই কৃষ্ণকুমারীর আত্মবিসর্জনের প্রেরণা যে সক্রিয় হইয়াছিল, তাহা পূর্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি। কৃষ্ণকুমারী নির্ভীকভাবে মৃত্যুকে বরণ করিবার যে শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাও তাঁহার দেশপ্রেমের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। একটি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে না থাকিলে এমন নির্ভয়ে কেহ মৃত্যুকে বরণ করিতে পারে না। অথচ মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী চরিত্র যে আদ্যোপান্ত আদর্শ চরিত্র তাহাও নহে, ইহার মধ্যে রক্তমাংসের দেহের স্পন্দনও অনুভব করা যায়, তথাপি মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও সে যে অবিচলভাবে তাহার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহা কেবলমাত্র তাহার মধ্যে দেশপ্রেমের প্রেরণার জন্যই সম্ভব হইয়াছে, নতুবা তাহার মধ্যে মানবোচিত মৃত্যুভয়-কাতরতার অস্তিত্ব অনুভব করা যাইত।

তবে এ' কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দেশপ্রেমই মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মুখ্য অবলম্বন নহে। ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংঘর্ষের কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইলেও বৃহত্তর আদর্শ প্রতিষ্ঠার মধ্যে ইহার কাহিনী সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

শ্রেণীবিভাগ

মধুসূদনের নাটক এবং প্রহসনের সংখ্যা অল্প, সুতরাং ইহাদিগকে লইয়া কোন শ্রেণীবিভাগ করা সমীচীন হয় না। তথাপি দেখা যায়, প্রত্যেকটি নাটক এক এবং অভিন্ন প্রকৃতির নহে। তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' যদিও মহাভারতের বিষয়বস্তু লইয়া রচিত, তথাপি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাভারতের কাহিনী লইয়া যে শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক'কে সেই অনুযায়ী রচনা করেন নাই। অর্থাৎ মধুসূদন পুরাণ হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াও পৌরাণিক নাটক রচনা করেন নাই ; গিরিশচন্দ্র ঘোষ পুরাণ হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া যথার্থই পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছেন। ভক্তির ভাব কিংবা কোন নীতি-প্রচারই পৌরাণিক নাটকের আদর্শ। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' কোন ভক্তির ভাব কিংবা কোন নীতি প্রচার করা হয় নাই, অথচ মহাভারতের কাহিনীকে মধুসূদন সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়াই যে নাট্যরূপ দিয়াছেন, তাহাও নহে। তিনি কাহিনীর কোন কোন অংশে কিংবা ইহার কোন কোন চরিত্রে নিজস্ব মনোভাব সঞ্চারিত করিয়া দিয়া ইহাদের একটি রোমান্টিক রূপ দিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' এবং 'পদ্মাবতী নাটক' দুইখানিকেই রোমান্টিক নাটকের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ, 'পদ্মাবতী নাটকে'র কাহিনীও ভারতীয় পুরাণানুগামী নহে, গ্রীক্ পুরাণের একটি কাহিনীকে আনিয়া তিনি ভারতীয় পুরাণের পরিবেশে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় পুরাণে অনুরূপ কাহিনী না থাকিবার জন্য ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশের বস্তুধর্ম বিনষ্ট হইয়া তাহার মধ্যেও রোমান্টিক গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং 'পদ্মাবতী নাটক'কেও নিঃসন্দেহে রোমান্টিক নাটক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে

পারে। পুরাণের কাহিনী ইহার অবলম্বন হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে যথার্থ পৌরাণিক নাটক বলিতে যাহা বুঝায়, ইহার মধ্যে তাহার ভাব প্রকাশ পায় নাই।

সেইজন্যই মধুসূদনের পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক রচনার যে ধারার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক'ই হোক, কিংবা 'পদ্মাবতী নাটক'ই হোক, কোন যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। মধুসূদনের পরবর্তী কালে পৌরাণিক বিষয়বস্তু লইয়া প্রধানত পৌরাণিক নাটকই রচিত হইয়াছে, মধুসূদনের নাটকের মত কোন রোমাণ্টিক নাটক রচিত হয় নাই।

মধুসূদন রচিত 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক নাটকরূপে গ্রহণ করা যায়। যদিও এ কথা সত্য, যে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র ভিত্তিরূপে যাহা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা আজ অনৈতিহাসিক বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে, তথাপি মধুসূদন ইতিহাস রূপেই তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার বিষয়বস্তু সেই ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। তবে এ কথা সত্য, ঐতিহাসিক নাট্যকারের পরিপূর্ণ দায়িত্ব 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনায় মধুসূদন পালন করেন নাই। ঐতিহাসিক ঘটনারাশির পরিবেশের মধ্যে নূতন নূতন চরিত্র এবং ঘটনার উদ্ভাবন করিয়া কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধির যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনায় তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। তথাপি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে ঐতিহাসিক নাটক বলিয়াই উল্লেখ করিতে পারা যায়।

মধুসূদনের প্রহসন দুইখানিকে ইংরেজিতে Farce বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও ইংরেজি Farce-এর সঙ্গে বাংলা প্রহসন শব্দটির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যও আছে। তবুও 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' উভয়কেই প্রহসন শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়াই নির্দেশ করিতে পারা যায়।

মধুসূদনের সর্বশেষ নাটক 'মায়া-কানন' বিষয়ের দিক হইতে আনুপূর্বিক তাঁহার উপরোক্ত কোন শ্রেণীর নাটক কিংবা প্রহসনের অন্তর্গত না হইলেও ইহাকে রোমান্টিক শ্রেণীর নাটক বলিয়াই উল্লেখ করিতে হয়। তথাপি 'শর্মিষ্ঠা নাটক' কিংবা 'পদ্মাবতী নাটক' যে শ্রেণীর রোমান্টিক নাটক, 'মায়া-কানন' সেই শ্রেণীর নহে। প্রথমোক্ত নাটক দুইখানি পুরাণাশ্রিত রোমান্টিক নাটক, কিন্তু 'মায়া-কানন' ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটক। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' যে শ্রেণীর রোমান্টিক নাটক, ইহাও সেই শ্রেণীরই অন্তর্গত। উপরোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে মধুসূদনের নাটকগুলিকে এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: যেমন রোমান্টিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক এবং সামাজিক প্রহসন। সামাজিক নাটক, কিংবা পৌরাণিক নাটক তিনি রচনা করেন নাই, মধুসূদনের সময় পর্যন্ত সামাজিক এবং পৌরাণিক নাটক রচনার ধারা প্রবর্তিত হয় নাই, কিংবা মধুসূদন নিজেও তাহা প্রবর্তন করিতে পারেন নাই।

প্রথম অধ্যায়

ক। রোমান্টিক নাটক

মধুসূদনের নাট্যরচনাকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছি, তাহাদের প্রথম ভাগের নাম রোমান্টিক নাটক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করা সত্ত্বেও মধুসূদনের নাটককে কেন যে পৌরাণিক নাটক বলা যাইতে পারে না, তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া পূর্বে বুঝাইয়াছি। ইতিপূর্বে পৌরাণিক বিষয়বস্তু লইয়া যে কয়খানি বাংলা মৌলিক নাটক রচিত হইয়াছিল, যেমন, তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' কিংবা হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব-বিয়োগ' ইহাদিগকেও পৌরাণিক নাটক বলিতে পারা যায় না, কিংবা যে অর্থে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক,' এবং 'পদ্মাবতী নাটক' কিংবা 'মায়া-কানন' নাটককে রোমান্টিক নাটক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে সেই অর্থে রোমান্টিক নাটক বলিতে পারা যাইবে না। তবে 'ভদ্রার্জুন' নাটকে রোমান্টিক নাটকের কিছু কিছু গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, 'কৌরব-বিয়োগ' নাটকে তাহাও পায় নাই; বাংলা নাট্য-সাহিত্যে মধুসূদনই রোমান্টিক নাট্যধারার প্রবর্তক, তাঁহারই ধারা অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী নাট্যকারগণ এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

রেণাসাঁর যুগে জাতির পুরাণ এবং মহাকাব্যকে নূতন জীবন এবং রস-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের কাহিনী এবং চরিত্রগুলিতে যুগোচিত প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়া দেওয়াই লক্ষ্য ছিল। মধুসূদন এই কথা বুঝিয়াছিলেন, জাতির পুরাণ এবং মহাকাব্যগুলির মধ্যে যে শক্তিই থাকুক না কেন, যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী ইহাদিগকে নূতন প্রাণদান না করিলে নূতন যুগের সমাজ তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। যুগে যুগেই জাতির জীবনে যখন নূতন প্রেরণা আসিয়াছে, তখনই পুরাণ এবং জাতির মহাকাব্যগুলিকে সেই

আদর্শেই পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। ইহাতে জাতির পুরাণের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, তাহা নহে—বরং তাহার পরিবর্তে পুরাণকে নূতন যুগের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইবার ফলে যুগের ভাব-প্রবাহে ইহা যোগ রক্ষা করিতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে ভাবে প্রাচীন ভারতের পুরাণ এবং মহাকাব্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া জাতির নূতন যুগের নূতন মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেই প্রাচীন ভারতের রস-সংস্কার অব্যাহত ধারায় নূতন যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। তাহা না হইলে প্রাচীন পর্যুষিত পুরাণ-কাহিনী নূতন যুগে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারিত না। এই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক নাটকের জন্ম হইয়াছিল।

মধুসূদন তাঁহার প্রথম নাট্যরচনা 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের অনুকরণ করিতে গিয়াও নিজস্ব রোমান্টিক চেতনা বিসর্জন দেন নাই। সেইজন্য মহাভারত হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়াও আনুপূর্বিক তাহারই ভিত্তিতে তিনি তাঁহার নাটক রচনা করিতে যান নাই। কাহিনীর যে অংশ উনবিংশ শতাব্দীর যুগ-চেতনার বিরোধী, রস এবং রুচিবোধে স্বীকৃত নহে, তাহা তিনি সতর্কতার সঙ্গে পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'পদ্মাবতী নাটকে'র কাহিনী ভারতীয় পৌরাণিক জীবনের পরিবেশে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গঠন করিয়াছেন; এমন কি, এই বিষয়ে তিনি এত দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাহা জাতির রস-সংস্কারের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল। 'মায়া-কানন' নাটকের কাহিনীও তাঁহার রোমান্টিক কল্পনারই প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং মধুসূদনের এই কয়খানি নাটককে তাহার রোমান্টিক নাটক রচনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়।

এক । 'শর্মিষ্ঠা নাটক' [১৮৫৯]

পূর্বেই বলিয়াছি, মহাভারত হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করিয়াছেন। তবে কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে যে তিনি কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে—বেদব্যাস রচিত মূল সংস্কৃত মহাভারত হইতেই তিনি কাহিনীটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমেই কালীপ্রসন্ন সিংহের মূল মহাভারতের অনুবাদ হইতে শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর কাহিনীটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে, মধুসূদন কি ভাবে কাহিনীটি তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পরে আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে। নানা কারণে কাহিনীটি আনুপূর্বিক উদ্ধৃতির যোগ্য বলিয়া ইহা বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করা হইতেছে।

১

মহাভারতের শর্মিষ্ঠা কাহিনী

'বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কচ কৃতবিদ্যা হইয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলে দেবগণ অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট সঞ্জীবনীবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, 'হে পুরন্দর! তোমার বিক্রম-প্রকাশের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে শত্রুকুল সংহারের নিমিত্ত প্রস্তুত হও।' ইন্দ্র দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত ও উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। কিছুদূর গমন করিয়া চৈত্ররথোপম পরম-রমণীয় এক কাননে কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্ব স্ব পরিধেয়বস্ত্র সরোবরতীরে রাখিয়া জল বিহার করিতেছিল। দেবরাজ এই অবসরে বায়ুরূপ ধারণ করিয়া

কন্যাদিগের বস্ত্র সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া দিলেন। তৎপরে কন্যাগণ সকলে জল হইতে উত্থিত হইয়া, যিনি যে বস্ত্র সম্মুখে পাইলেন, তাহাই পরিধান করিলেন। তন্মধ্যে বৃষপর্ব-দুহিতা শর্মিষ্ঠা না জানিতে পারিয়া দেবযানীর বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহাদের উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। দেবযানী কহিলেন, 'রে অসুর-কন্যা! তুই আমার শিষ্যা হইয়া কোন্ সাহসে আমার বস্ত্র পরিধান করিতেছিস্? এই অত্যাচারে তোর শ্রেয়োলাভ হইবে না।' শর্মিষ্ঠা কহিলেন, 'দেখ দেবযানি! আমার পিতা যখন শয়ান বা উপবিষ্ট থাকেন, তোমার পিতা নিম্নাসনে উপবেশন করিয়া অতি বিনীতভাবে স্তুতি-পাঠকের ন্যায় তাঁহাকে নিয়ত স্তব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্তব, প্রতিগ্রহ ও যাচ্ঞা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তুমি তাহারই কন্যা। আর সকলে যাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে, যিনি প্রার্থনাধিক অর্থদান করিয়া যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, আমি তাঁহার কন্যা। তুমি যত পার শোক কর, হিংসা কর, দ্বেষ কর বা শাপ দাও, আমি তোমাকে কখনই সমকক্ষ বলিয়া গণনা করিব না।'

শর্মিষ্ঠার এইরূপ অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবযানী ক্রোধে অধীর হইয়া বলপূর্বক আপনার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শর্মিষ্ঠা কোপাক্রান্ত ও কম্পিত কলেবর হইয়া দেবযানীকে সন্নিহিত এক কূপে নিক্ষেপ করিলেন। দেবযানী কূপে পতিত হইয়া নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, এই স্থির করিয়া শর্মিষ্ঠা স্বভবনে গমন করিলেন। মৃগয়াবিহারী নাহুষাত্মজ রাজা যযাতি অশ্বারোহণে সেই অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি মৃগের অনুসরণক্রমে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের সন্নিহিত হইলেন। রাজা জল প্রার্থনায় কূপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র অগ্নিশিখার ন্যায় এক কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া অতীব বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সেই রমণীকে অতি করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে

দেখিয়া মধুর সান্ত্বনা-বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, 'ভদ্রে! তুমি কে? কাহার কন্যা? কেনই বা এত শোকাকুলা হইয়াছ? আর কিরূপেই বা এই অন্ধকূপে পতিত হইয়াছ?' দেবযানী কহিলেন, 'দানবেরা দেবগণ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে যিনি সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করেন, আমি সেই শুক্রাচার্যের কন্যা। আমি যে এই বন-মধ্যে একাকিনী অন্ধকূপে পতিত আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। হে মহারাজ! আপনি মহাবংশপ্রসূত অসামান্য যশস্বী ও শান্ত প্রকৃতি; অতএব আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন।' রাজা যযাতি তাঁহার পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণী বোধে দক্ষিণ হস্ত ধারণ-পূর্বক কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন এবং সাদর সম্ভাষণ-পূর্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

নহুষ-তনয় রাজা যযাতি নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলে ঘূর্ণিকা-নাম্নী এক দাসী সহসা দেবযানী সমীপে উপস্থিত হইল। দেবযানী বাষ্পাকুললোচনে তাহাকে কহিলেন, 'ঘূর্ণিকে! তুমি সত্বর আমার পিতার নিকট যাইয়া বল, শর্মিষ্ঠা আমার এই দুর্দশা করিয়াছে, আর আমি বৃষপর্ব রাজার নগরে প্রবেশ করিব না।' তাঁহার আদেশ প্রাপ্তমাত্রে ঘূর্ণিকা দ্রুতপদসঞ্চারে অসুর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া সম্ভ্রমাবিষ্টচিত্তে শুক্রসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেবযানী বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। মহর্ষি শুক্র শ্রুতিমাত্রেই উত্থিত হইয়া বন-মধ্যে কন্যার অন্বেষণে গমন করিলেন এবং অবিলম্বেই তথায় উপনীত হইয়া দেবযানীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গনপূর্বক গদ্‌গদ্‌বচনে কহিলেন, 'বৎসে দেবযানি, আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সকলে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; বোধ হয় তুমি কোন পাপকর্ম করিয়া থাকিবে, তাহারই ফলভোগ করিতে হইয়াছে।' দেবযানী কহিলেন, 'তাত! পাপের ভোগ হউক বা না হউক, এক্ষণে বৃষপর্বতনয়া শর্মিষ্ঠা আমাকে যেরূপ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন।' এই বলিয়া পিতার নিকট সমস্ত

পরিচয় দিলেন; পরিশেষে কহিলেন, 'শর্মিষ্ঠা যে প্রকার করিয়াছে আমি যদি যথার্থই সেইরূপ হই, তবে তাহার নিকট আপনার দোষ স্বীকার করা ও ক্ষমা-প্রার্থনা করা কর্তব্য, নতুবা তাহার অহঙ্কারের প্রতীকার করিতে হইবে।' শুক্র কহিলেন, 'বৎসে! তুমি ত স্তাবক বা প্রতিগ্রহোপজীবীর কন্যা নহ। তোমার পিতা কাহারও চাটুকার নহেন, বরং অন্যে তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। বৃষপর্বা, ইন্দ্র এবং নহুষ-তনয় রাজা যযাতি ইঁহারা সকলেই জানেন যে, অচিন্ত্য নির্দ্বন্দ্ব পরমব্রহ্মই আমার বল। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া আপনি কহিয়াছেন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যে কিছু বস্তু আছে, আমি তাহার ঈশ্বর। আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, প্রজাদিগের প্রিয়-কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত আমি বারিবর্ষণ ও ওষধি সকল পুষ্ট করিয়া থাকি।' মহানুভব শুক্র বিষাদমগ্না ক্রোধাকুলা দেবযানীকে এইরূপ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

শুক্র কহিলেন, 'হে দেবযানি, যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই সচরাচর বিশ্ব তাহারই আয়ত্ত। সাধুলোকেরা অশ্বরশ্মিগ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ সারথি বলিয়া থাকেন। যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধানলে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই জয় করা হয়। যেমন সর্প নির্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন। যিনি ক্রোধবেগ সংবরণপূর্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারাই সর্বথাসিদ্ধি হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা-সেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহার উপর কখনই ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বালক-বালিকারা বিবেকাভাব প্রযুক্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ করেন

না।' 'দেবযানী কহিলেন 'তাত। আমি অল্পবয়স্কা বালিকা বটে, কিন্তু ধর্মের মর্ম বিবেচনা করিতে নিতান্ত অসমর্থ নহি এবং ক্রোধ ও ক্ষমা এই উভয়ের বলাবল পরিজ্ঞানেও অক্ষম নহি। কিন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়া অশিষ্যের ন্যায় আচরণ করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা প্রদর্শন করিবেক না। অতএব এই ভ্রষ্টাচার দেশে বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই। যে সকল লোকেরা আচার-ব্যবহার ও কৌলীন্যাদি লইয়া সর্বদা পরনিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করিবেন না, আর যে স্থানে বাস করিলে আচার-ব্যবহার ও কৌলীন্যাদির গৌরব থাকে, সেই স্থানে বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প। হে তাত! বৃষ-পর্বতনয়া শর্মিষ্ঠার সেই সকল দুর্বাক্য আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অধিক কি বলিব, যে হতভাগ্য ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ প্রত্যাশায় ধনিকগণের উপাসনা করে, বোধহয়, তদপেক্ষা তাহার মৃত্যু হওয়া উত্তম।'

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শুক্র ক্রোধভরে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা বৃষপর্বার নিকট উপস্থিত হইয়া অসঙ্কুচিত-চিত্তে কহিলেন, 'হে দানবরাজ, অধর্ম আচরণ করিলে, সদ্যই তাহার ফল দর্শে না বটে, কিন্তু পরিণামে সেই পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। যদিও অনুষ্ঠানকর্তার তাহার ফলভোগ না হয়, তত্রাপি তাহার পুত্র বা পৌত্রদিগকে ফলভোগ করিতে হয়। 'বৃহস্পতি তনয় কচ বিদ্যালাভ করিবার নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছিল। সে ধর্মপরায়ণ, সুশীল ও শুশ্রূষাপর। তুমি অন্য দ্বারা নিরপরাধে বারংবার তাহার প্রাণহিংসা করিয়াছিলে। আজি আবার তোমার কন্যা শর্মিষ্ঠা আমার দেবযানীর প্রাণ নষ্ট করিবার আশায় তাহাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই সকল অত্যাচারে আমি অদ্যই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি আর তোমার অধিকারে বাস করিব না। তোমরা আমার কথা প্রলাপ বলিয়া বিবেচনা কর, নতুবা আপন দোষ-সংশোধনে

অপেক্ষা করিতে না।' বৃষপর্বা কহিলেন, 'হে ভার্গব। আমি আপনাকে অধার্মিক বা মিথ্যাবাদী বলিয়া বোধ করি না, প্রত্যুত পরমধার্মিক ও সত্যপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। তোমার প্রতি আমি কখনই ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করি না, অতএব ক্রোধ সংবরণ কর এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যদি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর, তাহা হইলে আমরা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিব, সংশয় নাই।' শুক্র কহিলেন, 'তোমরা সাগরেই প্রবেশ কর বা দেশান্তরেই যাও, তোমার কন্যা আমার দেবযানীকে যেরূপ অপমান করিয়াছে, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। আমি দেবযানীকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি, যেমন বৃহস্পতি ইন্দ্রের যোগক্ষেমকর, আমিও সেইরূপ তোমার যোগক্ষেম সম্পাদন করিয়া থাকি। অতএব যদি আমাকে রাজ্যে রাখিতে বাসনা থাকে, তবে দেবযানীকে প্রসন্ন কর। দেবযানী আমার জীবন-স্বরূপ।'

বৃষপর্বা কহিলেন, 'ভগবন্! অসুরেরা যে কিছু ধনসম্পত্তি বা গো, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অধিকার করে, আপনি তৎসমুদয়ের ও আমার অধীশ্বর, অতএব আপনি প্রসন্ন হউন।' শুক্র কহিলেন, 'যদি আমি দানবদিগের সমুদয় সম্পত্তির ঈশ্বর হই, তাহা হইলে দেবযানীকে সান্ত্বনা করিতে পারি।' দানবরাজা বৃষপর্বা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

পরে ভৃগুনন্দন শুক্র দেবযানীর নিকট গমন করিয়া এই কথা আদ্যোপান্ত অবগত করাইলেন। তখন দেবযানী কহিলেন, 'হে পিতঃ! তুমি যে অসুরদিগের সকল সম্পত্তির ঈশ্বর, তাহা বৃষপর্বা স্বয়ং আমার নিকট অঙ্গীকার করুক, নতুবা আমার বিশ্বাস হয় না।' তাহা শুনিয়া দানবরাজ বৃষপর্বা কহিলেন, 'হে চারুহাসিনী দেবযানী, তোমার যাহা অভিলাষ হয় বল, অতিশয় দুর্লভ বস্তু হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব।' তখন দেবযানী কহিলেন, 'শর্মিষ্ঠা সহস্র অসুর-কন্যার সহিত আমার দাসীভাব অবলম্বন করুক, এই আমার অভিলাষ এবং আমি বিবাহিতা হইয়া যৎকালে ভর্তৃগৃহে

গমন করিব, তখনও তাহাকে আমার অনুসরণ করিতে হইবে।' তাহা শুনিয়া বৃষপর্বা সমীপবর্তিনী এক পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, 'তুমি যাও, শীঘ্র শর্মিষ্ঠাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। দেবযানীর যেরূপ অভিলাষ, শর্মিষ্ঠা আসিয়া তাহা অবিলম্বে সম্পাদন করুক!' পরিচারিকা রাজার আদেশক্রমে শর্মিষ্ঠার নিকট উপনীত হইয়া নিবেদন করিল, 'রাজনন্দিনী! মহারাজ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, চল এবং জ্ঞাতি-কুলের শুভ সম্পাদন কর। শুক্রাচার্য দেবযানী কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া অসুরকুল পরিত্যাগের উপক্রম করিয়াছেন, এক্ষণে দেবযানীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তোমাকে তাহার নির্দেশানুসারে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে।' তাহা শুনিয়া শর্মিষ্ঠা কহিলেন, 'তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, আমি বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব, আর দেবযানীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি শুক্রও যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতেও আমার অসম্মতি নাই। আমার দোষে শুক্র ও দেবযানী নগর পরিত্যাগ করিবেন, তাহা কখনই হইবে না।' এই বলিয়া শর্মিষ্ঠা শিবিকায় আরোহণপূর্বক সহস্র-দাসী পরিবৃতা হইয়া সত্বর অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন এবং দেবযানী সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, 'হে গুরুকন্যে! আমি সহস্র অসুর-কন্যার সহিত তোমার দাস্যকর্ম করিব এবং তুমি পরিণীতা হইয়া যখন পতিগৃহে গমন করিবে, তৎকালেও আমি দাসীভাবে তোমার সমভিব্যাহারে যাইব।' দেবযানী কহিলেন, 'দেখিও, তুমি রাজনন্দিনী হইয়া কিরূপে চাটুকার ও ভিক্ষুকের ন্যায় দাসীভাব অবলম্বন করিবে?' শর্মিষ্ঠা কহিলেন, 'জ্ঞাতিকুলের বিপদ ঘটিলে যে কোন উপায় দ্বারা হউক, তাহার প্রতীকার চেষ্টা করা কর্তব্য, এজন্য আমি তোমার দাসীবৃত্তি স্বীকার করিলাম।' এইরূপে শর্মিষ্ঠা দাসীভাব অঙ্গীকার করিলে দেবযানী নিজ পিতা শুক্রকে কহিলেন, 'হে তাত! আমি ক্রোধ সংবরণ করিয়াছি, চল, এক্ষণে নগরে প্রবেশ করি। জানিলাম, তোমার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল অমোঘ!' মহাযশা শুক্র, কন্যা কর্তৃক

এইরূপ অভিহিত এবং দানবরাজ কর্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্বার দেবযানীর সহিত পুরে প্রবেশ করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কিয়ৎকাল অতীত হইলে বরবর্ণিনী দেবযানী ক্রীড়াভিলাষে পুনর্বার সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে শর্মিষ্ঠা ও সেই সমস্ত সখীগণ সমভিব্যাহারে যথেচ্ছ বনবিহার করিতেছেন, কেহ প্রফুল্ল মনে মধুপান করিতেছে, কেহ সুস্বাদ ফল দংশন করিতেছে, কেহ বা অন্যান্য ভক্ষদ্রব্য উপভোগ করিতেছে, ইত্যবসরে মৃগয়াবিহারী নহুষ-তনয় যযাতি মৃগের অনুসরণ ক্রমে একান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে করিতে পুনর্বার সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, সর্বালঙ্কারে ভূষিতা কন্যাগণ-বেষ্টিতা মধুরহাসিনী এক পরমাসুন্দরী কামিনী তথায় উপবেশন করিয়া আছেন এবং পরমসুকুমারী এক রাজকুমারী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

রাজা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া সমুচিত সমাদর প্রদর্শনপূর্বক দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে। তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কোন বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ? তোমার ও তোমার এই পরিচারিকার নাম কি এবং এই সকল সখীগণই বা কে?' দেবযানী কহিলেন, 'আমি সবিশেষ নিবেদন করিতেছি, অবহিত হইয়া শুনুন। মহারাজ! আমি দৈত্যগুরু শুক্রের কন্যা, আর আমার এই পরিচারিকা দানবরাজ বৃষপর্বার দুহিতা। ইনি দাসীভাবে সততই আমার অনুগামিনী থাকেন।' তাহা শুনিয়া রাজা কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুন্দরি! ইনি দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা হইয়া কি কারণে তোমার দাসী হইলেন, জানিতে নিতান্ত উৎসুক্য হইতেছে।' দেবযানী কহিলেন, 'দৈবনির্বন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং রাজকন্যা আমার পরিচারিকা হইবে, ইহা বড় আশ্চর্য নহে, অতএব সে বিষয়ের আর অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই। মহাশয়!

আপনার আকার ও বেশ দেখিয়া রাজা ও বাগ্বিন্যাস-পটুতায় পণ্ডিত বোধ হইতেছে, অতএব, বলুন, আপনি কে, কাহার পুত্র এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছেন?' যযাতি কহিলেন, আমি শৈশবকালে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি রাজা ও রাজকুলে উৎপন্ন বটে; আমার নাম যযাতি।' দেবযানী কহিলেন, 'মহারাজ, আপনি কি উদ্দেশ্যে এই অরণ্যে আসিয়াছেন, শুনিতে অভিলাষ করি।' রাজা কহিলেন, 'সুন্দরি! আমি মৃগয়ার্থ নগরী হইতে নির্গত হইয়া মৃগের অনুসরণ-ক্রমে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও বলবতী পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া জলপানাভিলাষে এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আমার শ্রান্তিদূর ও পিপাসা-নিবৃত্তি হইয়াছে, কথাপ্রসঙ্গে গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে, অতএব অনুমতি কর, প্রস্থান করি।' তখন দেবযানী কহিলেন, 'মহারাজ। এই দুই সহস্র কন্যা ও পরিচারিকা শর্মিষ্ঠার সহিত আমি তোমার অধীন হইলাম, অদ্যাবধি তুমি আমার সখা ও ভর্তা হইলে।'

রাজা সহসা এই অসম্ভাবিত আত্মসমর্পণ-ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে ও বিনয়-বচনে দেবযানীকে কহিলেন, 'হে শুক্রতনয়ে! এ তোমার শ্রেয়ঃ কাজ নহে, দেখ, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি ক্ষত্রিয়জাতি, আমি কোনরূপেই তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি, আর তোমার পিতা শুক্রাচার্য কদাচ এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন না।' দেবযানী কহিলেন, 'মহারাজ। ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই ক্ষত্রিয়ের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং ক্ষত্রিয়েরাও কোন কোন সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং এই উভয়ের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহাতে আমাকে ভার্যাস্বরূপে অঙ্গীকার করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দোষাবহ নহে; বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং ঋষি ও ঋষিপুত্র; অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ কর।' যযাতি কহিলেন, 'হে সুন্দরি! চারি বর্ণই একের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সত্য বটে, কিন্তু সকল বর্ণের ধর্ম ও আচার-ব্যবহার-বিষয়ে

বিস্তর বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ধর্মপ্রণালী ও আচার-পরম্পরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সুতরাং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট, আমি হীনবর্ণ হইয়া কিরূপে শ্রেষ্ঠ বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিব?' তখন দেবযানী কহিলেন, 'মহারাজ! পাণিগ্রহণ করিলেই বিবাহক্রিয়া নির্বাহ হইয়া থাকে, এ প্রথা পূর্বাপর প্রচলিত আছে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, যৎকালে আমি অন্ধকূপে পতিত হইয়াছিলাম, তখন তুমিই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে এত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছি। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে তদবধিই তুমি আমার পতি হইয়াছ; অতঃপর আর কেহ আমার পাণিস্পর্শ করিবেক না।' তখন যযাতি কহিলেন, 'হে দেবযানি! মহাবিষ আশীবিষ ও সুতীক্ষ্ণ শর অপেক্ষাও কোপাক্রান্ত ব্রাহ্মণ সাতিশয় দুর্ধর্ষ, এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।' দেবযানী কহিলেন, 'মহারাজ, কি কারণে এরূপ কহিতেছেন, স্থির করিতে পারিতেছি না।' রাজা প্রত্যুত্তরে কহিলেন, 'দেখ, সর্পাঘাতে ও শস্ত্রপাতে একের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে গ্রাম, নগর, বন ও উপবন প্রভৃতি সকলই ভস্মসাৎ করেন; অতএব হে দেবযানি! তোমার পিতা সম্প্রদান না করিলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না।' তখন দেবযানী কহিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনাকে স্বয়ং বরণ করিয়াছি, এ কথা শুনিলে পিতা আসিয়া অবশ্যই আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিবেন। অযাচিতা বা পিতৃদত্তা কন্যা গ্রহণ করিলে পাণিগ্রহিতার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।' এই বলিয়া দেবযানী স্বীয় পরিচারিকা ঘূর্ণিকা দ্বারা পিতৃ-সন্নিধানে আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। মহর্ষি শুক্র, ধাত্রীমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া রাজদর্শনার্থ সেই কাননে উপনীত হইলেন। রাজা যযাতি শুক্রাচার্যকে তথায় আগত দেখিয়া অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবসরে

দেবযানী পিতাকে কহিলেন, 'হে তাত! ইনি নহুষ-তনয় রাজা যযাতি। আমি অন্ধকূপে পতিত হইলে এই মহাত্মা আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, সুতরাং ইনি তাহাতেই আমার পাণিগ্রহিতা হইয়াছেন, অতএব আপনি এই সৎপাত্রে আমাকে সম্প্রদান করুন; আমি আর অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিব না।' তখন শুক্রাচার্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে নহুষ নন্দন! আমার কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে; অতএব আমি প্রসন্ন-মনে সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর।' যযাতি কহিলেন, 'ভগবন্ ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ-নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলে বর্ণসঙ্করজনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি।' শুক্র কহিলেন, 'মহারাজ। তুমি অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অধর্ম হইতে মোচন করিব, এ বিষয়ে তোমার কোন আশঙ্কা নাই, সত্যই আমি তোমার পাপাপনোদন করিব, তুমি বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ কর, প্রার্থনা করি, তোমাদের উভয়ের অতি মাত্র সদ্ভাব হউক; কিন্তু এই অসুর-রাজকুমারী শর্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয়া হইবেন, তুমি কদাচ ইহাকে পরিণয় করিও না।'

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যযাতি নগরে প্রত্যাগত হইয়া পরম-সমাদরে দেবযানীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং তাঁহার নির্দেশক্রমে অশোকবন-সন্নিধানে এক গৃহ নির্মাণ করাইয়া বৃষপর্বতনয়া শর্মিষ্ঠাকে তথায় বাস করিতে আদেশ দিলেন। রাজা গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানপূর্বক শর্মিষ্ঠাকে প্রতিপালন ও দেবযানীর সহিত পরমসুখে যৌবনসুখ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে দেবযানীর ঋতুকাল উপস্থিত হইল, তিনি রাজসহযোগে গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। এইরূপে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, একদা শর্মিষ্ঠা আপন নব যৌবন ও গর্ভাধানকাল আবির্ভূত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার ত ঋতুকাল উপস্থিত, কিন্তু

অদ্যাপি বিবাহ হইল না, এক্ষণে কি করি, কি উপায়েই বা স্বীয় মনোরথ সম্পাদন করি। দেবযানী একটি পুত্র প্রসব করিয়া স্বকীয় বাসনা চরিতার্থ করিয়াছে, কিন্তু আমার যৌবনকাল বুঝি নিষ্ফল হইল। দেবযানী যেরূপে কৃতকার্য হইয়াছে, আমিও সেইরূপে মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়া চরিতার্থ হইব। আমি সন্তান-কামনায় নির্জনে তাঁহার সহযোগ প্রার্থনা করিলে, বোধ করি, তিনি কখনই তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।' এই অবসরে রাজা যযাতি অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে অশোকবন-সন্নিধানে গমন করিলেন। সুচারুহাসিনী শর্মিষ্ঠা রাজাকে নির্জনে পাইয়া প্রত্যুদগমনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'মহারাজ! ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও বরুণের অন্তঃপুরে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে, তাহাদিগকে কেহই নয়নগোচর করিতে পান না। হে রাজন্! আমার কুল, শীল, রূপ, যৌবন প্রভৃতি কিছুই আপনার অবিদিত নহে। সম্প্রতি আমি বিনয়পূর্বক প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ঋতুরক্ষা করুন।' যযাতি কহিলেন, 'হে সুন্দরি! তুমি অতি সুশীলা, সৎকুলোদ্ভবা এবং তোমার রূপ কোন অংশেই নিন্দনীয় নহে, কিন্তু দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে শুক্র আমাকে বলিয়াছিলেন, এই বৃষপর্বতনয়া শর্মিষ্ঠাকে তুমি কদাচ শয্যায় আহ্বান করিও না।' শর্মিষ্ঠা কহিলেন, মহারাজ পরিহাস প্রসঙ্গে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্তে, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কটে ও সর্বস্বনাশকালে মিথ্যাব্যবহার কদাচ পাপবহ নহে। সাক্ষ্য প্রদানে ব বিচারস্থলে মিথ্যা কহিলেই মহাপাপে পরিলিপ্ত হইতে হয়।

যযাতি কহিলেন, 'রাজাই প্রজাদিগের দৃষ্টান্ত স্থল, মিথ্যা কহিলে রাজা অবশ্যই বিনষ্ট হন, অতএব আমি অর্থকষ্টেও মিথ্যা কহিতে সম্মত নহি।' তখন শর্মিষ্ঠা পুনর্বার কহিলেন, 'মহারাজ সখীর পতি ও আপন পতি উভয়েই তুল্য এবং একের বিবাহে অন্যে বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব যখন আমার সখী তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমারও বরণ করা হইয়াছে

যযাতি কহিলেন, 'সুন্দরি! অর্থীদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা আমার এক প্রধান ধর্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম। তুমিও আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ, অতএব বল, তোমার কি প্রিয় কার্য সম্পাদন করিতে হইবে?' শর্মিষ্ঠা কহিলেন, 'মহারাজ! আমাকে অধর্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমার ধর্মস্থাপন করুন, অতঃপর আমি আপনার প্রসাদে পুত্রবতী হইয়া পৃথিবীতে ধর্মানুষ্ঠান করিতে পারিব। আরও দেখুন, ভার্যা, দাস ও পুত্র ইহারা যে কিছু ধন উপার্জন করে, সে ধনে তাহাদিগের অধিকার নাই, তাহাদিগের প্রভুরই সম্পূর্ণ অধিকার, আমি দেবযানীর দাসী এবং তিনি তোমার বশ্যা, অতএব আমাদের উভয়েরই মনোরথ সফল করিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।' বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্মপরায়ণ রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহার ঋতু রক্ষা করত পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বৃষপর্বতনয়া শর্মিষ্ঠা রাজার সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবযানী শর্মিষ্ঠার পুত্রোৎপত্তি সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন। অনন্তর শর্মিষ্ঠার সন্নিহিতা হইয়া কহিলেন, 'হে সুভ্রু! তুমি কামান্ধ হইয়া এ কি পাপানুষ্ঠান করিলে?' শর্মিষ্ঠা কহিলেন, 'হে চারুহাসিনী একদা কোন্ ধর্মপরায়ণ ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি আমার কুটীরে আগমন করিয়াছিলেন। আমি ঋতু রক্ষার্থে প্রার্থনা করাতে, তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন। আমি অন্যায়তঃ কামপ্রবৃত্তিচরিতার্থ করি নাই। আমি সত্য কহিতেছি, আমার এই সন্তানটি সেই ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' তখন দেবযানী কহিলেন, যদি ধর্ম প্রতিপালনার্থে এই কর্ম করিয়া থাক, সে উত্তমই হইয়াছে; কিন্তু যদি সেই ঋষির গোত্র জ্ঞান ও আভিজাত্য জানিতে পারিয়া থাক, তবে বল, শুনিতে নিতান্ত উৎসুক্য হইতেছে।' শর্মিষ্ঠা কহিলেন, 'সেই ঋষি

সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ও তপঃপ্রভাসম্পন্ন; তাঁহাকে দেখিয়া সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় নাই। দেবযানী কহিলেন, 'যাহা হউক, যদি তুমি শ্রেষ্ঠজাতির ঔরসে সন্তানলাভ করিয়া থাক, তাহাতে আমার ক্ষোভ বা পরিতাপ নাই।' তাঁহারা পরস্পর এইরূপ হাস্য-পরিহাসপূর্বক কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন। পরিশেষে দেবযানী এই বৃত্তান্তের প্রতি বিশ্বাস করিয়া স্বীয় আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর যযাতি দেবযানীর গর্ভে, যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা দেবযানী প্রিয়তম সমভিব্যহারে এক নির্জন বনে গমন করিয়া দেবরূপ তিনটি বালক দেখিতে পাইলেন। তাহারা অসঙ্কুচিত চিত্তে ক্রীড়া করিতেছিল। দেবযানী তাহাদিগের অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ। এই সর্বাঙ্গ সুন্দর বালকগুলি কোন্ ভাগ্যবানের পুত্র, বলা যায় না। ইহারা দেবকুমারতুল্য সুকুমার। ইহাদিগের আকার-প্রকারে তোমারই ঔরসজাত বলিয়া বোধ হইতেছে।' দেবযানী রাজাকে এইরূপ কহিয়া বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'বৎস। তোমরা কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, কাহার পুত্র এবং তোমাদিগের পিতার নাম কি, শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে।' দেবযানী কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বালকেরা তর্জনী সঙ্কেত দ্বারা মহারাজ যযাতিকে পিতা নির্দেশ করিয়া কহিল, 'আমাদিগের মাতার নাম শর্মিষ্ঠা।' এই বলিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে নিজ পিতা যযাতির সন্নিহিত হইল; কিন্তু দেবযানীর সমীপে তিনি তাহাদিগকে সমাদর করিতে পারিলেন না। বালকেরা পিতার অনাদরে অভিমান করিয়া রোদন করিতে করিতে জননী সন্নিধানে গমন করিল। রাজা বালকদিগের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইলেন। দেবযানী রাজার প্রতি বালকদিগের সদ্ভাব-সন্দর্শনে সে বিষয়ের মর্মোদ্ঘাটনপূর্বক অনতি-

বিলম্বে শর্মিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিলেন, 'দেখ শর্মিষ্ঠে! তুমি আমার অধীন হইয়া আমারই অপ্রিয় কার্য করিয়াছ, ইহাতে কি তোমার মনে শঙ্কার উদয় হয় নাই?' শর্মিষ্ঠা কহিলেন, 'আমি ঋষির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সে ত মিথ্যা নহে। আমি ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ বলিয়াছি, তোমার নিকট আমার ভয়ের বিষয় কি? আরও তুমি মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তাহাতে আমারও বরণ করা হইয়াছে, কারণ সখীর পতি ধর্মতঃ পতি হইতে পারেন। তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, তুমি আমার পূজ্যা ও মান্যা। আর আমি এই রাজর্ষিকে তোমা হইতেও সম্মান ও পূজা করিয়া থাকি, তাহা কি তুমি জান না।' দেবযানী শর্মিষ্ঠার মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ। তুমি আমার অতিশয় অপ্রিয় কার্য করিয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার আলয়ে আর অবস্থান করিব না, চলিলাম।' এই বলিয়া পিতৃগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা দেবযানীকে বাষ্পাকুললোচনে সহসা শুক্র-সন্নিধানে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্যথিত মনে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রোষরক্তলোচন দেবযানী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি রাজাকে ভালমন্দ কিছুই না বলিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং অভিবাদন-পূর্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজাও দেবযানীর অনুসরণক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বিধানানুসারে শুক্রাচার্যের পূজাদি করিয়া অতি বিনীতভাবে একান্তে সমাসীন হইলেন। অনন্তর দেবযানী শুক্রকে কহিলেন, 'তাত! অধর্মে ধর্মকে পরাজয় করিয়াছে, নিকৃষ্টেরা মহতের সহিত নীচ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখুন, বৃষপর্বতনয়া শর্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। রাজা যযাতি তাহার গর্ভে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। আমি দুর্ভাগা আমার দুইটি বৈ পুত্র নহে। হে ভৃগুকুলতিলক! এই রাজা পরম ধার্মিক বলিয়া বিখ্যাত আছেন, কিন্তু এক্ষণে এইরূপ

গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হে তাত! আমি সত্য বলিতেছি, সম্প্রতি ইনি শাস্ত্রমর্যাদা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।' শুক্র এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে রাজা যযাতিকে অভিসম্পাত করিলেন, 'মহারাজ, তুমি ধার্মিক হইয়া প্রিয় বোধে অধর্মাচরণ করিয়াছ, অতএব দুর্জয় জরা অচিরাৎ তোমাকে আক্রমণ করিবে।' রাজা সহসা এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া শুক্রকে কহিলেন, 'ভগবান্! শর্মিষ্ঠা ঋতুরক্ষার্থে প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত সেই কর্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। নিকৃষ্টবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য করি নাই। ধর্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুরুষে ঋতুরক্ষার্থিণী স্ত্রীলোক কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তদীয় ঋতুরক্ষা না করে, সে ভ্রূণহত্যাপাতকে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হয়। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া ধর্মলোপের আশঙ্কায় আমি শর্মিষ্ঠার বাসনা সফল করিয়াছিলাম।' শুক্র কহিলেন, 'মহারাজ আমি তোমাকে যে কর্ম করিতে প্রতিষেধ করিয়াছিলাম, তাহা কেন করিলে? তুমি জান, মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ধর্মাচরণকেও এক প্রকার চৌর্য বলিয়া বলা যাইতে পারে।'

যযাতি শুক্র কর্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জরাক্রান্ত হইলেন। পরে তিনি শুক্রকে কহিলেন, 'ভগবন্! আমি অদ্যাপি যৌবনসুখ অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব প্রসন্ন হইয়া যাহাতে জরা হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন উপায় অবধারণ করিয়া দিন।' শুক্র কহিলেন, 'মহারাজ! আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে এইমাত্র হইতে পারে, তুমি ইচ্ছা করিলে অন্যের শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে।' তখন রাজা কহিলেন, 'হে ব্রহ্মণ! এক্ষণে এই অনুমতি করুন যে, আমার পঞ্চপুত্রের মধ্যে যে পুত্র মদীয় জরা গ্রহণ করিয়া আমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে রাজ্যাধিকার, পুণ্যাধিকার কীর্তিলাভ করিবে।' শুক্র কহিলেন, 'হে নহুষ-তনয়! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া অন্যের শরীরে জরা সঞ্চারিত করিতে

পারিবে, তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না। আর তোমার যে পুত্র জরা গ্রহণ করিয়া তোমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে তদীয় সাম্রাজ্য অধিকারপূর্বক আয়ুষ্মান্ ও পুত্রপৌত্রাদিমান্ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। তৎপরে রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্বক স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে কহিলেন, 'বৎস! শুক্রের শাপপ্রভাবে এই মহাঘোর জরা আমাকে আক্রান্ত করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি আমি বিষয়-ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি মদীয় পাপ ও জরা গ্রহণ কর। আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয়-ভোগ করি। সহস্রবৎসর পূর্ণ হইলে পুনর্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া আমি পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব।' যদু কহিলেন, 'মহারাজ জরার অনেক দোষ, তাহাতে পান-ভোজনে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মে, শ্মশ্রুজাল শুক্ল এবং মাংস শিথিল ও সঙ্কুচিত হওয়াতে জীর্ণ ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট, নিরানন্দ ও সর্বকার্যে নিরুৎসাহ হয়। আত্মীয় ব্যক্তিরা জরাজীর্ণকে পদে পদে পরাভব করে; অতএব আমি সেই জরা গ্রহণে সম্মত নহি। আপনার আমা হইতে প্রিয়তর অন্য অনেক পুত্র আছে, তাহাদিগকেই জরা প্রদান করুন।' যযাতি কহিলেন, 'তুমি যেহেতু আমার ঔরসজাত পুত্র হইয়া স্বকীয় যৌবন প্রদানে সম্মত হইলে না, অতএব, তোমার বংশ-পরম্পরায় কেহই রাজ্যাধিকারী হইবে না।' তৎপর রাজা যযাতি তুর্বসুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'বৎসে! আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয়োপভোগ করিব। সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনর্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব।' তুর্বসু কহিলেন, 'মহারাজ! রূপনাশিনী জরা মনুষ্যকে ইচ্ছানুরূপ ভোগসুখে বঞ্চিত করে। জরার প্রভাবে বুদ্ধিভ্রংশ ও পদে পদে প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, অতএব আমি আপনার জরা গ্রহণে সম্মত নহি।' যযাতি কহিলেন 'বৎস! তুমি আমার আত্মজ হইয়া আমার প্রার্থনা-

পূরণে সম্মত হইলে না, অতএব আমি শাপ দিতেছি, তুমি নির্বংশ হইবে এবং সঙ্কীর্ণাচার ধর্মসম্পন্ন, প্রতিলোমজ, রাক্ষস, চণ্ডাল, গুরুদারনিরত, তির্য্যগ্‌যোনিজাত, পশুধর্মা ও পাপিষ্ঠাদিগের রাজা হইবে।

এইরূপে তুর্বসুকে অভিশাপ দিয়া রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠা পুত্র দ্রুহ্যুকে কহিলেন, 'বৎস! সহস্র বৎসরের নিমিত্ত আমার এই রূপনাশিনী জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিব। নির্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হইলেই পুনর্বার পাপের সহিত জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিব।' দ্রুহ্যু কহিলেন, 'মহারাজ! মনুষ্য জীর্ণ হইলে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিতে বা কামিনী সম্ভোগ করিতে অসমর্থ হয় এবং জীর্ণ ব্যক্তির বাক্য স্খলিত হয়, অতএব আমি জরা গ্রহণে সম্মত নহি।' তাহা শুনিয়া রাজা রোষাবিষ্ট-চিত্তে কহিলেন, 'দ্রুহ্যো! তুমি আমার আত্মজ হইয়া যৌবন-প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে, অতএব অতঃপর তোমার কোন বাসনা ফলবতী হইবে না, আর যে স্থানে গজ, বাজী, রথ ও শিবিকাদি যানের সমাগম নাই, কেবল উড়ুপ বা সন্তরণ দ্বারা গমনাগমন করিতে হয়, তোমাকে সেই স্থানে গিয়া বাস করিতে হইবে। তোমার বংশে কেহই রাজা হইবে না।' রাজা দ্রুহ্যুকে এইরূপে অভিশাপ দিয়া অনুকে কহিলেন 'বৎস! তুমি আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া এক সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ করিব।' অনু কহিলেন, 'মহারাজ! জীর্ণ ব্যক্তি অশুচি ও বালকের ন্যায় অনিয়ম-কালে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যথাকালে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া-সম্পাদন করিতে পারে না; অতএব আমি জরা গ্রহণ করিব না।' তখন রাজা কহিলেন, 'তুমি আমার ঔরস পুত্র হইয়া জরার দোষোল্লেখপূর্বক যৌবন প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে; অতএব আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তুমি অচিরাৎ সেই জরাদোষে লিপ্ত হইবে এবং তোমার সন্তান-সন্ততি যৌবন প্রাপ্তি মাত্রেই কালগ্রাসে পতিত হইবে।'

সর্বশেষে পূরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'বৎস পূরো! আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছি, আমার কেশ পলিত ও মাংস লোলিত হইয়াছে, কিন্তু আমি যৌবন সুখ সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি আমার পাপের সহিত জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া কিছুকাল ইচ্ছানুরূপ বিষয়-ভোগ করি। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তোমার যৌবন তোমাকে পুনর্বার প্রদান করিয়া পাপের সহিত সকল জরা গ্রহণ করিব। হে পূরো! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, এইরূপ করিলে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে।' পূরু এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'যে আজ্ঞা, মহারাজ! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা পালন করিব; আমি পাপের সহিত আপনার জরা গ্রহণ করিব; আপনি আমার যৌবন লইয়া বাসনানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করুন।' তখন যযাতি কহিলেন, 'বৎস্য! তোমার এইরূপ অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ সন্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইলাম, এক্ষণে আশীর্বাদ করি তোমার রাজ্যে প্রজারা সর্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সর্বকাল পরম সুখে বাস করিবে।' এই বলিয়া রাজা শুক্রকে স্মরণপূর্বক স্বীয় পুত্র পূরুর শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন।'

অতঃপর মহাভারতের কাহিনী সংক্ষেপে এই: শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠার কণিষ্ঠ পুত্র পূরুর অপূর্ব আত্মত্যাগে মুগ্ধ হইয়া শর্মিষ্ঠাকে তাঁহার কন্যা দেবযানীর দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠাকে লইয়া যযাতি দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়া অবশেষে পাপসহ পুত্রের জরা পুনরায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পূরু সিংহাসন লাভ করিলেন।

২

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র কাহিনী

মহাভারতের উপরোক্ত কাহিনী 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনায় মধুসূদন কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, এইবার তাহা নির্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম অঙ্ক

হিমালয় পর্বতে একজন দৈত্য দেবতাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য দৈত্যরাজ কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। সেখানে বকাসুর আসিয়া তাহাকে শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর কলহের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিল এবং তাহার দণ্ডস্বরূপ শর্মিষ্ঠাকে যে সারাজীবনের জন্য দেবযানীর দাসীত্ব বরণ করিতে হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিল। শুনিয়া দৈত্যেরা দৈত্যরাজকুমারীর জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল। তারপর সহসা নেপথ্যে দেবতাদিগের রণবাদ্য শুনিতে পাইয়া উভয়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে গেল।

গুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে একদিন শর্মিষ্ঠার সখী দেবিকা আসিয়া সখী শর্মিষ্ঠার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল। শর্মিষ্ঠার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া বারংবার সে আক্ষেপ করিতেছিল। এমন সময় দেবযানীর সেবাকার্য সম্পন্ন করিয়া শর্মিষ্ঠা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার মুখে প্রসন্নতার কিছুমাত্র অভাব নাই। দেবিকা তাহার বিলম্বে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, শর্মিষ্ঠা যে পরাধীনা তাহার নিজের ইচ্ছামত কিছুই করিবার অধিকার নাই, তাহাই জানাইল। দেবিকা শুনিয়া তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু শর্মিষ্ঠা দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, 'সুখ-দুঃখ মনের ধর্ম; অতএব বাহ্যসুখ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই সুখ।' কিন্তু দেবিকা এ কথা স্বীকার করিতে চাহিল না। শর্মিষ্ঠা তথাপি

দেবিকাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে গেল যে সে নিজের দোষেই এই দুর্দশায় পতিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার জন্য কাহারও পরিতাপ করিয়া কোন লাভ নাই। তবে তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সেই দুঃখভোগের মধ্যেও আনন্দ লাভ করিতেছেন বলিয়া জানাইলেন। এমন সময় দূরে দেবযানী পূর্ণিকা নামে তাঁহার একজন সখীকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন দেখিয়া দেবিকাকে লইয়া শর্মিষ্ঠা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দেবযানী ও পূর্ণিকা আসিয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন। কূপ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবার পর হইতেই পূর্ণিকা সখী দেবযানীর মনে ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল, সেদিন তাহাকে নির্জনে পাইয়া সে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দেবযানী সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, তিনি বলিলেন, কূপ হইতে উপরে উঠিয়া যখন তিনি রাজা যযাতিকে সম্মুখে দেখিলেন, তখন হইতেই তাঁহার প্রতি তাহার অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, অথচ যযাতি ক্ষত্রিয় এবং দেবযানী নিজে ব্রাহ্মণ-কন্যা বলিয়া তাহাদের মিলনের মধ্যে পিতা শুক্রাচার্য অন্তরায় হইতে দাঁড়াইতে পারেন আশঙ্কা করিয়া তিনি বিমর্ষ হইয়া আছেন। পূর্ণিকা তাহাকে আশ্বাস দিল, সে তাহার জন্য শুক্রাচার্যের অনুমতি লাভ করিয়া দিবেন। শুক্রাচার্যও সমাধিস্থ হইয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কন্যা কাহারও প্রতি আসক্ত হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত কাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পূর্ণিকার মুখ হইতে যখন যযাতির নাম শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি আনন্দিত হইয়াই বলিলেন, যদ্যপিও তিনি ক্ষত্রকুল জাত, তথাচ বেদবিদ্যাবসে তিনিই আমার কন্যারত্নের উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া বিবাহে সম্মতি দিয়া 'কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত' হইলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরীর রাজপথচারী দুইজন নাগরিকের আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা যযাতি মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসা অবধি রাজকার্যে বীতস্পৃহ হইয়া উদাসীন ভাবে কি এক

সুগভীর চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া দিন যাপন করিতেছেন। কেহ কেহ ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছে না, কেহ কোন কিছু অনুমানও করিতে পারিতেছে না। ইহাতে রাজ্যের প্রজাদিগের মধ্যে রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়াছে। নানা জনে নানা কথা অনুমান করিতেছে। একজন অনুমান করিল, 'বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের অনুরাগ সঞ্চার হয়ে থাকবে।' শুক্রাচার্য কপিল নামক তাহার একজন শিষ্যকে যযাতির নিকট তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দিয়া পাঠাইলেন।

এ দিকে রাজা যযাতি মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে দিন যাপন করিতেছেন। দেবযানীর রূপ-লাবণ্যের কথা স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ কন্যা যে তাহার অপ্রাপণীয়া তাহা মনে করিয়া দ্বিগুণ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। কেবলমাত্র বিদূষকের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিয়া মনের ভার লঘু করেন। এমন সময়ে শুক্রাচার্যের শিষ্য যযাতির নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বিবাহোপলক্ষে যযাতির রাজধানী সুসজ্জিত হইতে লাগিল। যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিবাহের সংবাদ শুনিয়া প্রজাবর্গ প্রসন্ন হইল। তাহারা জানিতে পারিল, 'দৈত্যগুরু ভার্গব স্ব-কন্যার সহিত গোদাবরীতীরে অবস্থান কচ্চেন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহ-কার্য নির্বাহ হবে।' মহারাজের অনুপস্থিতে মন্ত্রী রাজ্য পরিচালনা করিবেন।

তৃতীয় অঙ্ক

মন্ত্রীর স্বগতোক্তি হইতে জানিতে পারা গেল যে, রাজা প্রায় দেড় বছর পর মহিষী দেবযানীকে লইয়া নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইতিমধ্যে যদু নামে তাঁহার একটি পুত্রেরও জন্ম হইয়াছে। দেড় বৎসর কালের প্রবাস-জীবনে বিদূষকও রাজদম্পতীর সঙ্গী ছিল। রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া দেবযানী একদিন বিদূষককে তাহার যদু কেমন আছে, তাহা জানিয়া

আসিবার জন্য বলিলেন, এই সুযোগে বিদূষক কিছু মিষ্টান্ন চুরি করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল।

রাজা যযাতি ও মহিষী দেবযানীর কথোপকথনের ভিতর দিয়া তাঁহারা পরস্পর সুগভীর আসক্ত এবং উভয়ের মিলনে উভয়েই যে কৃতার্থ সেই ভাব প্রকাশ পাইল। দেবযানী রাজার মুখে তাহার পূর্বজীবন বৃত্তান্ত বিশেষতঃ দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধারের পরবর্তী কাহিনী শুনিতে অত্যন্ত উৎসুক হইল রাজা সেই কাহিনী বলিয়া তাহার উৎসুক্য দূর করেন। তারপর যদুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাহার পরিচর্যা করিবার জন্য দেবযানী রাজসন্নিধান হইতে যখন প্রস্থান করিলেন, তখন সেখানে আসিয়া বিদূষক উপস্থিত হইল। বিদূষক দৈত্যদেশ হইতে রাজা মহর্ষি-কন্যাকে জয় করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া তাহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'এমন রত্ন কি সেখানে আর আছে?' শুনিবামাত্র রাজা পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং আনন্দে গদ গদ হইয়া বিদূষককে বলিলেন 'ভাই হে। বোধ হয় দৈত্যদেশে এ প্রকার রত্ন অনেক আছে।' বলিয়া দেবযানীর সহচরীদিগের মধ্যে একজন যে অনুপম রূপলাবণ্যবতী 'স্ত্রীলোক'কে তিনি একদিন ক্ষণমাত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন, সে কথা বর্ণনা করিলেন। কিন্তু শঙ্কাবশত তিনি তাহার প্রকৃত পরিচয় দেবযানীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন নাই। তাহার 'মধুর অধরকে' তিনি 'রতি-সর্বস্ব' বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি পরম্পরায় মাত্র শুনিয়াছেন যে সে দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা; কিন্তু তারপর আর কোন সবিশেষ পরিচয় পান নাই। তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া তিনি আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। এমন সময় একজন বিপন্ন ব্রাহ্মণকে দস্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আহুত হইয়া রাজা সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। শর্মিষ্ঠার প্রসঙ্গ আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না।

দৈত্যরাজ্য হইতে বকাসুর আসিয়া শর্মিষ্ঠাকে জানাইল যে মহিষী তাঁহার জন্য অত্যন্ত কাতরা হইয়াছেন, মহারাজ যযাতিকে

অনুরোধ করিয়া কয়েকদিনের জন্য তাহাকে মাতৃসন্দর্শনে লইয়া যাইতে আসিয়াছে। কিন্তু শর্মিষ্ঠা তাহাতে অস্বীকৃতা হইল, সে বকাসুরকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। জানিতে পারা গেল, শর্মিষ্ঠা যযাতিকে প্রথম দর্শনের দিন হইতেই তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাহাকে দর্শন করিবার প্রত্যাশা করিতেছে, এই অবস্থায় সে পিতৃরাজ্যে যাইতে পারে না। বকাসুর ফিরিয়া গেল।

রাজা যযাতি একদিন তাঁহার বহিরুদ্যানের যে অংশে দেবযানীর পরিচারিকাগণ বাস করে, সেইখানে একাকী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেপথ্য হইতে বীণাধ্বনি এবং সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন; অতঃপর নেপথ্যাগত শর্মিষ্ঠার উক্তি হইতে জানিতে পারিলেন, শর্মিষ্ঠা তাঁহার প্রতি সুগভীর আসক্ত হইয়াছে। শুনিয়া তিনি শর্মিষ্ঠার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার প্রতি নিজের সুগভীর অনুরাগের কথা ব্যক্ত করিলেন। অবশেষে বলিলেন, 'যদ্যপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।' তিনি শর্মিষ্ঠাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

রাজা যযাতিকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া বিদূষক তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রাজা বলিলেন, দেবযানী এতদিনে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে তাহার প্রণয় এবং বিবাহের সংবাদ জানিতে পারিয়াছেন এবং কি ভাবে যে তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। তাহা হইতে জানিতে পারা গেল, দেবযানী রাজাকে লইয়া তাহার পরিচারিকাগণ যে উদ্যানে বাস করে, সেইখানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, শর্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্তী হইবামাত্র তাহার তিনটি পুত্র রাজার নিকট ছুটিয়া আসিল; কিন্তু দেবযানীকে রাজার সঙ্গিনী দেখিতে পাইয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেবযানী শিশুদিগের পরিচয় পাইয়া সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। তাহাতে দেবযানী ক্রোধে অন্ধ

হইয়া শর্মিষ্ঠার সম্মুখেই চরম অপমান করিয়া শেষ পর্যন্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন এবং সখী পূর্ণিকাকে সঙ্গে করিয়া ইতিমধ্যেই তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যযাতি আশঙ্কা করিতেছেন, শুক্রাচার্য যখন দেবযানীর মুখ হইতে এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন, তখন তাঁহার কোপ হইতে তাঁহার আর উদ্ধারের কোন উপায় থাকিবে না। রাজা ইহাতে জ্ঞানশূন্য এবং হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন।

এদিকে শুক্রাচার্য তাঁহার শিষ্য কপিলকে সঙ্গে করিয়া কন্যাকে দর্শন করিবার জন্য যযাতির রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। রাজধানীর নিকটস্থ যমুনাতীরে এক অতিথিশালায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কপিলকে খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিজে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। এমন সময় দেবযানী এবং পূর্ণিকা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া দৈত্যদেশে গিয়া শুক্রাচার্যকে সকল বিষয় জানাইবার জন্য চলিয়াছেন। সহসা নিজের অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া দেবযানী সেখানে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। পূর্ণিকা সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া উঠিলে শুক্রাচার্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুক্রাচার্য নিজের কন্যাকে চিনিতে পারিলেন। দেবযানীও পিতাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার অবস্থা তাঁহার নিকট বিস্তৃত বর্ণনা করিলেন। প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য শুক্রাচার্য তাঁহাকে অনুযোগ করিলেন এবং গান্ধর্ব বিবাহ করা ক্ষত্রিয়কুলের রীতি বলিয়া যযাতির আচরণের মধ্যে কোন দোষ খুঁজিয়া পাইলেন না। কিন্তু তথাপি দেবযানী তাহাকে জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ দিবার জন্য পিতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। শুক্রাচার্য এই অধর্মাচরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন; দেবযানীকে পতিগৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। দেবযানী পূর্ণিকাকে লইয়া পিতার আদেশে প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু পিতাকে বলিয়া গেলেন তাঁহার

অভিলাষটি যেন পূর্ণ হয়, অর্থাৎ যযাতিকে জরাগ্রস্ত হইবার জন্ত যেন তিনি অভিশাপ দেন। শুক্রাচার্য এই বিষয়ে কি কর্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। একদিক দিয়া অপত্যস্নেহ, আর একদিক দিয়া কর্তব্যবোধ, দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য শর্মিষ্ঠাও মর্মান্তিক দুঃখিত হইল। রাজার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে কি না আশঙ্কা করিয়া নিতান্ত কাতরা হইল। এমন সময় মহারাজ নিজেই আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, মহিষী প্রাসাদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শর্মিষ্ঠার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শুনিয়া শর্মিষ্ঠা অভিমানাহত হইল। রাজা তাহার অভিমান দূর করিবার জন্য তাহার হস্ত ধারণ করিলেন, সহসা তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ জরা-গ্রস্ত হইয়া পড়িল। তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। শর্মিষ্ঠা তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। শুক্রাচার্যের অভিশাপ-বাণ তাঁহার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। রাজান্তঃপুরে রোদনের রোল পড়িয়া গেল।

দেবযানী রাজাকে প্রত্যক্ষ করিয়া নিজেও বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

পঞ্চম অঙ্ক

মন্ত্রীর মুখে জানিতে পারা গেল, মহারাজ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আরোগ্য লাভের ঘটনাও তিনি এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: পতির জরাগ্রস্ত অবস্থা দেখিয়া দেবযানী অত্যন্ত কাতর হইলেন, পিতার নিকট গিয়া পতিকে জরা হইতে মুক্ত করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইলেন। শুক্রাচার্য বলিলেন, তাঁহার অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে, তবে রাজার কোনো পুত্র যদি তাঁহার যৌবনের সঙ্গে পিতার জরার বিনিময় করিয়া লয়,

তবে রাজা জরা হইতে মুক্ত হইয়া যৌবন ভোগ করিতে পারিবেন। রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে তাঁহার জরার সঙ্গে নিজের যৌবন বিনিময় করিয়া লইতে বলিলেন, সে অস্বীকৃত হইল। ক্রমে আর তিন পুত্রকেই ডাকিয়া এই অনুরোধ করিলেন, সকলেই ইহাতে অস্বীকৃত হইল। মহারাজ সকলকেই অভি-শাপ দিলেন। তারপর শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতাকে গিয়া নিজেই বলিল, 'আপনার এ জরা রোগ আমি গ্রহণ কত্তে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাকে এ রোগ সমর্পণ ক'রে স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করুন।' শুনিয়া রাজা পুত্রকে বর দিলেন যে সে পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, অতঃপর তাহার যৌবনের সঙ্গে নিজের জরার বিনিময় করিয়া লইলেন।

রাজসভায় রাজা যযাতি দেবযানীকে পার্শ্বে লইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় মহর্ষি শুক্রাচার্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে নরাধিপ! আমার প্রিয়তমা দৈত্যরাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠা কোথায়?' রাজার আদেশে মন্ত্রী শর্মিষ্ঠাকে রাজসভায় লইয়া আসিলেন। শর্মিষ্ঠাকে শুক্রাচার্য জানাইলেন, 'অদ্যাবধি তুমি দাসীত্ব শৃঙ্খল হতে মুক্ত হ'লে।' বলিয়া যযাতির হস্তে শর্মিষ্ঠার হস্ত স্থাপন করিলেন। রাজা মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তাঁহাকেও সিংহাসনের এক পাশে বসাইলেন, তাহার পূর্বে দেবযানীরও অনুমতি লইলেন। দৈত্যগুরু উভয়কেই আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

৩

মূলের সঙ্গে অনৈক্য

মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-যযাতির কাহিনীর সঙ্গে মধুসূদনের ‘শর্মিষ্ঠা নাটকে’র কাহিনীর অনেক বিষয়েই অনৈক্য দেখা যায়. এই অনৈক্যমূলক বিষয়গুলি ‘শর্মিষ্ঠা নাটকে’র গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে কি না, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

মধুসূদনের নাটকে দেখা যায়, দেবযানীর নিকট হইতে শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠা কর্তৃক তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিবার কথা শুনিবামাত্র ‘ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের মত একেবারে জ্বলে উঠ্‌লেন …তারপর মহর্ষি শুক্রাচার্য ক্রোধে রক্ত-নয়ন হয়ে, রাজসভায় গিয়ে মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন, ‘রাজন্, অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হ’বে, আমি এই অবধি ঐ স্থান পরিত্যাগ কল্লেম, এ পাপ-নগরীতে আমার আর অবস্থিতি করা কখনই হবে না!’ বলা বাহুল্য, দৈত্যরাজ তখন পর্যন্ত তাঁহার কোন অপরাধের কথা জানিতেই পারেন নাই।

মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায়, দেবযানী স্বয়ং পিতার নিকট এই বিষয়ে কোন অভিযোগ করিতে যান নাই বরং এই উদ্দেশ্যে ঘূর্ণিকা নামে তাঁহার একজন দাসীকে পিতৃ-সমীপে পাঠাইয়াছিলেন। তারপর শুক্রাচার্য কন্যার নিকটে আসিয়া তাঁহার ক্রোধ উপশমের জন্য তাহাকে নানা সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়াছিলেন। ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য তাঁহার নিকট কীর্তন করিয়া এইজন্য শর্মিষ্ঠাকে ক্ষমা করিবার জন্য তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ‘বালক-বালিকারা বিবেকাভাব প্রযুক্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ করেন না।’ কিন্তু শেষ পর্যন্ত কন্যার কথায় স্থির থাকিতে না পারিয়া বৃষপর্বার নিকট গিয়া শর্মিষ্ঠার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর দৈত্যরাজ কন্যাকে সেজন্য দণ্ড দিতে প্রতিশ্রুত

হইলে দেবযানী নিজেই দৈত্যরাজের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, 'শর্মিষ্ঠা চিরজীবন তাঁহার দাসী হইয়া থাকিবে।' নাটকে উল্লেখিত হইয়াছে যে,. শুক্রাচার্যই দৈত্যরাজের নিকট এই শাস্তি দাবী করিয়াছেন। ইহা হইতে সাধারণভাবেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মহাভারতের মধ্যে শুক্রাচার্যের চরিত্রের যে উচ্চ মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, মধুসূদনের নাটকে তাহা পায় নাই। মধুসূদনের শুক্রাচার্য সন্তান-স্নেহে অন্ধ হইয়া আজন্ম ভক্তশিষ্য দৈত্যরাজের উপর অবিচার করিয়াছেন, মহাভারতে শুক্রাচার্যের চরিত্র এই ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রহিয়াছে।

মধুসূদনের নাটকে উল্লেখিত হইয়াছে যে, কূপ হইতে উদ্ধার করিবার সময়ই দেবযানী এবং যযাতি পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু মহাভারতের কাহিনীতে তাহার ব্যতিক্রম আছে। যযাতির প্রতি দেবযানীর অনুরাগ প্রকাশের ঘটনা আরও পরবর্তী বলিয়া মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায়, দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা উভয়ের সঙ্গে একই সময় যযাতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু নাটকে দেখা যায়, শর্মিষ্ঠার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎকার আরও পরবর্তী ঘটনা।

মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায়, একদিন রাজা যযাতি যখন মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া তৃষ্ণায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পানীয় জলের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন বনভ্রমণকারিণী দুই সহস্র কন্যা ও পরিচারিকা শর্মিষ্ঠাসহ দেবযানীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখনই দেবযানী রাজার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ভর্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, ব্রাহ্মণ-কন্যা ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্য নহে বলিয়া তিনি তাঁহার কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু নাটকে কূপ হইতে উদ্ধারের সময় হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইলেন; তারপর শুক্রাচার্যের অনুমতি লাভ করিয়া উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

মহাভারতে দেখা যায়, শুক্রাচার্য অনুমতি দিবার পরও যযাতি বলিতেছেন,'ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ-নন্দিনীর পাণি-গ্রহণ করিলে বর্ণসঙ্কর-জনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি।' তারপর যখন শুক্রাচার্য বর দান করিয়া যযাতির সেই পাপ অপনোদন করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন যযাতি দেবযানীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। মহাভারতের যযাতি জিতেন্দ্রিয়, ধর্মপরায়ণ, বিবেচক এবং উচ্চ চরিত্রগুণসম্পন্ন। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র রাজা যযাতির চরিত্র তাহা নহে। মহাভারতে শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠা সম্পর্কে যযাতিকে বলিয়াছিলেন, 'এই অসুর রাজকুমারী শর্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয়া হইবেন, তুমি কদাচ ইহাকে পরিণয় করিও না।' ত্রিকালদর্শী ঋষি কন্যার ভাগ্যে কি আছে, তাহা আশঙ্কা করিয়াই যেন এই কথা বলিয়াছিলেন। মহাভারতের কাহিনীতে যযাতি নিজে হইতে কদাচ এই ঋষিবাক্য লঙ্ঘন করেন নাই। মধুসূদন মহাভারতের এই সতর্ক বাণীটি বিস্মৃত হইয়াছেন। তাহার ফলে যযাতির প্রতি তাঁহার অভিশাপের কারণটি অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া শুক্রাচার্যের চরিত্রকে নিষ্প্রভ করিয়া তুলিয়াছে। মহাভারতে যযাতিকে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিবার জন্য শুক্রাচার্য অভিশাপ দিয়াছেন। মধুসূদনের শুক্রাচার্য তাহা করেন নাই, নাটকের চরিত্রের ইহা একটি প্রধান ত্রুটি।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে' শর্মিষ্ঠাকে একদিন সহসা দেখিতে পাইয়া রাজা তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। তারপর গোপনে নিঃসঙ্গ ভাবে একদিন তাহার আবাসে আসিয়া তাহাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রাজা তাহার অনুমতির আর বিশেষ অপেক্ষা না করিয়াই তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারতের কাহিনী ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ তাহাতে শর্মিষ্ঠাই উপযাচিকা হইয়া রাজাকে নানা কথায় আবদ্ধ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে গান্ধর্ব বিবাহের কথা মুখ্যত কিছু উল্লেখ

নাই। বরং পত্নীর দাসীর উপর প্রভুর অধিকার আছে, সে কথাই ছিল; কোন আনুষ্ঠানিক বিবাহের কথা ছিল না। মধুসূদন এখানে গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের অনুকরণজাত।

মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায়, শর্মিষ্ঠার পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে দেবযানী যখন তাহার পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, তখন শর্মিষ্ঠা দেবযানীর নিকট তাহার এক মিথ্যা পিতৃ-পরিচয় দিয়াছিল। পরে প্রকৃত পরিচয় তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদন মহাভারতের কাহিনীর এই অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৪

নাট্যকাহিনীর দোষ-ত্রুটি

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র একটি প্রধান দোষ এই যে, প্রধানত ইহাতে সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক অনুসরণ করিতে গিয়া ইহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকীয় ঘটনা কেবলমাত্র পরোক্ষ সংলাপ কিংবা স্বগতোক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। নাট্যিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়া রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ইহাদিগকে উপস্থাপিত করিতে পারিলে নাটকের যে গুণ প্রকাশ পাইত, ইহাতে তাহা পাইতে পারে নাই। এখানে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার বিবাদের যে কাহিনীটি বকাসুরের উক্তির ভিতর দিয়া পরোক্ষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার যে একটি উচ্চ নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না, অথচ পরোক্ষভাবে বর্ণিত হইবার ফলে তাহা নিতান্ত কৃত্রিম এবং নিষ্প্রাণ বলিয়া মনে হইবে। এই উপলক্ষে শুক্রাচার্যের রাজার নিকট গিয়া ক্রোধ প্রকাশ করা এবং পরিশেষে শর্মিষ্ঠার দণ্ড বিধান ইত্যাদি ঘটনা উচ্চাঙ্গ নাটকীয় গুণান্বিত ছিল; কিন্তু কেবলমাত্র বকাসুরের মুখের কথায় তাহা পরোক্ষভাবে বর্ণিত হইবার ফলে ইহাতে নাটকের কোন গুণই প্রকাশ পাইতে পারে নাই। নাটক যে ঘটনার বর্ণনা নহে বরং তাহার পরিবর্তে ঘটনার সংঘটন মধুসূদনের তাহা না জানিবার কথা নহে; কিন্তু সংস্কৃত নাটককে অনুসরণ করিবার ফলে তাঁহার নাটকের মধ্যে এই ত্রুটি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে যেখানে দেবযানী পূর্ণিকার নিকট যযাতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানেও বর্ণিত ঘটনাকে নাটকীয় আচরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ না করিবার

জন্য দেবযানীর মুখের সেই পরোক্ষ বর্ণনাও নিতান্ত প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে।

তারপর তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাজা যেখানে স্বগতোক্তির দ্বারা তাঁহার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার প্রথম দর্শনের ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, সেখানে ঘটনাটি নাট্যক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার একটি পরম সুযোগ ছিল, কিন্তু নাট্যকার তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র রাজার ক্লান্তিকর স্বগতোক্তির ভিতর দিয়া সেই দীর্ঘ কাহিনীটি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতেও যে কাহিনীর নাট্যগুণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন।

চতুর্থাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রাজা বিদূষকের নিকট শর্মিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার গোপন সম্পর্কের বিষয় দেবযানী যে ভাবে প্রথম জানিতে পারিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা পরোক্ষ ভাবে বর্ণনা না করিয়া একটি নাটকীয় দৃশ্যের মধ্য দিয়া যদি নাট্যকার প্রকাশ করিতেন, তবে তাহা সার্থক হইত। এখানে তাহা অত্যন্ত কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে এই দৃশ্যটির জীবন্ত হইয়া উঠিবার যে সুযোগ ছিল, নাট্যকার তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

সর্বশেষে পঞ্চমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মন্ত্রী যেখানে রাজার পুত্রদিগের সঙ্গে নিজের জরা বিনিময়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন, তাহাও নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে ইহার নাট্যগুণ যেভাবে বৃদ্ধি পাইত, তাহার অন্যথায় তাহা পাইতে পারে নাই, এই কথা বলাই বাহুল্য। ইহার মধ্যেও বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশের সুযোগ ছিল এবং তাহাদের নাট্য-ক্রিয়ার ভিতর দিয়া দৃশ্যটি বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিত, নাট্যকার এই সুযোগটুকুও পরিত্যাগ করিয়াছেন।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলির প্রধান কয়েকটি কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ ইহার প্রথম কারণ; দ্বিতীয় কারণ, বেলগাছিয়া নাট্যশালার মঞ্চ-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা।

পূর্বেই বলিয়াছি, উক্ত নাট্যশালার অভিনেতৃগোষ্ঠীর বিশিষ্ট অভিনয়-গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মধুসূদনকে তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করিতে হইয়াছে। কারণ, ইহাতে অভিনীত হওয়াই তাঁহার নাট্যরচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল। যে 'রত্নাবলী'র অনুবাদ নাটকখানি তাহাতে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইয়াছিল, তাহাই মধুসূদনের আদর্শ ছিল বলিয়া তিনি স্বাধীনভাবে 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' নূতন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সুতরাং উক্ত ত্রুটিগুলি যতখানি তাঁহার নিজস্ব, ততোধিক সমসাময়িক মঞ্চ-ব্যবস্থার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র আর একটি প্রধান ত্রুটি ইহার সুদীর্ঘ স্বগতোক্তির ব্যবহার। এই স্বগতোক্তির ব্যবহারও সংস্কৃত নাটকের অনুকরণেই ফল, পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুকরণের ফল নহে। কারণ, পাশ্চাত্ত্য নাটকের মধ্যে প্রধানত সেক্সপীয়রের নাটকের স্বগতোক্তির প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মধুসূদন ইহাতে তাহা ব্যবহার করেন নাই, বরং সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী স্বগতোক্তিই ব্যবহার করিয়াছেন। মঞ্চোপকরণের বাহুল্যের অভাবে সংস্কৃত নাটকের ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ স্বগতোক্তির মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইত, মধুসূদনও সেই ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন। গদ্য ভাষায় রচিত সুদীর্ঘ সংলাপগুলি কাহিনীর গতি শিথিল এবং আড়ষ্ট করিয়া রসস্ফূর্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র ভাষা নাটকীয় সংলাপের উপযোগী নহে, নাট্যকার সাধারণত তৎকালীন পণ্ডিতি বাংলাকে আদর্শ করিয়াই তাঁহার সংলাপ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু পণ্ডিতি বাংলার নাটকীয় সংলাপের ভাষা হইবার যোগ্যতা ছিল না। মধুসূদনের সম্মুখে সে দিন কথ্য ভাষার একটি আদর্শ থাকা সত্ত্বেও তিনি 'রত্নাবলী' নাটকের রামনারায়ণকৃত অনুবাদের ভাষার অনুকরণ করিতে গিয়াই এই বিষয়ে তাঁহার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রকৃতির সুদীর্ঘ বর্ণনাও ইহাতে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ হইতেই

আসিয়াছে, কিন্তু নাটকের স্বচ্ছন্দ গতি তাহাতে যে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা মধুসূদন ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই। পূর্ববর্তী নাট্যকারদিগের রীতি অনুসরণ করিয়া মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র সামান্য অংশে মাত্র পয়ার ছন্দে কবিতায় সংলাপের ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা মধুসূদনের পয়ার ছন্দ রচনার একটি নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে মাত্র, রচনার দিক দিয়া কোন উৎকর্ষ কিংবা সংলাপের ভাষা হিসাবে কোন উপযোগিতা লাভ করিতে পারে নাই।

৫

অনুকরণ-জাত রচনা

মধুসূদনের মধ্যে বাংলা রচনা বিষয়ে আত্মবিশ্বাস জন্মিবার পূর্বেই 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে তিনি নানা বিষয়ে অন্যের অনুকরণ করিয়াছেন। রামনারায়ণ-কৃত শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের বাংলা অনুবাদকেই তিনি এই বিষয়ে সর্বাধিক অনুকরণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুও উল্লেখ করিয়াছেন:

> বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার জন্যই শর্মিষ্ঠার উৎপত্তি। সেই একই রঙ্গমঞ্চ, সেই সকল অভিনেতা, সেই সমস্ত বেশভূষা। সুতরাং মধুসূদনকে স্বতঃই সে সকলের উপযোগী একখানি নাটক রচনার বিষয় চিন্তা করিতে হইয়াছিল। ইহার উপর বারম্বার রত্নাবলীর অভিনয় দর্শন করাতে তাহার ভাব তাঁহার হৃদয়ে এরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল যে কিছুতেই তাহা তিনি অপসারিত করিতে পারেন নাই।

সেইজন্যই দেখা যায়, 'রত্নাবলী' নাটকে যেমন বাসবদত্তা এবং রত্নাবলী দুইজনই নায়িকা, তেমনই 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'ও দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা উভয়েই নায়িকা। উভয় ক্ষেত্রেই নায়িকার চরিত্র রূপায়ণেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না, বাসবদত্তার চরিত্রের সঙ্গে যেমন দেবযানীর চরিত্রের সাদৃশ্য আছে, তেমনই রত্নাবলীর চরিত্রের সঙ্গেও শর্মিষ্ঠা চরিত্রের পরিপূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। বাসবদত্তা ক্রুদ্ধ-স্বভাবা এবং অভিমানিনী, দেবযানীও তাহাই এবং রত্নাবলী মুগ্ধা নায়িকা, শর্মিষ্ঠার সঙ্গে তাহার কোন পার্থক্য নাই। রূপের দিক দিয়াও উভয় নাটকেই কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার তুলনায় অনেক বেশি রূপবতী। এমন কি, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' শর্মিষ্ঠাকে যেমন জ্যেষ্ঠা দেবযানীর দাসীত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তেমনই 'রত্নাবলী' নাটকেও রত্নাবলীকে কিছুদিনের জন্য হইলেও রাণী

বাসবদত্তার দাসীত্ব বরণ করিতে হইয়াছিল। এমন কি, কনিষ্ঠা যাহাতে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হইতে না পারেন, সেইজন্য রত্নাবলী নাটকে বাসবদত্তা যেমন প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তেমনিই 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'ও দেবযানী অনুরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—উভয় ক্ষেত্রেই জ্যেষ্ঠাদিগের এই প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছিল। উভয় নাটকের কাহিনীর প্রথম অংশও সম্পূর্ণ অনুরূপ। কনিষ্ঠা নায়িকাকে দেখিবার পূর্বে নায়ক পত্নীর প্রতি সুগভীর আসক্ত, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কনিষ্ঠাকে দেখিবার পর হইতেই নায়কের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। মহাভারতের কাহিনী হইতে দেখা যায়, যযাতি দেবযানীকে যে দিন লাভ করেন, সেইদিনই শর্মিষ্ঠাকেও দেখিয়াছিলেন, তাহার বিষয়ে শুক্রাচার্য সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু 'রত্নাবলী' নাটকের প্রভাব-বশত মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং 'রত্নাবলী'র অনুকরণেই রাজা যযাতির সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সাক্ষাৎকার আরও পরের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শুক্রাচার্য রাজাকে শর্মিষ্ঠা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিবার ফলে রাজার উপর শুক্রাচার্যের অভিশাপ অনেকটা অহেতুক মনে হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও 'রত্নাবলী' নাটকের অনুকরণ করিতে গিয়া মধুসূদন শুক্রাচার্যের চরিত্রে এই ত্রুটি নিতান্তই অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছেন।

'রত্নাবলী নাটক' এবং 'শর্মিষ্ঠা নাটক' উভয়ের পরিণতিও সম্পূর্ণ অভিন্ন, উভয় নাটকেই দুই নায়িকা পরস্পর ঈর্ষা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নায়কের সঙ্গে সমানভাবে মিলিত হইয়াছেন। কনিষ্ঠা নায়িকা উভয় ক্ষেত্রে দুঃখ দুর্দশা হইতে মুক্তি পাইয়া মর্যাদার সঙ্গে পত্নীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তবে কাহিনীগুণের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, মহাভারতের কাহিনী, এমন কি, মধুসূদনও সেই কাহিনী যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা 'রত্নাবলী'র কাহিনী হইতে অনেক উৎকৃষ্ট। সুতরাং রত্নাবলীর

কাহিনীর পরিণতিতে যে রস অনুভূত হয়, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র মিলন-জাত রসের অনুভূতি তাহা অপেক্ষা অনেক গভীর।

'রত্নাবলী' নাটকে বিদূষকের চরিত্রের নাম বসন্তক, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' অনুরূপ বিদূষক চরিত্রের নাম মাধব্য। 'রত্নাবলী' নাটকের রাজমন্ত্রী যোগন্ধারয়ণ 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' রাজমন্ত্রী বলিয়াই পরিচিত। 'রত্নাবলী' নাটকের মত 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'ও দৌবারিক এবং রাণীদিগের সহচরী ইত্যাদির চরিত্র আছে।

এই প্রকার সামগ্রিক আলোচনা বাদ দিলেও 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র বহু বিচ্ছিন্ন অংশেও মধুসূদন 'রত্নাবলী' ব্যতীতও অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' প্রধান।

> রাজ। এ কি! আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হ'তে লাগল কেন? এ' স্থলে মাদৃশ জনের কি ফললাভ হতে পারে? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই মুক্ত রয়েছে। দেখি বিধাতার মনে কি আছে।

কণ্বের তপোবন প্রবেশ কালে দুষ্মন্ত যাহা বলিয়াছিলেন, যযাতি এখানে শর্মিষ্ঠার উদ্যানে প্রবেশ করিবার মুহূর্তে তাহাই বলিয়াছেন। তারপর বৃক্ষান্তরালে অবস্থান করিয়া রাজা দুষ্মন্ত যেমন তিন সখীর কথাবার্তা শুনিয়াছিলেন, এখানে রাজা যযাতি বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়া শর্মিষ্ঠার স্বগতোক্তি শুনিয়াছেন। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' কালিদাসের অনুবাদই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত অংশও কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র সপ্তমাঙ্কের একটি চিত্র এবং রচনাংশের অনুবাদ:

> (নেপথ্যে) — অয়ি দেবিকে! রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন গা? এমন দুরন্ত ছেলেদের শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য?

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে শকুন্তলার পুত্র ভরত সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে, এখানে শর্মিষ্ঠার পুত্রদের সম্পর্কেও সেই কথাই বলা হইয়াছে।

রাজার মধ্যে স্তিমিত ক্ষাত্র শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'ও তাহাই অনুসরণ করা হইয়াছে। তস্কর কর্তৃক ব্রাহ্মণের সর্বস্ব অপহৃত হইবার সংবাদ শুনিয়া এখানে যযাতির মধ্যে ক্ষাত্রতেজ আকস্মিক ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, অনুরূপ ভাবেই 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে দুষ্মন্তের মধ্যেও ক্ষাত্রশক্তি আকস্মিক ভাবে জাগ্রত হইয়াছিল।

৬

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র গুণ

আঙ্গিক অর্থাৎ নাট্যরূপ সংগঠনের মধ্য দিয়া 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র প্রধান গুণ প্রকাশ পাইয়াছে; বাংলা সাহিত্যে সুদৃঢ় কাহিনী সংবদ্ধ এবং সুগঠিত নাট্যরূপ হিসাবে ইহাই সর্বপ্রথম রচনা এবং ইহার কৃতিত্ব অবিসংবাদিত রূপে মধুসূদনের প্রাপ্য। সংস্কৃত নাটককে অনুকরণ করা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাট্যকাহিনীর শিথিলবদ্ধ রূপ ইহার নাই, ইহার গঠন প্রকৃতিতে ইংরেজি নাটকের আঙ্গিক সর্বপ্রথম সার্থকভাবে বাংলা নাটকে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বাংলা নাটককে ইংরেজি নাটকের আদর্শে কি ভাবে অঙ্কে ও দৃশ্যে বিভক্ত করিতে হয়, মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র মধ্য দিয়া তাহার একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। এই ধারাই পরবর্তী কাল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, মধুসূদন তাঁহার পরবর্তী নাটকগুলির ভিতর সেই ধারাকে স্পষ্টতর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই দিক হইতেও বাংলা নাট্যসাহিত্যে 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র একটি বিশেষ স্থান আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় পুনর্জাগরণের যুগে বাংলার সমাজের স্ত্রী-চরিত্রের যে নব-মূল্যায়ন দেখা দিয়াছিল, বাংলা নাটকে ইহার মধ্যে তাহার প্রথম সাহিত্যিক বিকাশ (literary expression) দেখা গিয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী নাটক ও প্রহসন যেমন 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটক' কিংবা 'বিধবা-বিবাহ নাটকে'র মধ্যে স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে সহানুভূতি যে ভাবেই প্রকাশ পাক না কেন, তাহা নাটকীয় রূপের মধ্য দিয়া সার্থকভাবে প্রকাশ পাইতে পারে নাই, অনেক ক্ষেত্রেই প্রচার-ধর্মী হইয়া আছে; কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' তাহা যথাযথ নাটকীয় পরিচয় লাভ করিয়াছে, ইহার মধ্যে প্রচার-ধর্মিতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান দুইটি চরিত্র

দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার মধ্য দিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে যে নূতন ভাবনা আমাদের সমাজে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা কোন বক্তৃতার ভিতর দিয়া নহে, সাহিত্যিক রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। নারীচরিত্রের যে শাশ্বত কতকগুলি শক্তি আছে, যাহা কেবল মাত্র অবস্থা-বৈগুণ্যের মধ্যে বিশেষ কোন যুগে কিংবা দেশে সীমাবদ্ধ নহে, মধুসূদন এই দুইটি স্ত্রীচরিত্রের মধ্য দিয়া তাহাই উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। কেবল মাত্র কুলীন-কন্যার কিংবা বাল-বিধবার সাময়িক দুঃখ-বেদনার কথা নহে, বরং শাশ্বত নারীচরিত্রের সর্বকালীন যাহা অনুভূতি, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই মধুসূদন তাঁহার স্ত্রীচরিত্র দুইটিকে গঠন করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর স্ত্রীচরিত্রের এখানেই প্রথম আবির্ভাব হইল। ইহারই ধারা তিনি তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া গেলেন, সুতরাং দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা চরিত্র দুইটির মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রমীলা চরিত্রের এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বীরাঙ্গনা চরিত্রগুলির বীজ প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে মহাভারতের কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া তাঁহার নাটকে স্ত্রীচরিত্রগুলি রূপায়িত করিতে গেলে যে তাহা কদাচ সার্থক হইতে পারিত না, মধুসূদন তাহা বুঝিয়াছিলেন; সেইজন্য তিনি শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানীকে মহাভারতের উপাদানে গঠন না করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের প্রেরণা অনুযায়ী পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানীর চরিত্র উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ বাঙ্গালী সমাজের নবযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম পাশ্চাত্ত্য আদর্শে দীক্ষিত স্ত্রীচরিত্র। নানা অনুকরণকে স্বীকার করিয়াও তিনি যে ইহাদের মধ্যে নূতন চেতনা সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা মধুসূদনের প্রতিভার অন্যতম বিস্ময় শক্তি বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

'শর্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত হইবার পূর্বে বাংলার নাট্যসাহিত্য গ্রাম্যতা এবং অশ্লীলতা হইতে মুক্ত ছিল না। এমন কি, যে মহাভারতের

কাহিনী মধুসূদনের অবলম্বন ছিল, তাহারও কোন কোন অংশ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর রুচিকে আঘাত করিবার মত ছিল, মধুসূদন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই সকল উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নূতন যুগের বাংলা সাহিত্যের যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যে 'রত্নাবলী' নাটক মধুসূদনের আদর্শ ছিল, তাহাও সকল দিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজের রুচির অনুগামী ছিল না, মধুসূদন তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহাকে অনুকরণ করিবার সময় যাহা উন্নত রুচি এবং নীতির পরিপোষক, তাহাই ইহাতে রক্ষা করিয়াছেন, প্রাচীন রুচির পরিপোষক অংশ মাত্রই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনার মধ্য দিয়াই বাংলা নাট্যসাহিত্য যেমন প্রথম গ্রাম্যতা হইতে মুক্ত হইয়া আসিল, তেমনই এই বিষয়ে একটি সুস্থ এবং সুনির্মল আদর্শও প্রতিষ্ঠা করিল।

একটি মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কবি বাল্মীকি-বেদব্যাস এবং কালিদাসকে নূতন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, নবজাগরণের যুগের প্রত্যেক জাতির তাহাই লক্ষ্য থাকে। তিনি তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র প্রস্তাবনায় উল্লেখ করিয়াছিলেন :

কোথায় বাল্মীকি ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে বিষ-বারি পান করে,
তাহে হয় তনু-মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো মা-গো, বিভু স্থানে এই মাগো,
স্বরসে প্রবৃত্ত হোক তব তনয়-নিচয়।

ইহা কেবলমাত্র মধুসূদনের কথার কথা ছিল না, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের উচ্চ আদর্শকে, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাসকে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট প্রতিষ্ঠিত

করিবার দুরূহ দায়িত্ব যে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রথম প্রয়াস 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালীও যে বেদব্যাসের নিকট হইতে সার্থক প্রেরণা লাভ করিতে পারে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'শর্মিষ্ঠা নাটক'ই তাহার প্রথম প্রমাণ। ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়াও অধঃপতিত রুচি এবং আদিরসের ব্যভিচার হইতে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করিবার জন্য 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'ই প্রথম সার্থক প্রয়াস দেখা দিয়াছিল।

মহাভারতের যে অংশ হইতে মধুসূদন তাঁহার নাট্যকাহিনী নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাহা উচ্চাঙ্গ নাটকীয় সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল। এমন কি, যে 'রত্নাবলী নাটক' মধুসূদন আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, মধুসূদনের নির্বাচিত শর্মিষ্ঠার কাহিনী তাহা অপেক্ষা অধিকতর নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। ইহার মধ্যে দুইটি বিরুদ্ধ স্বার্থের যে সংঘাত সৃষ্টির অবকাশ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা রত্নাবলীর কাহিনীর স্বার্থসংঘাত অপেক্ষাও শক্তিশালী। 'রত্নাবলীর' সাগরিকা বা রত্নাবলীর চরিত্র কল্পিত চরিত্র, তাহার কোন ঐতিহ্য নাই; কিন্তু মধুসূদনের নায়িকা দুই জনের চরিত্র মহাভারতের দুই শক্তিশালী ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, একজন দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা, আর একজন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। মহাভারতের সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় উভয়ের ব্যক্তিস্বার্থে যে সংঘাত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার শক্তি অপরিসীম হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য বিক্ষোভও ইহার মধ্যে উচ্চ নাটকীয় গুণ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা উভয়েই ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন চরিত্র; সেইজন্য তাহাদের স্বার্থের সংঘর্ষ সহজেই নাট্যগুণান্বিত হইয়াছে। সুতরাং 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র কাহিনী নির্বাচনে মধুসূদন যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার আদর্শ নাটক 'রত্নাবলী'র রচয়িতা দেখাইতে পারেন নাই।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যেও শুক্রাচার্যের মত এত প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কোন চরিত্র 'রত্নাবলী' নাটকে নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্বই নাট্যকাহিনীকে সর্বত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সুতরাং 'শর্মিষ্ঠা নাটক' কেবলমাত্র যে স্ত্রীচরিত্র-প্রধান নাটক হইয়াছে, তাহা নহে, ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর চরিত্রের মধ্য দিয়া সার্থক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিবার ফলে ইহা নানা রসে বিচিত্র হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

*

৭

অলৌকিকতা

পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অলৌকিকতার স্থান থাকিলেও রোমান্টিক কিংবা বাস্তবধর্মী নাটকে অলৌকিকতার কোন স্থান নাই। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' মহাভারত হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়া রচিত হইলেও, ইহা পৌরাণিক নাটক নহে; কারণ, পৌরাণিক নাটকের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ ভক্তি কিংবা ধর্মের জয় প্রচার, তাহা ইহার লক্ষ্য নহে। ঈর্ষা এবং প্রেমই ইহার মুখ্য বিষয়—ইহারা উভয়ই মানবিক গুণ, কোন দৈবী গুণ নহে। সুতরাং রোমাণ্টিক পরিবেশের মধ্য দিয়া মানবিক গুণের বিকাশই ইহার লক্ষ্য, ধর্ম কিংবা নীতি প্রচার ইহার লক্ষ্য নহে। অথচ 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র একটি প্রধান ঘটনা অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে পারে, তাহা হইতেছে শুক্রাচার্য কর্তৃক যযাতির প্রতি জরাগ্রস্ত হইবার জন্য অভিশাপ। ইহাকে অন্য কোনদিকে দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের দুর্বাসার অভিশাপকে রবীন্দ্রনাথ রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যা যে অতীব সার্থক হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং দুর্বাসার অভিশাপের মত আপাত দৃষ্টিতে অলৌকিক বিষয় 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে থাকা সত্ত্বেও তাহা উচ্চ সাহিত্যগুণ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। যযাতির প্রতি শুক্রাচার্যের অভিশাপকেও তেমনই রূপক হিসাবেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। একান্ত ভোগাসক্ত রাজা স্বাভাবিক নিয়মেই অকালে জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, শুক্রাচার্যের অভিশাপ একটি উপলক্ষ মাত্র, এই উপলক্ষকেই রূপক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র আরও একটি বিষয় অলৌকিক বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, তাহা পুত্র পুরুর যৌবনের সঙ্গে পিতা যযাতির জরার বিনিময়। ইহাকেও রূপক হিসাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। ভোগাসক্ত যযাতি কোন দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন, তাহাকে কেহই পরিচর্যা করিতে স্বীকৃত হইল না, একান্ত ভোগাসক্তির জন্য তাহার প্রতি কাহারও সহানুভূতি ছিল না। সদ্য যৌবনে উত্তীর্ণ কনিষ্ঠ পুত্র ভাবাবেগ বশতঃ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত পিতার পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিল, তাহার ফলে পিতা আরোগ্য লাভ করিয়া পূর্ণস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেও পুত্র পুরু সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া জরাগ্রস্ত হইল। ইহা স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়াছে, শুক্রাচার্যের অভিশাপ বেদব্যাসের রূপক মাত্র। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে দুর্বাসার অভিশাপও তাহাই ছিল।

নাটকে অলৌকিকতার ব্যবহার কিছুই নূতন নহে। সেক্সপীয়রের নাটকের অশরীরী চরিত্রের আবির্ভাব তাহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। তবে দেখিতে হইবে, অলৌকিক ঘটনাবলী দ্বারা কাহিনীর ধারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে কি না; যদি তাহা হয়, তবে নাটক হিসাবে ত্রুটি প্রকাশ পায়। যদি তাহা না হয়, অলৌকিক ঘটনাবলী যদি কাহিনীর বাহ্য অলঙ্কার মাত্র হইয়া থাকে, তবে তাহা কদাচ ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ রোমাণ্টিক ধর্মী নাটকে অলৌকিক ঘটনা এবং চিত্র মাত্রই রূপক রূপেই ব্যবহৃত হয়, সেই রূপক যখন সার্থক হয়, তখন তাহাও অলৌকিক বলিয়া ভুল হইতে পারে না; কিন্তু তাহা অক্ষম লেখকের হাতে পড়িয়া যদি সার্থকতা লাভ করিতে না পারে, তবেই তাহা কোন কোন সময় অলৌকিক বলিয়া ভুল হয়। মহাভারতের কাহিনীতে শুক্রাচার্যের অভিশাপ কিংবা পুরু কর্তৃক পিতার জরা গ্রহণ যে রূপক মাত্র, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে' শুক্রাচার্যের চরিত্র থাকিলেও তাঁহার অলৌকিক সাধন-ভজনের কোন উল্লেখ নাই। সাধারণ স্নেহশীল পিতা রূপেই

তিনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার আচার-আচরণে কোন অলৌকিতা নাই। একটি মাত্র ক্ষেত্রে তিনি যে সমাধিস্থ হইয়া কন্যার মনোভাব জানিতে পারিয়াছিলেন (১।২), সে কথা নিজের মুখে উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, তাঁহার সমাধিস্থ হইবার রূপটি নাট্যকার আমাদিগকে প্রত্যক্ষ করান নাই। এমন কি, সমাধি দ্বারা তিনি কন্যার মনোভাবটি জানিতে পারিলেও কাহাকে যে কন্যা পতিত্বে বরণ করিতে চাহে, তাহা জানিতে পারেন নাই। কন্যার মনোভাবের পরিবর্তন অনুভব করিবার জন্য কোন পিতার সমাধিস্থ হইবার প্রয়োজন হয় না, তাহা সকলেই অমনিই অনুভব করিতে পারেন। সুতরাং এই উক্তিটিও এখানে রূপক মাত্র।

*

৮

বাঙ্গালীত্ব

মধুসূদনের মানসিকতার মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন চর্চার প্রভাব এত প্রবল ছিল যে, মহাভারতের কাহিনী রচনা করিতে গিয়াও তিনি তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। শুক্রাচার্যকে তিনি বাংলা দেশের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত করিয়াই অঙ্কিত করিয়াছেন; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, যযাতির হস্তে দেবযানীকে সমর্পণ করিবার পর তিনি বলিতেছেন 'এ'ক্ষণে কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম (১।২)।' যেন ইহার পূর্বে তিনি কন্যাদায়ের জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। মহাভারতে কিন্তু ইহার ইঙ্গিতটুকু মাত্রও নাই।

বাঙ্গালী জননী যেমন শিশু ঘুম হইতে অকস্মাৎ উঠিয়া পড়িলে সকল সাংসারিক কর্তব্য ফেলিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া যায়, দেবযানী সাম্রাজ্ঞী হওয়া সত্ত্বেও তেমনই একদিন রাজার সান্নিধ্য হইতে সহসা ছুটিয়া গিয়া তাঁহার শিশুপুত্রের শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। শিশুপুত্র যদুর যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তাহা বিদূষকের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন:

রাজ্ঞী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়! আমার যদুর নিদ্রাভঙ্গ হ'য়েছে নাকি? (রাজার প্রতি) জীবিতেশ্বর! তবে আমি এখন বিদায় হই।

ইহা দ্বারা দেবযানীর বাঙ্গালী জননী-সুলভ যে বাৎসল্যবোধেরই পরিচয় প্রকাশ পাক না কেন, রাজমহিষীর আভিজাত্য যে রক্ষা পাইতে পারে নাই, তাহা মধুসূদন বুঝিতে পারেন নাই।

বিদূষকের সংলাপের ভিতর দিয়াও নানা স্থানে নাট্যকার মধ্যে মধ্যে এমন আচার-আচরণ এবং বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ (idiom) ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা একান্তভাবে বাঙ্গালী জীবনের পক্ষেই সম্ভব। তাহাদের মধ্যে পুরুষকে ভেড়া করিয়া রাখার কথা, তাহার

মুখে নিতান্ত গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। বিদূষকের এই পরিকল্পনাটি পরবর্তীকালে বহু বাঙ্গালী নাট্যকারের বিদূষক চরিত্র-পরিকল্পনায় প্রেরণা দিয়াছে, ইহাদের মধ্যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকের বিদূষক চরিত্রের মধ্যে বাঙ্গালী-জীবন সুলভ যে গ্রাম্যতা এবং আচার ও আচরণের মধ্যে যে স্থূলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রেরণা মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র বিদূষক চরিত্রের মধ্যেই পাইয়াছিলেন।

শুক্রাচার্যের কন্যার প্রতি স্নেহের মধ্যে বাঙ্গালী পিতার যে হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করা যায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, তাহার ফলেই তিনি স্নেহে যতখানি বিগলিত হইয়াছেন, কর্তব্যে তত কঠোর হইতে পারেন নাই।



৯

চরিত্র-বিচার

ঘটনা বিন্যাস এবং চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতার মধ্য দিয়াই নাটকের সার্থকতা। এই সার্থকতা ইতিপূর্বে বাংলা নাটকে কেবলমাত্র আংশিক দেখা গিয়াছে, পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা এ পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় নাই। ইতিপূর্বে বাংলা নাটকে যে সকল চরিত্র সৃষ্টি দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশই type বা আদর্শ চরিত্র মাত্র, অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং রক্তমাংসের স্পন্দন অনুভব করা যায় না। এমন কি, যেখানে রক্তমাংসের স্পন্দনও অনুভব করা যায়, সেখানে নাটকীয় চরিত্ররূপে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। নাটকীয় চরিত্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে তাহারা কোথাও স্থির হইয়া বসিয়া নাই, ইহারা ঘটনার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আসিয়া না পৌঁছান অবধি অবিরাম চলিয়াছে। এই চলার ভিতর দিয়া জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইয়াছে এবং এই চলমান জীবন-ধারার ভিতর হইতেই দর্শক এবং পাঠক সমাজ এই বিষয়ে নিজেদের অন্তর্নিহিত জীবনবোধকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইতেছে। ইতিপূর্বে যে সকল নাটক বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই নাটকের পরিবর্তে নাট্য-চিত্র, চিত্র বলিয়াই তাহারা স্থির; যাহা, স্থির, তাহার মধ্য হইতে জীবন-সম্পর্কে কোন চেতনা উপলব্ধি করা যায় না, নাট্য-চিত্রের মধ্য হইতেও তেমনই জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না। নাটকের চরিত্রগুলি জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু নাট্য-চিত্র সেই ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং নাটকীয় চরিত্রের মধ্য দিয়াই নাটকের সার্থকতা, নাট্য-চিত্রের মধ্য দিয়া নহে। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' আমরা সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে নাট্য-চিত্রের পরিবর্তে

নাটকীয় চরিত্রের সন্ধান পাই। এই বিষয়ে চারিটি চরিত্রই উল্লেখযোগ্য—শুক্রাচার্য, যযাতি এবং দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা। তাহাদের বিষয় একটু বিস্তৃত করিয়া আলোচনার যোগ্য।

দৈত্যগুরু

'শর্মিষ্ঠা নাটকে' দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের চরিত্র প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্র হইলেও তাহা অপত্য-স্নেহের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। ব্যক্তিত্ববোধ এবং অন্যের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবার প্রবৃত্তির মধ্যে চরিত্রের গুণগত বিরোধ প্রকাশ পায়, তবে এই উভয়ের সমন্বয়ে শুক্রাচার্যের চরিত্র গঠিত হইলেই ইহা সার্থক নাটকীয় চরিত্র হইতে পারিত। শুক্রাচার্য যদি অবিমিশ্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্র হইতেন, কন্যার প্রতি তাঁহার স্নেহবোধ না থাকিত, তবে নাটকীয় চরিত্র হিসাবে শুক্রাচার্য সার্থকতা লাভ করিতে পারিতেন না, আদর্শ চরিত্র হইয়া রক্তমাংসের সম্পর্ক বিবর্জিত হইতেন, কন্যার প্রতি একান্ত স্নেহবোধই তাঁহাকে মর্ত্যের মাটিতে টানিয়া নামাইয়াছে, নতুবা তিনি তপস্যার ভাবলোকই চিরকাল বিরাজ করিতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শুক্রাচার্যের একটি বিশেষ দায়িত্ব ছিল। তিনি দৈত্যগুরু, তাঁহার প্রসাদেই দৈত্যকুলের শক্তি, তাহার অপ্রসন্নতায় দৈত্যকুলের বিনাশ। সুতরাং দৈত্যকুলের স্বার্থের সঙ্গে যখন তাঁহার সন্তান-স্নেহের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন অন্ধ স্নেহের বশবর্তী হইয়া যদি তিনি দৈত্যকুলের সর্বনাশ সাধন করেন, তবে তাঁহার চরিত্র উচ্চ ব্রাহ্মণ্য মর্যাদা হইতে বিচ্যুত হয়। এখানেও শুক্রাচার্যের মধ্যে কর্তব্যবোধ এবং স্নেহবোধের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সুযোগ ছিল, কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' নাট্যকার শুক্রাচার্যের চরিত্রের সেই উচ্চ মর্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া মনে হইবে না। অন্ধ সন্তান স্নেহবোধই তাঁহার চরিত্রটিকে এখানে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। এক্ষণে দৈতরাজকন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দৈত্যগুরুকন্যা দেবযানীর নিতান্ত সাধারণ একটি স্ত্রীজাতিসুলভ ব্যক্তিগত কলহের সঙ্গে সমগ্র দৈত্য-ভূমির ভাগ্যাভাগ্য জড়িত হইয়া গিয়াছিল। শুক্রাচার্য তাঁহার

ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া তাঁহার কোপন-স্বভাবা প্রতিহিংসাপরায়ণা কন্যার হাতের ক্রীড়নক হইয়াছেন বলিয়া অনুভূত হইবে। তিনি তাহারই প্ররোচনায় রাজকুমারীকে এক কথায় তাঁহার কন্যার চিরকালের দাসী হইয়া জীবন কাটাইবার জন্য রাজার নিকট দণ্ড প্রার্থনা করিলেন। নিরুপায় দৈত্যরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন। ইহাতে শুক্রাচার্যের কন্যাস্নেহের যে গভীরতাই প্রকাশ পাক, তাঁহার চরিত্রের মহিমা বাড়িল না।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে' শুক্রাচার্যের মহিমা আরও কতকগুলি দিক হইতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অন্ধ কন্যাস্নেহের বশবর্তী হইয়া রাজা যযাতিকে জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ দিবার মধ্যেও শুক্রাচার্যের গৌরব লাঘব হইয়াছে। যযাতি ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া শর্মিষ্ঠাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিয়া যে কোন অপরাধ করেন নাই, তাহা শুক্রাচার্য নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি কন্যার আব্দার—স্বামী যাহাতে শর্মিষ্ঠাকে লইয়া ভোগ-জীবন যাপন করিতে না পারে, সে জন্য তাহাকে জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ দিতে হইবে। শুক্রাচার্য রাজা যযাতিকে পরম ধর্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ বলিয়া জানেন, তথাপি কন্যা দেবযানীর আব্দার—তাহাকে অভিশাপ না দিলে তিনি 'যমুনা সলিলে প্রাণত্যাগ' করিবেন। শুক্রাচার্য শেষ পর্যন্ত 'অপত্যস্নেহের কি অদ্ভুত শক্তি' এই কথা স্মরণ করিয়া তাহারই বশীভূত হইয়া ব্যক্তিত্ব, বিচার এবং বিবেচনা সমস্তই বিসর্জন দিলেন, তাঁহার অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলেন।

মহাভারতকার শুক্রাচার্যকে এই ক্ষেত্রে রক্ষা করিয়াছেন; তাহাতে কন্যার আব্দার রক্ষার জন্যই যে তিনি যযাতিকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহা নহে, শুক্রাচার্যের একটি আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন মহাভারতকার এইরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন। যখন দেবযানীকে যযাতির হাতে সমর্পণ করেন, তখন শুক্রাচার্য যযাতিকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন শর্মিষ্ঠাকে কদাচ বিবাহ না করেন,

যযাতি শুক্রাচার্যের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেইজন্য শুক্রাচার্যের অভিশাপ তাহার প্রাপ্য। কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' মহাভারতের এই কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহা পরিত্যাগ করিবার ফলে শুক্রাচার্যের অগৌরব যে বাড়িয়া যায়, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র নাট্যকার তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। এখানে মহাভারতের পরিকল্পনা অধিকতর সার্থক।

মহাভারতের যযাতি এবং 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র যযাতি চরিত্রের মধ্যে সুদূর পার্থক্য রহিয়াছে। মহাভারতের যযাতি জিতেন্দ্রিয়, ন্যায়পরায়ণ রাজা; কিন্তু মধুসূদনের পরিকল্পিত যযাতির চরিত্র লালসার দাস মাত্র। মহাভারতের

যযাতি

যযাতিকে এমন কি, যখন শুক্রাচার্যও তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখনও তিনি বলিলেন, 'ভগবান্! ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ-নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলে বর্ণ-শঙ্কর জনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি।' তারপর শুক্রাচার্য যখন তাহাকে অধর্ম হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য বর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, তখনই তিনি দেবযানীর পাণি-গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। ইহার পূর্বে দেবযানী কিংবা শুক্রাচার্য কাহারও অনুরোধে তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। মধুসূদন যযাতিকে এই গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়া, তাহাকে প্রথম হইতেই লালসার দাসরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার চরিত্র শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটক এবং 'রত্নাবলী' নাটকের নায়ক চরিত্রানুযায়ী হইলেও মহাভারতের ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির চরিত্র অনুযায়ী পরিকল্পিত হইতে পারে নাই।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র আলোচনায় লিখিয়াছেন, "'শর্মিষ্ঠা-নাটকে'র যযাতিকে দেখিয়া আমরা মহাভারতের ইন্দ্রিয় দাস রাজা যযাতিকে কিয়ৎপরিমাণে বিস্মৃত হই (পৃ. ২৩৮, ৫ম সং)।"

কিন্তু মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কে যাঁহার সামান্যতম জ্ঞানও আছে, তিনি কখনও এই কথা সমর্থন করিবেন না, বরং তাঁহাদের মনে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই উদয় হইবে। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র যযাতিই ইন্দ্রিয় দাস, মহাভারতের যযাতি জিতেন্দ্রিয়। মহাভারতের কাহিনী বিষয়ক এই শ্রেণীর অজ্ঞতা দূর করিবার জন্যই মহাভারতের শর্মিষ্ঠা কাহিনী বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি। মধুসূদন রাজা যযাতিকে যে দেবযানীর নিকট কতবড় বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞ রূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কটি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। রাজা দেবযানীর নিকট সুগভীর প্রণয় প্রকাশ করিবার পরমুহূর্তেই যখন দেবযানী 'যত্বর নিদ্রাভঙ্গ হ'য়েছে নাকি' তাহা জানিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন, তৎক্ষণাৎ সেই একই দৃশ্যে বিদূষকের নিকট ক্ষণমাত্র দৃষ্ট শর্মিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'আহা সখে, তাঁর (দেবযানীর) সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা আর কি বল্‌বো।……তার মধুর অধরকে রতি-সর্বস্ব বল্লেও বলা বলা যেতে পারে।'

ইহা কেবলমাত্র যযাতি চরিত্রের লাম্পট্যেরই পরিচায়ক নহে, মহাভারতের ক্ষত্রিয় চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। মধুসূদন 'রত্নাবলী' নাটকের অনুকরণে মহাভারতের কাহিনী গ্রহণ করিয়া একটি ভুল করিয়াছেন যে, তিনি রত্নাবলীর কাহিনী ও শর্মিষ্ঠার কাহিনীর অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। 'রত্নাবলী' নাটকের কোন চরিত্র মহাভারতের চরিত্র ছিল না বলিয়া তাহাদের রূপায়ণে নাট্যকারের যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ছিল, শর্মিষ্ঠা নাটকের চরিত্র রূপায়ণে মধুসূদনের সেই স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু মধুসূদন এই কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র চরিত্রগুলিকে 'রত্নাবলী' নাটকের ছাঁচে ঢালাই করিতে গিয়া মহাভারতের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র যযাতি দেবযানীকে ভয় করেন, কিন্তু ভালবাসেন না, শর্মিষ্ঠাকে ভালবাসেন, তাহাকে ভয় করেন না।

দেবযানীর প্রতি প্রেম তাহার সত্য নহে, শর্মিষ্ঠার প্রতি প্রেমও তাহার রূপজ মোহ জাত ছিল, কিন্তু শর্মিষ্ঠার সন্তানের আত্মত্যাগে পিতার মোহমুক্তি ঘটিয়াছিল।

দৈত্যগুরুকন্যা

এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মহাভারতের পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র পুরুষ চরিত্র নিকৃষ্ট হইলেও মহাভারতের স্ত্রীচরিত্রগুলি অপেক্ষা শর্মিষ্ঠা নাটকের স্ত্রীচরিত্রগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাসুলভ স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কিত শ্রদ্ধাবোধেরই ফল। মহাভারতের মধ্যে দেবযানী স্বয়ং উপযাচিকা হইয়া যযাতির পাণি-প্রার্থনা করিয়াছেন, যযাতির পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পিতাকে দিয়াও নির্লজ্জভাবে তাঁহার নিকট বিবাহের জন্য অনুনয়-বিনয় করিয়াছেন, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' দেবযানী প্রথম দর্শনের পরই যযাতির প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজে এই বিষয়ে উপযাচিকা হইতে যান নাই, সহচরীর মধ্যস্থতায় এবং পিতার সাহায্যে উভয়ের পরিণয় স্বাভাবিক ভাবেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের প্রণয়োপাখ্যানের সঙ্গে এই কাহিনীর কোন পার্থক্য অনুভব করা যাইবে না। কিন্তু দেবযানী অত্যন্ত কোপন-স্বভাবা এবং এই বিষয়ে একেবারেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা। রাজা শর্মিষ্ঠাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছেন জানিয়া স্বামীর মৃত্যু কামনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, 'এমন পতি থাকা না থাকা দুইই তুল্য ;...সখি! আমাকে তুমি সধবা বল কেন? আমার কি স্বামী আছে?' স্বামীর সম্পর্কেও এই উক্তি কেবলমাত্র হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা নারীর পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার পতিনিন্দার জন্য সন্তান স্নেহাতুর শুক্রাচার্যও তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাহার রসনায় কিছুমাত্র সংযম নাই। তিনি পিতার নিকট হইতে স্নেহই পাইয়াছেন, শিক্ষা পান নাই; যত্নই পাইয়াছেন, শাসন পান নাই, তাহারই স্বাভাবিক পরিণাম যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। চরিত্রটির বাস্তবধর্মিতা অনস্বীকার্য। কেবলমাত্র শেষ দৃশ্যে যেখানে 'শর্মিষ্ঠার

কর গ্রহণ করিয়া' শর্মিষ্ঠাকে বলিতেছেন, 'প্রিয় সখি! আমার সকল দোষ মার্জনা কর!...এখন এসো, দুইজনেই পতি সেবায় কিছুদিন সুখে যাপন করি,' এইখানেই কেবলমাত্র তাঁহার মধ্যে আদর্শের প্রভাব অনুভব করা যায়।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে' শর্মিষ্ঠার চরিত্রই মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা সার্থক সৃষ্টি। অন্তরের সমগ্র সহানুভূতি নিঃশেষ করিয়া তিনি শর্মিষ্ঠাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুসূদন তাঁহার নিজের কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন শর্মিষ্ঠা। দৈবলাঞ্ছিত

দৈত্যরাজকন্যা

চরিত্রের প্রতি মধুসূদনের সহানুভূতির ভাব তাঁহার বাংলা রচনায় ইহাতেই সর্বপ্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। মহাভারতের মধ্যেও শর্মিষ্ঠা চরিত্রের দুইটি রূপ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে,—দেবযানীর দাসীত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত তাহার এক রূপ, দাসীত্ব গ্রহণ করিবার পর হইতে তাহার সম্পূর্ণ আর একরূপ। প্রথমত শর্মিষ্ঠা রাজকুমারী ক্রীড়াময়ী, হাস্যচপলা, পরিহাস-প্রিয়া, দেবযানীর সঙ্গে তাহার কলহের মধ্যে রাজকুমারীরূপে তাহার আত্মসচেতনতাও প্রকাশ পাইয়াছে। মধুসূদন তাঁহার নাটকে শর্মিষ্ঠার জীবনের এই অংশটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই; কারণ, তাঁহার জীবনের এই অংশটি তিনি নাট্য-ক্রিয়ার মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন নাই, বরং তাহার পরিবর্তে অন্যের মুখের বর্ণনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ এই অংশকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়া তাহার পরবর্তী অংশের সঙ্গে ইহার সার্থক বৈপরীত্য সৃষ্টি করিতে না পারিলে শর্মিষ্ঠা চরিত্রের উপর যথার্থ সহানুভূতির ভাব জাগ্রত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা চরিত্রে'র উপর পাঠকের সহানুভূতি সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, এ কথা বলিতে পারা যাইবে না। কোপন-স্বভাবা চরিত্র দেবযানীর পার্শ্বে তাহার শান্ত স্বভাবের চরিত্রটি নাটকের বৈপরীত্য সৃষ্টি করিতেও সমর্থ হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

দুঃখকে জীবনে স্বীকার করিয়া লইবার শক্তি শর্মিষ্ঠার ছিল। শর্মিষ্ঠার জীবনের দুঃখকে মধুসূদন দৈব-প্রদত্ত দুঃখ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। দেবযানী যখন তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তখনও তিনি, যে বলিয়াছেন, 'এ' সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়, ইহা তাহার মুখের কথা মাত্র নহে, মনেরও কথা; শুধু তাহাই নহে, ইহা তাহার জীবনেরও অভ্যাস।

সংযম এই চরিত্রটির আর একটি প্রধান গুণ। মহাভারতের শর্মিষ্ঠা চরিত্রের মধ্যে সংযমের অভাব অনুভব করা যায়, মধুসূদন তাঁহাকে এই বিষয়ে শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন।

একটি মাত্র ক্ষেত্রে শর্মিষ্ঠা রাজার মুখে দেবযানীর নাম শুনিয়া রাজার প্রতি যে অভিমান প্রকাশ করিয়াছে (৪।৩), তাহার মধ্য দিয়া শর্মিষ্ঠা চরিত্রটি নিরবচ্ছিন্ন আদর্শের বাহন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাহার মন যতই উদার হউক, ক্ষুদ্র মানবিক অনুভূতি হইতে যে সে বঞ্চিতা নহে, তাহাই ইহার মধ্য দিয়া প্রমাণিত হইয়া তাহার রক্তমাংসের সত্তাকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে। ইহা চরিত্র-সৃষ্টির ত্রুটি নহে, বাস্তব জীবনবোধের অনুভূতি মাত্র।

ভাষা

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র ভাষা সম্পর্কে মধুসূদনের জীবন-চরিত রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, 'ইহার ভাষা নাটকোপযোগী না হইলেও, তাহাতে কবিত্বের অথবা মাধুর্যের অভাব নাই।' এই উক্তির সমর্থনে অতঃপর তিনি রাজা যযাতি কর্তৃক একটি উদ্যান-শোভার সুদীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্ণনাটি পাঠ করিলে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পাঠক তাহাতে কবিত্ব কিংবা মাধুর্যের কিছু মাত্র সন্ধান পাইবেন, তাহা নহে; ইহা সংস্কৃত ভাষায় গতানুগতিক প্রকৃতি-বর্ণনার একটি চিত্র মাত্র, ভাষা কিংবা চিত্রের অভিনবত্ব ইহাতে কিছুই নাই। অথচ সেই যুগের পণ্ডিত সমাজ ইহাকেই আদর্শ গদ্য রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করিবার পূর্বেই বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষা বাংলা সাহিত্য রচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; এমন কি, তাহার মধ্যে যে মাধুর্য প্রকাশ পাইয়াছে, মধুসূদন কর্তৃক 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' ব্যবহৃত গদ্যসংলাপে সেই মাধুর্যও প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সুতরাং মনে হয়, মধুসূদন এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর কিংবা অক্ষয় দত্তের ভাষার অনুকরণ করেন নাই।

মধুসূদন কর্তৃক 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচিত হইবার পূর্বেই কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র বিষয়-বস্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত মহাভারতের গদ্যানুবাদ হইতেই লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়ে যে তিনি কাশীরাম দাসকে অনুসরণ করেন নাই, তাহা তাঁহার কাহিনী-পরিকল্পনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র গদ্য সংলাপ রচনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনূদিত

মহাভারতের বাংলা গদ্য ভাষা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন ইহাকেই মধুসূদন আদর্শ গদ্যের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই গদ্য ভাষা যে প্রকৃতই মধুর কিংবা কবিত্বপূর্ণ ছিল, তাহা নহে, তবে ওজঃগুণসম্পন্ন ছিল; মহাভারতের অভিজাত বিষয়-বস্তু বর্ণনার মত তাহার যথার্থ শক্তি ছিল।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে' কোন ইতর শ্রেণীর চরিত্র নাই, সেইজন্য রামনারায়ণ তর্করত্ন যেমন এক ভৃত্য চরিত্রের মুখে ইতর শ্রেণীর গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, মধুসূদন ইহার মধ্যে তাহার সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। তবে একমাত্র বিদূষকের চরিত্রের মধ্য দিয়া ইতর শ্রেণীর ব্যবহৃত দুই একটি গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সাধারণ ভাবে বিদূষকও পণ্ডিতি বাংলার অনুরূপ ভাষাই ব্যবহার করিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে,

বিদূ। (জনান্তিকে রাজার প্রতি) বয়স্য, দেখুন! মলয় মারুতের স্পর্শ-সুখানুভবে সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এ'রাও সেইরূপ মনোহর রূপে নেচে নেচে আ'সচে।

এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'শর্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বাংলা গদ্য ভাষার যুগান্তকারী সৃষ্টি 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইয়াছে, মধুসূদন তাহা দ্বারা 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হ'ন নাই। তবে এই কথাও এখানে অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, রামনারায়ণ অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের গদ্য সংলাপের ভাষা আদর্শরূপে সে দিন গৃহীত হইয়াছিল। 'রত্নাবলী' নাটকেও আলালী ভাষার কোন প্রভাব অনুভব করা যায় না।

ভাষার ব্যবহারে আদ্যোপান্ত 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র প্রায় একটি সমতা আছে। সম্ভ্রান্ত চরিত্রের স্ত্রীপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের

মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তবে বিদূষকের মুখে দুই একটি গ্রাম্য শব্দ শোনা গিয়াছে মাত্র; কিন্তু তাঁহারও বাক্য আনুপূর্বিক গ্রাম্য শব্দ দ্বারা গঠিত হয় নাই। সুতরাং সংস্কৃত নাটকে চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের যে রীতি গৃহীত হইয়া থাকে, মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' সেই রীতি গ্রহণ করেন নাই।

*

দুই। 'পদ্মাবতী নাটক' [১৮৬০]

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের দুই বৎসর পর মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটক রচিত হয়; গ্রীক্ পুরাণের একটি কাহিনী এই নাটকের ভিত্তি। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রহসন দুইখানি রচিত হইয়াছিল, তাহাদের বিষয় পরে আলোচিত হইবে। 'পদ্মাবতী' 'শর্মিষ্ঠা' হইতে নিকৃষ্ট। শুধু তাহাই নহে, 'পদ্মাবতী নাটক' মধুসূদনের নিকৃষ্টতম নাট্যরচনা। কাহিনীগত বৈচিত্র্যের অভাবের জন্য যে ইহাকে নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে, তাহা নহে, বরং কাহিনীর নাট্যিক বৈচিত্র্য তাঁহার অন্যান্য নাটকের তুলনায় ইহার মধ্যে অনেক বেশিই পরিলক্ষিত হইবে; তথাপি চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস ইহাতে সার্থক হয় নাই, ইহাতে কোন চরিত্রেরই ক্রমবিকাশ দেখান হয় নাই। তারপর কাহিনীর পরিকল্পনা ভারতীয় জাতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী বলিয়াও নাটক হিসাবে ইহা অকিঞ্চিৎকর হইয়া রহিয়াছে।

১
গ্রীক্ পুরাণ

যে গ্রীক্ উপাখ্যান হইতে মধুসূদন তাঁহার নাটকের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া 'পদ্মাবতী নাটকে'র কাহিনী বর্ণনা করা যাইতেছে। তাহা দ্বারাই এই বিষয়ে মধুসূদনের কৃতিত্বের পরিমাপ করা যাইবে।

কলহপ্রিয়া গ্রীক্ দেবী ডিস্‌কর্ডিয়া একবার একটি সোনার আতা তৈয়ারী করিলেন। জুনো, প্যালাস ও ভেনাস এই তিনজন গ্রীক্‌দেবীর মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, তাহা লইয়া কলহ সৃষ্টি করিবার জন্য ডিস্‌কর্ডিয়া এই সোনার আতাটি তাঁহাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। আতাটির গায়ে লিখিয়া দিলেন,—'সর্বাপেক্ষা সুন্দরীর জন্য।' তিনজন দেবীই আতাটি পাইবার জন্য আগ্রহ

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহারা ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসকে গিয়া এই বিষয়ে মধ্যস্থ মানিয়া বলিলেন, 'আপনার বিবেচনায় আমাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, তাঁহাকে এই আতাটি দান করুন।' প্যারিস মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। জুনো প্রবল পরাক্রান্ত দেবতা জুপিটরের পত্নী, প্যালাস বিশ্ব-জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর ভেনাস বিশ্ব-সৌন্দর্য ও প্রেমের মূর্ত প্রতীক্। জুনো রাজপুত্রকে আশ্বাস দিলেন, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলে তিনি তাঁহাকে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিবেন; প্যালস আশ্বাস দিলেন, তাঁহাকে সংগ্রামে বিজয়ী করিবেন; আর ভেনাস প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁহাকে এই ব্যাপারে পরিতুষ্ট করিলে, তিনি তাঁহাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী উপহার দিবেন। প্যারিস ভেনাসকেই সোনার আতা দান করিলেন। ইহাতে জুনো ও প্যালাস ক্রুদ্ধ হইয়া প্যারিসের সর্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহারই ফলে ট্রয় নগর ধ্বংস হইল।

*

২

'পদ্মাবতী নাটকে'র কাহিনী

গ্রীক্ কাহিনীটিকে যে কি সুনিপুণ কৌশলে মধুসূদন ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটকে'র নিম্নলিখিত কাহিনী-ভাগ হইতেই দৃষ্ট হইবে :

বিদর্ভাধিপতি ইন্দ্রনীল একদিন মৃগয়া করিতে আসিয়া বিন্ধ্যারণ্যের সন্নিকটবর্তী এক রম্য বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ নেপথ্যে স্বর্গীয় বাদ্য শুনিয়া মোহাবিষ্ট হইয়া তিনি একস্থানে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় শচীদেবী, রতিদেবী ও মুরজা দেবী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুরজা দেবী যক্ষরাজ কুবেরের পত্নী। দেবর্ষি নারদ দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিলেন—কলহ-প্রিয় মুনির মনে এক ক্রূর কৌতুকবোধ জাগিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, এই তিনজনের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিতে হইবে। এই বলিয়া একটি স্বর্ণপদ্ম লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, তিনিই ইহা গ্রহণ করুন,' বলিয়া পদ্মটি গিরিশৃঙ্গে স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া দাবী করিয়া পদ্মটি পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এই লইয়া তিনজনের মধ্যে তুমুল কলহের সৃষ্টি হইল। অতঃপর তাঁহারা রাজা ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ মানিলেন। ইন্দ্রনীল অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। প্রত্যেক দেবীই ইন্দ্রনীলকে উৎকোচের প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে রতিদেবী বলিলেন, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলে, তিনি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী তাঁহাকে প্রদান করিবেন। ইন্দ্রনীল রতিদেবীকেই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বিবেচনা করিয়া স্বর্ণপদ্মটি তাঁহাকেই প্রদান করিলেন। ইহাতে

শচীদেবী ও মুরজা দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রনীলের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন বলিয়া শাসাইয়া গেলেন। রতিদেবী তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী মাহিষ্মতীপুরীর রাজকুমারী পদ্মাবতীকে ইন্দ্রনীলের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন।

প্রতিহিংসা-পরায়ণা শচীর আদেশে কলি পদ্মাবতীকে হরণ করিয়া এক নির্জন অরণ্যে রাখিয়া আসিলেন। ইন্দ্রনীলের শত্রু রাজাদিগকেও কলিদেব ইতিপূর্বেই ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ইন্দ্রনীল রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন; কিন্তু পদ্মাবতীর বিরহে কাতর হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইয়া পড়িলেন।

গভীর বনমধ্যে পরিত্যক্তা হইয়া পদ্মাবতী যখন বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন রতিদেবী তাঁহাকে লইয়া গিয়া অঙ্গিরার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অঙ্গিরা মুনি তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় দান করিলেন। এদিকে মুরজাদেবী জানিতে পারিলেন যে, পার্বতী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহার কন্যা বিজয়া মর্ত্যলোকে পদ্মাবতী নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনিও তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়াছেন জানিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং যাহাতে স্বামীর সহিত তাঁহার পুনর্মিলন সাধিত হয়, শচীদেবীর সাহায্যে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া রাজা ইন্দ্রনীল অঙ্গিরার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি পদ্মাবতীর সহিত মিলিত হইলেন। ভগবতীর উপদেশে দেবীদিগের মধ্য হইতে কলহের অবসান হইল।

৩

মূলের সহিত অনৈক্য

গ্রীক্ পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে 'পদ্মাবতী'র আখ্যানের মূল পার্থক্য এই যে, গ্রীক্ পৌরাণিক কাহিনী বিয়োগান্তক, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের আদর্শে মধুসূদন 'পদ্মাবতী নাটকে'র আখ্যানকে মিলনান্তক করিয়া রচনা করিয়াছেন। ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে আনুপূর্বিক 'পদ্মাবতী'র অনুরূপ কোন আখ্যায়িকা না থাকিলেও, সুপরিচিত নল-দময়ন্তীর কাহিনী এবং শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী হইতে নাট্যকার কোন কোন স্থানে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। একটি বৈদেশিক কাহিনীর সঙ্গে দেশীয় পৌরাণিক কাহিনীর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্রের এমন নিবিড় যোগ-সাধন করা হইয়াছে যে, ইহাতে কাহিনীর বৈদেশিক রূপ একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জুনোর স্থলে শচীর, ভেনাসের স্থলে রতিদেবীর ও ডিস্কর্ডিয়ার স্থলে নারদমুনির পরিকল্পনা যথার্থ হইয়াছে। পুরাণ বহির্ভূত একমাত্র মুরজা চরিত্রটিকে কুবেরের পত্নী বলিয়া তাঁহাকে কল্পনা করিয়া লইতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র কাহিনীই গ্রীক্ পুরাণের ক্ষেত্র হইতে ভারতীয় পুরাণের ক্ষেত্রে অপরূপ কৌশলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। দেশীয় এবং বৈদেশিক উপাদানের সামঞ্জস্য বিধানে মধুসূদনের যে কৃতিত্বের পরিচয় অন্যত্রও পাওয়া যায়, 'পদ্মাবতী নাটকে'ও তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রতি আন্তরিক অনুরক্তি না থাকিলেও, একমাত্র প্রচলিত রীতির মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' যে ভাবে সংস্কৃতের বিধিনিয়মগুলি অনুসরণ করিয়াছেন, 'পদ্মাবতী নাটকে'ও তাহার কোনই ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কাহিনীর বাহিরের দিক দিয়া ইহার উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকিলেও, ইহার অন্তরের আদর্শ দেশীয়; শেষ যুগের

বৈচিত্র্যহীন শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের আদর্শে ইহাও রচিত হইয়াছে। এমন কি, কাহিনীর মধ্যে বিচিত্র নাট্যিক ঘটনা-সমাবেশের যে সুযোগ ছিল, তাহাও নাট্যকার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন নাই। ঘটনার দিক দিয়া ইহা তাঁহার যে কোন নাটক হইতেই সমৃদ্ধ; কিন্তু তথাপি পদে পদে সংস্কৃত আদর্শের নিকট মস্তক অবনত করিতে গিয়া ইহার ঘটনার প্রবাহকে নাট্যকার অনেকাংশে সংযত করিয়াছেন। ইহাতেই দৃশ্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া ইহাদের মধ্যস্থিত ঐক্যসূত্রটি হারাইয়া গিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত নাটকের আদর্শেই ইহাকে মিলনাত্মক করিয়া রচনা করা হইয়াছে, নতুবা গ্রীক্ পুরাণের এই কাহিনীর পরিণতি অত্যন্ত করুণ। ইহার রাজা ইন্দ্রনীলের চরিত্র অনেকটা কালিদাস-রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের দুষ্মন্ত-চরিত্রের অনুরূপ। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা দুষ্মন্ত-চরিত্রের শুধু এক অক্ষম অনুকরণ মাত্র নহে। ইহাতেও সেই বিদূষক ব্যক্তিত্বহীন, সরল ও লোভী রাজবয়স্য, ইহাতেও সংস্কৃত নাটকেরই অন্যান্য আরও অনেক বিচ্ছিন্ন অংশ আনিয়া সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। অঙ্গিরার আশ্রমে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলন-চিত্র মারীচের আশ্রমে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলনের অনুরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে, যদিও অন্তরের সহিত নাট্যকার বাংলা নাটক রচনায় সংস্কৃত নাটকের বিধিনিষেধের গণ্ডী স্বীকার করেন না, তথাপি 'পদ্মাবতী' রচনার কাল পর্যন্তও তাহা একেবারে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতেও সাহসী হন নাই। বৈদেশিক পুরাণ হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়াও দেশীয় ভঙ্গিতেই নাট্যকার 'পদ্মাবতী নাটক' রচনা করিয়াছেন।

৪

চরিত্র-বিচার

'পদ্মাবতী'তে বিশেষ কোন চরিত্রসৃষ্টিই সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহা স্ত্রীচরিত্র-সর্বস্ব নাটক; পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে একমাত্র রাজা ইন্দ্রনীল—বিদূষক ইন্দ্রনীল-চরিত্রের ছায়ামাত্র; তাঁহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই শ্রেণীর আর একটি পুরুষ-চরিত্রও ইহাতে আছে, তাহা কলিদেব। কলিদেবও শচীদেবীর হাতের ক্রীড়নক মাত্র, তাঁহারই প্ররোচনায় কলিদেবের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, অতএব তাঁহারও ব্যক্তিত্ব নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একমাত্র পুরুষ-চরিত্র ইন্দ্রনীলকে লইয়াই এই নাটক লিখিত হইয়াছে। ইহাও এই নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি। ইহাকে এক-চরিত্র-সর্বস্ব করিয়া রচনা করিবার ফলে কাহিনীর গতি অগ্রসর হইতে কোন বাধা না পাইলেও, তাহা হইতে নাট্যিক বিক্ষোভ সৃষ্টি হইতে পারে নাই। বিশেষত এই একমাত্র পুরুষ-চরিত্রটিকেও প্রকৃত পৌরুষের ক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রাজা ইন্দ্রনীল অত্যন্ত চপল-স্বভাব পুরুষ, গুরু-বিষয়ক কোন গুণ তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থের নায়ক-চরিত্রকে এই প্রকার মেরুদণ্ডহীন করিবার একমাত্র কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে, মধুসূদনের এই নাটক রচনার আদর্শ ছিল সেই যুগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যহীন শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটক। অতএব প্রকৃত আদর্শের সন্ধান না পাওয়াতেই মধুসূদনকে এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে।

'পদ্মাবতী নাটকে'র চরিত্রের মধ্যে মুরজা-চরিত্রের পরিকল্পনায় কবি কতকটা মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। এই চরিত্রটি গ্রীক্ উপাখ্যানের প্যালাস্ চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরিকল্পিত হইলেও, ইহাকে কবি তাঁহার নিজস্ব কল্পনা দ্বারাও সমৃদ্ধ করিয়াছেন, বিশেষত তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে আর একটি মৌলিক কাহিনী আনিয়া সংযুক্ত করাতে মূল কাহিনীটিও বেশ উপভোগ্য

হইয়াছে। মুরজা শচীর মত এত ঈর্ষাকাতরা নহেন; কারণ, মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হওয়ার মূলে তাঁহার কেবল রূপের গর্ব করিয়া বেড়াইবারই অভিলাষ ছিল না, বরং তাঁহার অভিশপ্তা কন্যার সন্ধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। মাতৃহৃদয়ের এই সজাগ স্নেহশীলতাই রতিদেবী কিংবা পদ্মাবতীর প্রতি তাঁহার ঈর্ষাবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া তুলিতে দেয় নাই। সেইজন্য ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা-গ্রহণে মুরজাদেবী শচীদেবীর মত সক্রিয় নহেন। পদ্মাবতী যে তাঁহারই অভিশপ্তা কন্যা, তাহা তিনি জানিতেন না——জানিবার কথাও ছিল না। অথচ তাহার প্রতি তাঁহার স্নেহ অজ্ঞাতে ধাবিত হইয়া যাইত। চিত্রকূট পর্বতের উপর পদ্মাবতীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে মুরজার 'স্তনদ্বয় দুগ্ধে পরিপূর্ণ' হইয়াছিল। তথাপি তিনি তাহাকে চিনিতে পারেন নাই বলিয়া পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন। বাহ্যিক ঈর্ষার আবরণে মাতৃস্নেহের যে একটি প্রচ্ছন্ন ধারা মুরজার হৃদয়তলে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিল, তাহা নাট্যকার কাহিনীর শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন। ইহাই মুরজা-চরিত্রের পূর্বাপর সৌন্দর্যরক্ষা করিয়াছে। এই চরিত্রটি এই ভাবে বাস্তবধর্মী হইয়াছে বলিয়াই পাঠকবর্গের দৃষ্টি-আকর্ষণের যোগ্য। ইহার অন্যতম প্রধান স্ত্রী-চরিত্র শচী। শচীই নাটকের মধ্যে একমাত্র সক্রিয় চরিত্র বলিয়া মনে হয়। প্রথম দৃশ্যের পর হইতে কাহিনী তাঁহারই বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। শচী ঈর্ষাকাতরা, ক্রুর-স্বভাবা ও প্রতিহিংসা-পরায়ণা। তাঁহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি নিরপরাধা পদ্মাবতীকে চরম দুঃখের সম্মুখীন করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন—নাটকের খল-চরিত্ররূপে শচীর চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

নাটকের নায়িকা চরিত্র পদ্মাবতী এই নাটকের মধ্যে বিশেষ প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। শৃঙ্গার-রসাত্মক নাটকের নায়িকা-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য, তাহা ইহার মধ্যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; 'রত্নাবলী'র সাগরিকা চরিত্রের কিছু কিছু প্রভাবও ইহাতে অনুভব করা যায়।

৫

ভাষা ও ছন্দ

ভাষার দিক দিয়া 'পদ্মাবতী নাটক' 'শর্মিষ্ঠা নাটক' হইতে বেশ উন্নত। ইহার ভাষা সম্পূর্ণ নাট্যোপযোগী না হইলেও, ইহার মধ্য হইতে 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র আড়ষ্টতা দূর হইয়া ইহা প্রাঞ্জলতার পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া অনুভব করা যায়। মধুসূদনের নাট্যিক ভাষার ক্রমবিকাশর ক্ষেত্রে 'পদ্মাবতী'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

'পদ্মাবতী'র মধ্যেই কোন কোন স্থলে মধুসূদন সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন; তাহা রচনা-গুণে তাঁহার পরবর্তী অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শ হইতে অনেক নিকৃষ্ট হইলেও, বাংলা ভাষায় এই ছন্দের ইহাই সর্বপ্রথম প্রয়োগ বলিয়া ইহার একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। মধুসূদনের সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিদর্শনরূপে নিম্নে কতক অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে?—
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর?
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে
তুলে লয়ে যায় সুখে। মলয়-মারুত,
কুসুম কানন-ধন সুরভিরে হরি
দেশ-দেশান্তরে চলি যান কুতুহলে। ২।২

পয়ারের অনুরূপ বহিরঙ্গ দান করিয়া অমিত্রাক্ষর রচনা ব্যতীতও তিনি অন্য এক রীতির অমিত্রাক্ষর ইহাতে রচনা করিয়াছিলেন; তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে যতি-স্থানে চরণ-ছেদ হইত; পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায় ইহারই অনুরূপ ছন্দ তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহারই 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত হইয়াছে। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী নাটক' হইতে এই শ্রেণীর ছন্দের নিদর্শন উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

আমি কলি,—
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম ?
সতত কুপথে গতি মোর।
নালিনীরে স্বজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে। ৪।১

ইহারও প্রকৃতি অমিত্রাক্ষরেরই, তবে প্রচলিত পয়ারের সহিত একটা আকৃতিগত সাদৃশ্য রক্ষার জন্যই মধুসূদন তাঁহার পরবর্তী রচনায় এই শ্রেণীর চরণ-সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যত পয়ারাকৃতির চরণ-সজ্জাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আর কোন রচনায় এই উদ্ধৃত রূপ অমিত্রাক্ষরের সহিত সাক্ষাৎ হয় না।

মধুসূদন বাংলা নাটক রচনা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিবার মুহূর্ত হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা নাটক রচনা করিবেন। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন: 'I am of opinion that our drama should be in blank-verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degress'. বেলগাছিয়া নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকদিগের তাহা মনঃপূত হইবে না বলিয়া তিনি তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' সেই বিষয়ে কোন প্রয়াস পান নাই। 'পদ্মাবতী নাটকে'র একটি দৃশ্যে তিনি এই বিষয়ে সর্বপ্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে মধুসূদনের যে আত্মবিশ্বাসই থাকুক না কেন, আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে বাংলা নাটকের সংলাপের ভাষা হইতে পারে না, তাহা তিনি প্রথম পরীক্ষার ভিতর দিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কারণ, সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ হইবার পরও তিনি এই বিষয় দ্বিতীয়বার আর কোন প্রয়াস পান নাই। 'পদ্মাবতী নাটকে'র চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অমিত্রাক্ষর ছন্দে ইহার সামান্য অংশ রচিত হইয়াছে, তাহা যে

নাটকীয় সংলাপের আদর্শ ভাষা হইবার যোগ্য, তাহা কেহই মনে করিবেন না। তবে ইহার মধ্যেই যে তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষা জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্বোদ্ধৃত স্বগতোক্তির অংশ ব্যতীত চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের সামান্য একটু অংশে মাত্র মধুসূদন বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সংলাপের ভাষায় তাঁহার পরিকল্পিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

কলি। (স্বগত) হরণ করি আনিনু রাণীরে
এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রানী ?
যে প্রতিজ্ঞা তার কাছে করেছিনু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল ?)
ধাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)
আহা! এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—
(শচী এবং মুরজার প্রবেশ)
(প্রকাশ্যে) দেবি! আশীর্বাদ করি।
শচী। প্রণাম! হে দেববর! কি করেছ বল ?
কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণি,
বিদায় করহ' এবে যাই স্বর্গপুরে।
শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে ?
কলি। এই ঘোর বনে
সখীসহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি!
(সহাস্যবদনে)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী করিল মিনতি,
সে সকল মনে হ'লে হাসি আসে মুখে!
মুরজা। (স্বগত) হেন দুরাচার আর আছে
কি জগতে ? (প্রকাশ্যে) ভাল কলিদেব!
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে ?

কলি। সে কি দেবি? হরিণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে?
শচী। কলিদেব,—
শত ধন্যবাদ আমি করি গো তোমারে। ৪।২

মধুসূদন এইখানেই বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের ভাষায় অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, অন্যত্র কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্বগতোক্তিতে তিনি অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন।

'পদ্মাবতী নাটকে'র উদ্ধৃত রচনাংশ হইতে দেখা যাইতেছে, এইখানেই মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষা জন্ম লাভ করিয়াছে। সীতা ও সরমার কথোপকথনের ভাষার পূর্বাভাস যেন ইহার মধ্যে সূচিত হইয়াছে। তবে নাটকীয় সংলাপের ভাষারূপে ইহার সার্থকতা নানা কারণেই সন্দেহজনক।

৬
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

'পদ্মাবতী নাটকে'র সঙ্গীতগুলি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র গীতিস্সুরে বাঁধা, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র গীতিস্সুরেরও প্রথম আভাস-ধ্বনি ইহাতেই শুনিতে পাওয়া যায়। 'পদ্মাবতী নাটকে'র পদ্মাবতী চরিত্রে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতা চরিত্রেরও অস্পষ্ট পূর্বাভাস অনুভব করা যায়। পদ্মাবতী চরিত্রের মধ্যে পরদুঃখকাতরতা এবং সহিষ্ণুতার যে গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই সীতা চরিত্রে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে।

মধুসূদনের তিনটি নাটকের তিনটি প্রধান স্ত্রীচরিত্র যেমন শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং কৃষ্ণকুমারী ইহাদের মধ্যে গুণগত কতকগুলি ঐক্য আছে, মধুসূদনের মনে স্ত্রীচরিত্রের আদর্শ সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা ইহাদের তিনজনকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল; 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতাচরিত্রে তাহারই আর একটি রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় মাত্র।

'পদ্মাবতী নাটক' স্ত্রীচরিত্র-কেন্দ্রিক রচনা। ইহার একমাত্র উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্র ইন্দ্রনীল বিশেষত্বহীন। কিন্তু ইহার চারিটি স্ত্রীচরিত্রই যেমন শচী, মুরজা, রতি এবং পদ্মাবতী ইহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, তবে এই বৈশিষ্ট্য কাহারও মধ্যে স্পষ্ট, কাহারও মধ্যে অস্পষ্ট। রতিদেবীর চরিত্রই সর্বাপেক্ষা অস্পষ্ট। মধুসূদন ইহার পরবর্তী কালে যে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের কোন কোন স্ত্রীচরিত্রেরও পূর্বাভাস 'পদ্মাবতীকে নাটকে'র এই চারিটি স্ত্রীচরিত্রের মধ্যেই সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে। 'পদ্মাবতী নাটকে'র চরিত্রগুলি সম্যক্ স্ফূর্তিলাভ করিতে না পারিলেও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' গিয়া ইহারা বিভিন্ন রূপে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'শর্মিষ্ঠা নাটকের' শর্মিষ্ঠা

চরিত্র, 'পদ্মাবতী নাটকে'র 'পদ্মাবতী' চরিত্র 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রে যেন শকুন্তলার রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শচী চরিত্রের মধ্যেও বীরাঙ্গনা কাব্যের কয়েকটি স্ত্রীচরিত্রের পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে। এই ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে 'পদ্মাবতী নাটক' স্বাধীন দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর রচনা বলিয়া বিবেচিত হইলেও, মধুসূদনের রচনা সামগ্রিক ভাবে বিচার করিলে ইহারও একটি বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, মধুসূদনের কাব্যরচনার প্রস্তুতি পর্বে যে সকল রচনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং যাহাদের মধ্য দিয়া তিনি পূর্ণতর এবং পরিণত রচনা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, 'পদ্মাবতী নাটক' তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

'পদ্মাবতী নাটকে'র স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র শচীর চরিত্রই ভারতীয় আদর্শে রচিত হয় নাই; এমন কি, আনুপূর্বিক গ্রীক্ পৌরাণিক আদর্শও তাহাতে রক্ষা পায় নাই। সেইজন্য ইহা ব্যর্থ সৃষ্টি। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ভারতীয় নারীচরিত্রের ঐতিহ্যের অনুসরণ করা হইয়াছে, তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহা অনেক স্থলেই অপরিস্ফুট রহিয়াছে।



তিন। পরিত্যক্ত রচনা

১

'সুভদ্রা'

'পদ্মাবতী নাটক' রচনা করিবার পর মধুসূদন মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া 'সুভদ্রা' নামে একখানি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। 'পদ্মাবতী নাটক' রচনার ভিতর দিয়া তিনি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে সংলাপ রচনার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ণতর পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। তাহারই ফলে তিনি 'সুভদ্রা নাটক' রচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার জন্যই তিনি নাটক রচনা করিতেন, তখনও স্বাধীনভাবে নাটক রচনার তাঁহার কোন উপায় ছিল না। 'সুভদ্রা নাটক'ও বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া ইহার রচনার কিয়দংশ যথারীতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগকে দেখিতে দিলেন। তাঁহাদের অনুমোদন লাভ করিলে তিনি ইহার পরবর্তী অংশ পূর্ণ করিতেন।

কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনেতা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁহার আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নাটকীয় সংলাপ অনুমোদন করিলেন না। ইহার প্রধান কারণ, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি ছিল বলিয়া তখন পর্যন্ত কেহই তাহা আবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত হন নাই। সেইজন্য আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নাটকীয় সংলাপ তাহাদের মনঃপূত হইবে কিনা এই বিষয়ে মধুসূদনের নিজেরও সংশয় ছিল। মধুসূদন আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'সুভদ্রা নাটকে'র প্রথম অঙ্ক রচনা করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইলেন। কয়েক সপ্তাহ পর ইহার দ্বিতীয় অঙ্ক রচনা

সম্পূর্ণ হইলে তাহাও তিনি উক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইলেন। মধুসূদন 'সুভদ্রা নাটক'কে নাটক বলিয়া অভিহিত না করিয়া নাট্যকাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার আনুপূর্বিক নাট্যগুণ সম্পর্কে মধুসূদনেরও সংশয় ছিল। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও নাট্যকাব্যখানি অভিনয়োপযোগী হইবে না বলিয়া মন্তব্য করিলেন। অতএব এই রচনা দ্বারা আশু আর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না বুঝিতে পারিয়া, মধুসূদনও ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়াই অগত্যা ইহার রচনা পরিত্যাগ করিলেন। ইহার অসম্পূর্ণ অংশও কোনদিন মুদ্রিত হয় নাই। তিনি যে কতদূর সাফল্যের আশা করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'সুভদ্রা নাটক' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অ-পূর্বপ্রকাশিত কবিতাবলীর অন্তর্গত এই নাটকেরই প্রারম্ভিক বাণী-বন্দনার এই অংশ হইতে কতকটা অনুমান করিতে পারা যাইবে,

কেমনে ফাল্‌গুনি শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদুবৃন্দে) চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে
বাগ্দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।

কিন্তু অনুকূল উৎসাহের অভাবে ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়াই ইহার রচনাকার্য পরিত্যাগ করিবার জন্য মধুসূদন কতখানি ভগ্নোদ্যম হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত 'সুভদ্রা-হরণ' নামক একটি চতুর্দশপদী কবিতা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ব্যক্তিগত রুচির অনুগামী ছিল না বলিয়া এবং উপস্থিত প্রয়োজনীয়তা সাধনে ব্যর্থ হইবে আশঙ্কা করিয়া মধুসূদন আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একখানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াও তাহা কি ভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নাটকের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় নিরুৎসাহের ফলে তিনি বাধ্য হইয়া কাব্যের ক্ষেত্রে তাহা নিয়োজিত করিলেন। নাটক রচনা করিয়া কেবল মুদ্রিত করিবার উদ্দেশ্যেই মধুসূদন সেই

সময় কোন নাটকই রচনা করেন নাই। তাঁহার রচিত নাটকগুলি অভিনীত দেখিবার জন্যই তিনি তখন নাট্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'সুভদ্রা নাটক' অভিনীত হইবার কোন আশা নাই দেখিয়াই, তিনি ইহার রচনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব রঙ্গমঞ্চও যে নাট্যসাহিত্যসৃষ্টি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, এখানেই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যাইতেছে।

'সুভদ্রা'র বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে মধুসূদনের সম্পর্কে দুইটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মহাভারতের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে তাঁহার অনুরাগ এবং যথার্থ নাটকীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁহার সচেতনতা। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনার পরও যে মধুসূদন অন্য কোন ক্ষেত্র হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহের পরিবর্তে মহাভারতেরই অন্যতম বিষয় নির্বাচন করিয়া লইলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার মহাভারতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই নাটকীয় বিষয়বস্তু যে কি, সেই সম্পর্কেও তাঁহার যথার্থ জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, সুভদ্রার বৃত্তান্তের মধ্যে অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী নাটকীয় দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিবার প্রভূত পরিচয় আছে। বাংলার প্রথম মৌলিক নাটক সুভদ্রা-হরণের বৃত্তান্ত লইয়াই রচিত হইয়াছে।

২

'রিজিয়া'

ব্যক্তিবিশেষের রুচি এবং সমসাময়িক মঞ্চ-ব্যবস্থার অনুকূল নহে বলিয়া 'সুভদ্রা-হরণ' নাটক যেমন অসম্পূর্ণ রহিল, তেমনই একই কারণে আর একটি নাটককেও মধুসূদনের পরিকল্পনাতেই বিসর্জন দিতে হইল—তাহার নাম 'রিজিয়া নাটক'। ভারতীয় মুসলমান চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিবার জন্য মধুসূদনের আন্তরিক আগ্রহ ছিল। এই বিষয়ে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছেন, 'We ought to take up Indo-Mussulman subject. The Mahomedans are a fiercer race than ourselves and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.'

সম্রাট্ আল্‌তামাসের কন্যা সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচনা করিবার জন্য একখানি পরিকল্পনা বা সংক্ষিপ্ত আদর্শের খসড়া করিয়া তিনি কেশববাবুকে দেখিতে দেন। মুসলমান চরিত্র অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার প্রয়াস বলিয়া এই পরিকল্পনাটিরও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে। কিন্তু এই পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতেও সেই ব্যক্তিবিশেষের রুচি এবং তদানীন্তন অভিনয়-ব্যবস্থা প্রতিকূল হইয়া উঠিল। কেশববাবুর বিরুদ্ধ মত পাইয়া মধুসূদন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন এবং 'রিজিয়া নাটক' রচনার পরিকল্পনাও পরিত্যক্ত হইল। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। অতএব ইহার মূলেও দেখিতেছি, ব্যক্তিবিশেষের রুচি এবং অভিনয়-ব্যবস্থার সাময়িক একটা ত্রুটিই দায়ী হইয়াছে। তথাপি এই নাটকের জন্য মধুসূদন

যে সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনাখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাংলা ভাষায় অভিনব এক বিষয়বস্তু লইয়া নাট্যরচনার প্রথম প্রয়াস বলিয়া বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, বাংলার নাট্য-শিল্প যখন ব্যক্তিরুচির এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া গণ-রুচির অনুগামী হইল, কিংবা নাট্যপ্রতিভাও যখন ব্যক্তিরুচির মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া প্রকাশ পাইবার সুযোগ পাইল, তখন প্রায় এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই বাংলা ভাষায় একাধিক নাটক রচিত ও সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হইয়াছে; কিন্তু এই বিষয়ে যে মধুসূদনই সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা আজ সকলেই বিস্মৃত হইয়াছেন।

সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং চরিত্র নির্বাচনে মধুসূদনের মধ্যে যে কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না, তাহা তাঁহার লিখিত এই পত্রাংশেই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাহাতে লিখিয়াছে, 'The prejudice against Muslim names must be given up.'

'শর্মিষ্ঠা নাটক' এবং 'পদ্মাবতী নাটক' রচনার মধ্যে মধুসূদন যে গতানুগতিক এবং পর্যুষিত রীতির অনুবর্তন করিয়াছেন, রিজিয়া-নাট্যরচনায় তাহা হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয় প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্রও তিনি লাভ করিতে পারিতেন। ইহাতে মধুসূদনের মৌলিক নাট্য-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল; নাটকখানি রচিত হইলে ইহাই বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত সর্বপ্রথম নাটক হইত।

*

চার। 'মায়া-কানন' [১৮৭৪]

মধুসূদনের সর্বশেষ নাট্যরচনা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি পরলোক গমন করেন। নাটকের সমাপ্তি অংশই নাট্যকাহিনীর মূল, ইহা দ্বারাই নাটক মিলনান্তক কিংবা বিয়োগান্তক, তাহা সূচিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই অংশই যদি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তবে নাটকের পরিণতি সম্পর্কে নাট্যকারের যে কি পরিকল্পনা ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সেইজন্য বহু সমালোচকই মধুসূদনের নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় তাঁহার 'মায়া-কানন' নাটকের আলোচনাটি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। বিশেষত 'মায়া-কানন' যখন রচিত হয়, তখন মধুসূদনের প্রতিভা অস্তমিত হইয়াছে; সেইজন্য ইহার মধ্যে তাঁহার পূর্ববর্তী নাটকগুলি হইতে তিনি অধিক অগ্রসর হইতে ত পারেনই নাই, বরং অনেক পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য 'মায়া-কাননে'র আলোচনার মধ্য দিয়া মধুসূদনের প্রতিভার নূতন কোন গৌরবজনক দিকের সন্ধান পাওয়া যায় না। তথাপি মধুসূদনের নাট্যরচনার সামগ্রিক বিচারে ইহাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যাইতে পারে না।

তবে 'মায়া-কানন' সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, ইহা মধুসূদনের কোন পরমুখাপেক্ষী রচনা নহে, কোন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের মুখের দিকে চাহিয়া ইহা রচিত হয় নাই; যদিও একটি বিশেষ নাট্য-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ইহা রচিত হইয়াছিল, তথাপি ইহার বিষয়বস্তু নির্বাচনে কিংবা চরিত্রের রূপায়ণে তাঁহাকে অন্য কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার প্রেরণা যদি তখন পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে থাকিত, তবে তিনি ইহাতেই তাহা বিকাশ করিবার সুযোগ পাইতেন। কিন্তু এই স্বাধীনতার তিনি যথাযথ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তথাপি মধুসূদনের অস্তমিত-প্রায়

জীবনেও তাঁহার সৃষ্টির ক্ষমতা কতদূর অবশিষ্ট ছিল, তাহা বুঝিবার জন্য এই নাটকটির আলোচনা একেবারে পরিহার্য হইতে পারে না।

১
কাহিনী

'মায়া-কাননে'র কাহিনীটি এই—সিন্ধুদেশে মায়া-কানন নামে এক সুবিস্তৃত অরণ্য ছিল। ইহার সম্পর্কে এই জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল: 'মায়া-কাননে এক পাষাণময়ী দেবীমূর্তি আছে। যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণ-গৃহে প্রবেশ করেন, সেই সুলগ্নে যদি কোন পবিত্র-স্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পায়।' দেশের সর্বত্র হইতে বিবাহার্থী বহু পুরুষ ও নারী তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনের ভবিষ্যৎ জানিবার কৌতূহলে নির্দিষ্ট দিনে সেই অরণ্যে দেবীমূর্তির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

একদিন নির্দিষ্ট সময়ে সিন্ধু দেশের রাজকুমার অজয় মৃগয়া করিবার জন্য অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি জনশ্রুতির কথা জানিতেন; সেদিন সেই নির্দিষ্ট দিন ছিল, তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ পত্নী কেমন হইবে জানিবার জন্য একাকী দেবীমূর্তির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেইদিন একই সময়ে গান্ধার দেশের রাজকুমারী ইন্দুমতী তাঁহারও ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য সিন্ধু রাজকুমারের অজ্ঞাতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেই তাহারা পরস্পরকে দেখিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া রাজপুত্র পিতার নির্দিষ্ট বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবল মাত্র ইন্দুমতীর ধ্যানে দিন

কাটাইতে লাগিলেন। মহারাজ সকল কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। কারণ, সেই পাষাণময়ী দেবী সম্পর্কে এই জনশ্রুতি ছিল যে, 'সেখানে পুরুষ যে নারীকে দেখে এবং নারী যে পুরুষকে দেখে তাহাদের বিবাহে দৈব অভিশাপ বর্ষিত হয়।' কিন্তু রাজপুত্র কিছুই শুনিতে চাহিলেন না। ইতিমধ্যে মহারাজের মৃত্যু হইল, রাজপুত্র অজয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ; কিন্তু ইন্দুকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। মহারাজের প্রেতমূর্তি আবির্ভূত হইয়া মন্ত্রীকে এই বিবাহ সম্পন্ন করিতে নিষেধ করিলেন। মন্ত্রী বিবাহে বাধা দিতে লাগিলেন। এইদিকে ইন্দুমতীর পিতা গান্ধার রাজ সিংহাসনচ্যুত হইয়া অন্যত্র পলাইয়াছেন। ধূমকেতু তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইন্দুমতী ছদ্মবেশে তাহার এক সহচরীর সঙ্গে সিন্ধুরাজ অজয়ের রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। রাজা অজয় একদিন ইন্দুমতীকে দেখিতে পাইয়া উন্মত্তের মত হইয়া গেলেন, রাজকার্যে অবহেলা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি জানিতে পারিলেন যে ইন্দুমতীর পিতৃশত্রু ধূমকেতু ইন্দুমতীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ পাঠাইয়াছে, অন্যথায় যুদ্ধ করিবার ভয় দেখাইয়াছে। যুদ্ধ হইলে সিন্ধুরাজ্যের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই ; সেইজন্য রাজ্যের সকলেই ইন্দুমতীকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার জন্যই রাজাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাহাই স্থির হইল। ঠিক করা হইল যে ইন্দুমতী পুনরায় মায়া-কাননে গিয়া পাষাণময়ী দেবীর সম্মুখেই শত্রুহস্তে সমর্পিতা হইবেন। সহচরী-সহ ইন্দুমতী মায়া-কাননে প্রবেশ করিয়া দেবীমূর্তির সম্মুখীন হইবামাত্র বস্ত্র-মধ্য হইতে ছুরিকা লইয়া আত্মঘাতিনী হইলেন। সহচরী সুনন্দা বিষপান করিয়া তাঁহার সঙ্গিনী হইল। সিন্ধুরাজ অজয় উন্মত্তের মত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তারপর সেই দেবীমূর্তির সম্মুখে নিজেও আত্মঘাতী হইয়া ইন্দুমতীর দেহের পার্শ্বেই ভূপতিত হইলেন।

২

কাহিনীর মৌলিকতা

'মায়া-কানন' মধুসূদনের অস্তমিত প্রতিভার শেষ পরিচয় হইলেও ইহার কাহিনীভাগ তাঁহার মৌলিক পরিকল্পনার ফল বলিয়া মনে হইবে। কাহিনীর আনুপূর্বিক দৃঢ়-সংবদ্ধতা দেখিয়া এই কথা মনে করা কঠিন যে, মধুসূদন ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এমন কি, যদি তিনি সম্পূর্ণ করিয়া নাও গিয়া থাকেন, তথাপি এই কথা সত্য যে, মধুসূদন যে ভাবে ইহার পরিণতি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে যিনিই ইহাতে সম্পূর্ণতা দান করুন না কেন, তিনিই মধুসূদনের পরিকল্পনা অনুযায়ীই তাহা করিয়াছেন। কারণ, কাহিনীর এই বিষাদময় পরিণতি নাট্যকাহিনীর অনিবার্য গতিসূত্রেই এখানে আসিয়াছে, আকস্মিকভাবে আসে নাই।

'মায়া-কানন' নাটকের মূল কাহিনীর ধারায় যে মৌলিকতাই প্রকাশ পাক না কেন, ইহার বিভিন্ন চিত্রে কিংবা কোন কোন চরিত্রে সেক্সপীয়রের এবং কালিদাসের কোন কোন নাটকের প্রভাব গৌণভাবে অনুভব করা যায়। মধুসূদনের জীবনী হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি শেষ জীবনে রোগশয্যায় শুইয়া সেক্সপীয়রের নাটকের কোন কোন অংশ বার বার আবৃত্তি করিতেন। সুতরাং তাঁহার প্রভাব এই নাটকে স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেক্সপীয়রের নাটকে যে প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কথা আছে, মধুসূদনের আর কোন নাটকের মধ্যেই তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' স্বপ্নে পদ্মিনীর আবির্ভাবের কথা আছে মাত্র। ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে যে প্রেতাত্মার কথা বলা হইয়াছে, তাহা মৃত্যুশয্যাশায়ী মধুসূদনের উপর সেক্সপীয়রের অনুরূপ দৃশ্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কালিদাসের, বিশেষত তাঁহার 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের

প্রভাব হইতে মধুসূদন কোনদিনেই মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। যদিও কালিদাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে 'মায়া-কাননে'র বিষয়বস্তুর সুদূর পার্থক্য আছে, তথাপি যেখানেই সামান্য সুযোগটুকুও আসিয়াছে, সেখানেই তাহার কোন সংলাপ কিংবা কোন চিত্র মধুসূদন এই নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন। আর একখানি সংস্কৃত রচনার নিকট 'মায়া-কানন' নাটকের মৌলিকতা কতকটা বিসর্জিত হইয়াছে, তাহা বাণভট্টের 'কাদম্বরী।' ইহার দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের একটি যুবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তিনজন পুরুষের প্রবেশের চিত্রটি বাণভট্ট রচিত 'কাদম্বরী' নামক গদ্যকাব্যের 'কথামুখম্' অংশ হইতে গৃহীত হইয়াছে। তারপর শেষ দৃশ্যে দৈববাণীতে অজয় এবং ইন্দুমতীর পূর্ব জীবন-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিবার রীতিটিও বাণভট্ট রচিত 'কাদম্বরী' হইতে আসিয়াছে।

*

৩

আত্মকথা

'মায়া-কানন' নাটকের ভিতর দিয়া মধুসূদনের শেষ জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনার অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। তাঁহার জীবনীকার এই সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'মধুসূদন তখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আত্মহত্যা দ্বারা যন্ত্রণার অবসান করিবার ইচ্ছাই তাঁহার হৃদয়ে দিবারাত্র জাগরূক থাকিত। সেই জন্য তাঁহার রচিত গ্রন্থেও তাদৃশভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। যে অবস্থায় সেই সময়, মধুসূদনকে দিনপাত করিতে হইত, এবং যে অবস্থায় তিনি মায়াকানন রচনা করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে ব্যথিত হইতে হয়। রোগের যন্ত্রণায় কখনও কখন, তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন; রক্তবমনে শরীর মধ্যে মধ্যে অবসন্ন হইয়া আসিত, অথচ তাহারই মধ্যে অর্থাভাব কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইবে ভাবিয়া, লেখনী হস্তে যখন যে ভাবটি হৃদয়ে উদিত হইত, তাহা, লিপিবদ্ধ করিতেন। নিজের যখন লেখনী ধারণের সামর্থ্য না থাকিত, তখন কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহার দ্বারা অভিপ্রেত বিষয় লিখাইয়া লইতেন। এ'রূপ ভাবে রচিত গ্রন্থ কতদূর নির্দোষ বা চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই তাহা অবগত আছেন। সেইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, মায়া-কাননের দোষ-গুণ সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করাই সঙ্গত। [যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ৬০৯, ৫ম. সং.]।

আত্মহত্যা দ্বারা নাট্য-কাহিনীর সমাপ্তি নির্দেশ করিবার দৃষ্টান্ত মধুসূদনের নাটকে এখানেই প্রথম নহে, সুতরাং ইহার আত্মহত্যার ঘটনার উপর মধুসূদনের নিজের মনোভাবের ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না। জীবনীকার যে লিখিয়াছেন,

'রুগ্ন অবস্থায় কবির মনে যখন যে ভাবটির উদয় হইত, তাহাই তিনি নাটকে লিখিয়া রাখিতেন', এই কথাও সত্য বলিয়া মনে হয় না; কারণ, 'মায়া-কাননে'র কাহিনীর একটি প্রধান গুণ, ইহার দৃঢ়সংবদ্ধতা; কাহিনীর গঠন কিংবা তাহার অগ্রগতির ধারায় ইহার কোন শৈথিল্য নাই, রচনাও শিথিলবদ্ধ নহে। সুতরাং মধুসূদনের দৈহিক এবং মানসিক অবস্থা তখন যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার শিল্পি-মানস বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতে পারে নাই, তবে তাহাতে পূর্বের শক্তি প্রকাশ পায় নাই, এ কথা সত্য।

সিন্ধুরাজ বিজয়ের প্রণয়-জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতার সুর শুনিতে পাওয়া যায় এ'কথা সত্য, তবে এ'কথাও সত্য, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নায়ক চরিত্র রাবণের মধ্যে বিরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখে সংগ্রাম করিবার যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, বিজয়ের মধ্যে তাহা পায় নাই, তিনি নিয়তির নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়া, এমন কি, নিজের প্রণয়াস্পদকে শত্রুর হস্তে তুলিয়া দিবার ঘৃণিত ব্যবস্থাকেও বাধা দিতে যান নাই। শেষ পর্যন্ত আত্ম-হত্যা করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার আত্মহত্যার মধ্যে কোন মহিমা প্রকাশ পায় নাই। মধুসূদনও তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যপিয়া অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া শেষ পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে ভূ-পতিত হইয়াছেন, কিন্তু নিয়তিকে সত্য জানিয়াও তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। সুতরাং সিন্ধুরাজ বিজয়ের চরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই এবং তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার আত্মজীবন-কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও মনে করা যাইতে পারে না। 'মায়া-কানন' নাটকের নায়িকা চরিত্র ইন্দুমতীর উপর তাঁহার পূর্ব পরিকল্পিত চরিত্র 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র কৃষ্ণকুমারীর সামঞ্জস্য থাকিলেও কবির নিজের জীবনের কোন কথাই তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই বলিয়াই মনে হয়।

'মায়া-কানন' রচনার সময় মধুসূদনের মধ্যে জীবন-বিষয়ে নূতন কিছু চিন্তা কিংবা আশা প্রকাশ করিবার কিছু ছিল না এবং বলিষ্ঠ

আত্মসচেতনাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ এই রচনাটি অন্য একজন দ্বারা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহার মধ্যে মধুসূদনের নিজের জীবন-কথাও যেমন স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় নাই, অন্যের জীবনও অস্পষ্ট হইয়া আছে; কারণ ইহা অতিরিক্ত মাত্রায় রোমান্টিক রচনা। তবে ইহাতে প্রণয়ে যে ব্যর্থতার কথা আছে, তাহাতে তাঁহার প্রথম জীবনের 'আত্মবিলাপ' সুরের বহু দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

৪

নিয়তি ও প্রেম

মধুসূদন জীবনের শেষ পর্যন্ত যে কি ভাবে নিয়তিবাদে বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন, 'মায়া-কানন' তাহার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। নিয়তির নির্দেশ কখনও লঙ্ঘন করা যায় না, ইহার নায়ক-নায়িকার জীবনে এই নির্মম সত্যই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, নিয়তির নিপীড়নে দুইটি মানবাত্মা ইহাতে আর্তনাদ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত যেন মৃত্যুর মধ্যে গিয়া সকল শান্তি লাভ করিয়াছে। মধুসূদনের জীবনের এই শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার এই নাটকের প্রধান চরিত্র দুইটির উপর আরোপ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে।

মধুসূদন গ্রীক্ নাটকের নিয়তিবাদের প্রভাব হইতে কোনদিন উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, ইহার প্রধান একটি কারণ এই যে, সহজেই তিনি ইহার মধ্যে নিজের নিয়তি-লাঞ্ছিত জীবনের সান্ত্বনার সন্ধান পাইতেন। মধুসূদনের জীবনের প্রথম আঘাত অর্থাভাব হইতে আসে নাই। তিনি তাঁহার 'আত্মবিলাপ' কবিতায় যে অর্থাভাবের জন্য বিলাপ করিয়াছেন, তাহা নহে—প্রণয়ে ব্যর্থতার মধ্য হইতে তাঁহার জীবনের প্রথম আঘাত আসিয়াছিল, তাহা রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সঙ্গে বিবাহ না হইবার জন্যই হউক, কিংবা প্রথম বিবাহিত পত্নীর সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যই হউক, প্রেমে ব্যর্থতা হইতেই তিনি তাঁহার জীবনে প্রথম আঘাত পাইয়াছিলেন, ইহার বেদনা তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া স্থায়ী ছিল। 'মায়া-কাননে' তাহার শেষ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

'মায়া-কাননে'র মত আর কোন নাটকে প্রেম এত মর্মদাহী জ্বালা বিস্তার করে নাই। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' প্রেমের অনুভূতি অত্যন্ত সংযত, বিশেষত সে প্রেম গোপনে ছিল বলিয়া বাহিরে তাহার কোন পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। 'পদ্মাবতী নাটকে' যথাযথ

চরিত্র বিকাশের অভাবে প্রেমানুভূতির পরিচয় আরও অস্পষ্ট এবং মানবিক অনুভূতি বিবর্জিত বলিয়া মনে হয়। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' নায়িকা চরিত্রের মধ্যে প্রেমের কোন স্থান নাই, তাহার আত্মহত্যা প্রেমের ব্যর্থতার জন্য নহে, বরং এক নিরুপায় অবস্থার জন্য।

কিন্তু 'মায়া-কানন' নাটকের মধ্যেই প্রেম একান্তভাবে মুখ্য-স্থান অধিকার করিয়াছে। তবে ইহার প্রেম পরস্পরের রূপ-মোহ-জাত, সেইজন্য এই প্রেমে কল্যাণের স্পর্শ ছিল না, তথাপি দুঃখ-তপস্যার ভিতর দিয়া যেমন মোহ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, ইহাতে কেবলমাত্র নিয়তির নির্দেশে তাহাও সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে নাই। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম রূপ-মোহ জাতই ছিল, কিন্তু দুঃখ-তপস্যার ভিতর দিয়া উভয়েরই মোহমুক্তি যখন দেখা দিল, তখন তাহাদের মিলনে আর কোন বাধা রহিল না। কিন্তু 'মায়া-কাননে' দুঃখ-তপস্যা ছিল, কিন্তু তাহা হইতে উত্তরণ ছিল না, প্রেম প্রথম হইতেই অভিশপ্ত হইয়া কেবল দুঃখই দিয়াছে এবং পরিণামে মৃত্যুর মধ্য দিয়া উভয়ের জীবনের জ্বালা জুড়াইয়াছে। একমাত্র নিয়তিই ইহার সমগ্র কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, চরিত্র দুইটি তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া যন্ত্রবৎ ইহার মধ্যে আচরণ করিয়াছে, নিয়তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিবার মধ্যে যে পৌরুষ বিকাশ পাইতে পারে, তাহার কোন পরিচয়ই ইহারা দিতে পারে নাই; বরং আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতার জন্য নায়ক উন্মাদ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা উচ্চাঙ্গ চরিত্র-সৃষ্টির পরিচায়ক হইতে পারে না। কাহিনীটি একটি রূপ-কথার মত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, বাংলা দেশের সুপরিচিত মধুমালা এবং মদনকুমারের রূপকথার মত কাহিনী অগ্রসর হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত যেখানে রূপকথায় মিলন হইবার কথা সেখানে আকস্মিক ভাবে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের উপর মৃত্যু আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্য দিয়া রূপকথার রসও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

এই নাটকের আর একটি প্রধান ত্রুটি, নিয়তি কাহিনীকে

কোন্ পরিণতির সম্মুখে লইয়া যাইবে, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নাট্য-কাহিনীর সূচনাতেই প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার ফলে কাহিনীর পরিণতি সম্পর্কে পাঠকের সকল ঔৎসুক্য দূর হইয়া গিয়াছে। 'মায়া-কানন' সম্পর্কে একটি অলৌকিক বিশ্বাস কাহিনীটিকে আনুপূর্বিক নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; সেইজন্য ইহা কেবলমাত্র নিয়তি-কর্তৃক লাঞ্ছনার চিত্র বলিয়াই মনে হইবে। ইহার অতিরিক্ত ইহা আর কিছু নহে।

৬

বহিঃপ্রভাব

মূলতঃ প্রাচীন গ্রীক্ নাটকের নিয়তিবাদের আদর্শ অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইলেও ইহার মধ্যে আরও বিভিন্ন কতকগুলি বহির্মুখী প্রভাবও স্বীকার করা হইয়াছে। কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের প্রভাব ইহার কোন কোন চিত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অনেক সময় কালিদাসের ভাষার অনুবাদ করা হইয়াছে। যেমন ইন্দুমতীর প্রথম দর্শনে অজয় বলিতেছে।

> শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দেখে রাজা দুষ্মন্তের হৃদয়ই তাঁকে তার পরিচয় দিয়েছিল, 'ঐ যে ঋষি পালিত স্ত্রীরত্ন; উনি কখনই ব্রাহ্মণ-কন্যা নন।' আমার হৃদয়ও তেমনই 'আমাকে এই কথা বল্‌ছে,—তোমার ঐ সঙ্গী বণিক-কন্যা ন'ন'। ১।১

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকেরই অনুসরণ করিয়া মধুসূদন এখানে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রাজদর্শনপ্রার্থী তিনজন নাগরিক এবং একজন স্ত্রীলোকের চিত্র পরিবেষণ করিয়াছেন, পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে 'যুবক যুবতী পরস্পর প্রণয়ানুরাগে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে সমীপস্থ দুর্বাসা মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা না করায়' অভিশপ্ত হইবার কথা লিখিয়াছেন। ভবভূতি প্রণীত 'উত্তর-রামচরিতে'র অনুসরণে ইহাতে মধুসূদন চিত্রদর্শনের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শেষ দৃশ্যের নায়ক-নায়িকার পূর্ব জীবন-বৃত্তান্ত-বর্ণনায় বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র প্রভাব আছে।

সেক্সপীয়রের নাটকের প্রভাব প্রধানত মৃত মহারাজের প্রেত মূর্তির আবির্ভাব দৃশ্যে (তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক) সিন্ধুরাজ বিজয়ের

উন্মাদ দৃশ্যের মধ্য দিয়া (দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দুমতীর মৃত্যু দৃশ্যের মধ্যে মধুসূদন তাঁহার পূর্ববর্তী রচনা 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু দৃশ্যটিকে অনুসরণ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক্ নাট্যকার, কালিদাস এবং সেক্সপীয়রের বিভিন্ন মুখী প্রভাবের ভিতর দিয়া যে ইহাতে একটি ঐক্য সূত্র স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না।

বলাই বাহুল্য, 'মায়া-কানন' রচনার সময় মধুসূদনের পক্ষে মৌলিক প্রতিভার সার্থক পরিচয় প্রকাশ করা আর কোন মতেই সম্ভব ছিল না, তাঁহার নিকট হইতে তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত উপকরণের মধ্যে তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী নাটক কিংবা কাব্যগুলির মধ্যে যেমন একটি সহজ সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিতেন, 'মায়া-কানন' রচনার সময় তাঁহার সেই প্রতিভাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মধুসূদনের প্রতিভা মাধুকরী প্রতিভা, তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনাকে তিনি সে জন্যই নিজেও 'মধুচক্র' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন উপকরণের সার্থক সমন্বয়ের ভিতর দিয়া তাঁহার সকল রচনাই সার্থক হইয়াছে। 'মায়া-কানন' নাটকের ব্যর্থতার কারণ এই যে, তিনি ইহা রচনা কালে তাঁহার সেই মাধুকরী প্রতিভা অনুযায়ী তাঁহার রচনাকে সার্থক করিতে পারেন নাই। ইহার উপকরণগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে।

*

৭

বাঙ্গালীত্ব

মধুসূদনের মধ্যে যে একটি খাঁটি বাঙ্গালীর প্রাণ তাঁহার জীবনের সর্বস্তরেই কি ভাবে অত্যন্ত সজীব ছিল, তাহা তাঁহার অন্তিম জীবনের রচনা 'মায়া-কানন' নাটক হইতেও বুঝিতে পারা যায়। অথচ এ কথা সত্য, 'মায়া-কানন' একান্ত রোমান্টিক ভাবাপন্ন রচনা, ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর জীবন-চিত্র প্রবিষ্ট করাইয়া দিবার কোন অবকাশ ছিল না। মধুসূদন তাঁহার অতীত জীবন-ভিত্তিক রোমান্টিক চিন্তার অবকাশেও বাঙ্গালীর গৃহের প্রত্যক্ষ রূপটিকে তাঁহার সকল রচনাতেই সুযোগ মত স্থান দিয়াছেন, 'মায়া-কাননে'ও তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

দেব-প্রতিমার পায়ে ফুল দিয়া দৈব অভিপ্রায় জানিবার সংস্কার বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটি সাধারণ সংস্কার। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বে তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ভিতর দিয়াও বাঙ্গালী জীবনের এই সংস্কারটির উল্লেখ করিয়াছেন, মধুসূদনও 'মায়া-কানন' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বাঙ্গালীর এই সংস্কারটির পরিচয় দিয়াছেন। অথচ 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনীর যে অংশে উক্ত সংস্কারের উল্লেখ আছে, তাহা বাংলা দেশের জীবন অবলম্বন করিয়া রচিত, সুতরাং তাহাতে ইহা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু মধুসূদন সিন্ধুনগরের একটি সুদূর অতীত সমাজ-জীবনের উপর ইহা আরোপ করিয়াছেন।

বিজয়া দশমীর বেদনার অনুভূতি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে কত গভীর, তাহা মধুসূদন তাঁহার জীবনের সর্বস্তরেই অনুভব করিয়াছেন, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিয়োগান্তক ঘটনা ইহারই উল্লেখ করিয়া যেমন তিনি সমাপ্ত করিয়াছেন, তেমনই 'মায়া-কাননে'র বিয়োগান্তক ঘটনাও তিনি ইহার উল্লেখের মধ্য দিয়াই সমাপ্ত

করিয়াছেন। অথচ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমাজ-জীবনই হোক, কিংবা 'মায়া-কাননে'র সমাজ-জীবনই হোক, কাহারও সঙ্গে বিজয়া দশমীর চিত্রের কোন যোগ ছিল না।

এই কথাটি বিশেষভাবে বলিবার একটি উদ্দেশ্য আছে। মৃত্যু যখন আসন্ন হইয়া আসে তখন মানুষ তাহার জীবনের সকল কৃত্রিম আচরণ হইতে ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে, সেইজন্য মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তির উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'মায়া-কানন' নাটকও মধুসূদনের অন্তিম জীবনের রচনা বলিয়া ইহার মধ্যের অনেক কথা, যাহা তাঁহার অন্তরের অকৃত্রিম বিশ্বাসের কথারূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। মধুসূদন প্রকৃত কি ছিলেন বাহিরের আচার-আচরণের পরিবর্তে সেইখানে তাহার অনুসন্ধান করিলে তাহা জানিতে পারা যাইবে। 'মায়া-কানন' নাটকে মধুসূদন তাঁহার যৌবনের প্রণয়-জীবনের ব্যর্থতার কথা যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, সেইভাবে তাঁহার অন্তরের সুগভীর কয়েকটি বিশ্বাসের কথাও প্রকাশ পাইয়াছে। বিজয়া দশমী সম্পর্কে তাঁহার একটি বিশ্বাস কি ভাবে যে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সর্বত্র, এমন কি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এখানে দেখা যাইবে এবং তাহাতে তাঁহার চরিত্রটির বিশেষত্বও প্রকাশ পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘ। ঐতিহাসিক নাটক

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু লইয়া বাংলা সাহিত্যে কাব্য রচনার প্রবণতা দেখা দিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহারই ধারা যে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে, ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব বশতঃ বাংলা সাহিত্যেও এই বিষয়ে এক নূতন চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছিল। দেবদেবীর পরিবর্তে সেই যুগে বাস্তব জগতের নরনারী সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত হইবার জন্যই যে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, তাহা সত্য। তথাপি মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস-ভিত্তিক কোন উল্লেখযোগ্য রচনা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্' (১৮০৫)-এর মত ইতিহাসাশ্রিত কিংবদন্তী-মূলক রচনা তখন ঐতিহাসিক গ্রন্থরূপে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল। তারপর টডের 'রাজস্থানের কাহিনী' অবলম্বন করিয়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কাব্যরচনার ক্ষেত্রেও তাহার আবির্ভাব দেখা দিল। কিন্তু নাট্যরচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু মধুসূদনই সর্বপ্রথম গ্রহণ করিলেন।

যে নাটক ইতিহাসের তথ্য অবলম্বনে ইতিহাসের কাল এবং পরিবেশ অনুসরণ করিয়া রচিত হয়, তাহাকেই সাধারণত ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। কিন্তু ইতিহাসের তথ্য পরিবেষণই ইহার লক্ষ্য নহে, ইতিহাস নরনারীর জীবনের বহির্মুখী ঘটনার বিবরণ দিলেও অন্তর্মুখী ভাবের উত্থান-পতনের কোন সন্ধান দিতে

পারে না। ঐতিহাসিক নাট্যকারের সেই অংশটুকু কল্পনায় পূর্ণ করিতে হয়। তবে সেই কল্পনায় তাহার স্বাধীনতা থাকে না, এই বিষয়ে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁহার কল্পনাকে ইতিহাসের অনুরাগী করিবার আবশ্যক হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস-চেতনার তখনও জন্ম হয় নাই, সেইজন্য বহু কিংবদন্তীও সেই যুগে ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। জেমস্ টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'ও মূলতঃ তাহাই।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাকেই অবলম্বন করিয়া প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ বাংলা সাহিত্যে যাহাই রচিত হইয়াছে তাহাই ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক সকলই যথাক্রমে ঐতিহাসিক কাব্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং ঐতিহাসিক নাটক বলিয়াই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'র মধ্যে ঘটনার যেমন বৈচিত্র্য ছিল, তেমনই বর্ণনারও আকর্ষণীয় গুণ ছিল, সুতরাং কেবলমাত্র তথ্যের জন্য নহে, ইহার শক্তিশালী বর্ণনার গুণে সে যুগের বাঙ্গালী লেখকগণ এই গ্রন্থখানির প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন, ইহার অনৈতিহাসিকতার কথা বিচার করিবার অবকাশ পান নাই। তবে ইহার পরিবেষিত তথ্যগুলি ঐতিহাসিক রূপে বিবেচিত হইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেইভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই ইহারা ঐতিহাসিক রচনার গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।



এক। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' [১৮৬১]

১

সূচনা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' এক যুগান্তকারী রচনা। প্রথমত ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে ইহাই সর্বপ্রথম রচনা, দ্বিতীয়ত ইহাই বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত নাট্যরীতির আদর্শমুক্ত সর্বপ্রথম নাটক; চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও ইহাতে সর্বপ্রথম গতানুগতিকতামুক্ত মৌলিকতার আভাস পাওয়া যায়। এই সকল বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

অবশ্য টডের 'রাজস্থান'কে যদি ইতিহাস বলিতে পারা যায়, তবেই 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। তবে টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'কে ইতিহাস বিবেচনা করিয়াই উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার ঐতিহাসিক নাটক এবং উপন্যাস রচিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' এবং রমেশচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের মূলও টড্-রচিত 'রাজস্থানের কাহিনী'।

ঐতিহাসিক নাট্যকারের সত্যনিষ্ঠার কঠোর দায়িত্ব সম্বন্ধে মধুসূদন যে কতদূর সচেতন ছিলেন, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত পত্রাংশ হইতেই প্রমাণিত হইবে। কৃষ্ণকুমারীর নাট্যকাহিনীর মধ্যে ঘটনার আরও জটিলতা সৃষ্টি করিবার জন্য যখন মধুসূদনকে পত্র লেখা হয়, তখন তাহার উত্তরে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন,—'To complicate the plot by the introduction of one or more characters (male) would be to complicate it in every sense of the word; for you must remember that the play is a historical one, and to introduce

battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader.'

তদানীন্তন মঞ্চব্যবস্থা এবং রুচির অনুকূলে মধুসূদন ইতিপূর্বে তাঁহার নাট্যপ্রতিভা নিয়ন্ত্রিত করিলেও, এই ঐতিহাসিক নাট্যরচনায় ইহার মূল আদর্শ হইতে যে তিনি ভ্রষ্ট হন নাই, তাহা তাঁহার ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্ঠারই পরিচায়ক।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র অন্যতম মূল্য এই যে, বাংলা ভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য আদর্শে ট্রাজিডি রচনার প্রয়াস। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইতিপূর্বেই সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রভাব সমাজের উপর শিথিল হইয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রকাশিত হইবার ফলে ইহা সংস্কৃত নাট্যরীতির বিরোধী বলিয়া ইহার অভিনয় দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইবার মত দর্শক তদানীন্তন ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজে খুব বেশি ছিল না। বিশেষতঃ ইংরেজি শ্রেষ্ঠ নাটক মাত্রই ট্রাজিডি এবং তাহারই অনুকূলে এদেশের রুচিও গঠিত হইতেছিল। যাঁহারা বাংলা নাটকের উৎসাহদাতা ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ইংরেজি সাহিত্যে সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং সাহিত্যে কিংবা সমাজে প্রাচীন ভারতীয় রীতিনীতিসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কেহই বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন না। অতএব পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুযায়ী রচিত নাটকের রসাস্বাদনের জন্য ইতিপূর্বেই দেশের রসিক-সাধারণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বিশেষত সংস্কৃত নাটকের বৈচিত্র্যহীন নিয়মানুবর্তিতা সকলের পক্ষেই পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংঘাতে সমাজে যে রুচির পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, তাহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে মধুসূদনের সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল। মধুসূদন নিজের প্রতিভাবলে নিজেই অগ্রসর হইয়া গিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নূতন ভাবধারার প্রত্যক্ষ উদ্বোধন করিলেন মাত্র। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে বরং প্রথমে পাঠকসমাজ যে অশ্রদ্ধার সঙ্গে

গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ও আদর্শের দিক দিয়া জাতীয় রীতিবিরুদ্ধ হইলেও তাহাকে সমসাময়িক বাংলার জনসমাজ সেই প্রকার অশ্রদ্ধা ত দূরের কথা বরং পরম ঔৎসুক্যের সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার এই মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও ইহার সাফল্য সম্বন্ধে নাট্যকার পূর্ব হইতে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—'If this tragedy be a success, it must ever remain as the foundation stone of our national theatre'.

ঘটনার দিক দিয়া, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' বৈচিত্র্যহীন। মধুসূদন ইহার কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মূল ঐতিহাসিক কাহিনীই বৈচিত্র্যহীন ('owing to the original barrenness of the plot')। ইহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র বিষয়বস্তু একটি উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রেরণা দান করিতে পারে, কিন্তু নাট্যিক উপকরণ হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হইবার যোগ্য নহে। ইহার কাহিনী একটানা স্রোতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, বিচিত্র ঘটনাবিপর্যয়ের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া তাহা অগ্রসর হইবার সুযোগ পায় নাই। সেইজন্য ইহাতে কোন বাহ্য-সংঘাত সৃষ্টি করিবার অবকাশ পাওয়া যায় নাই; কাব্যের বিষয়বস্তু লইয়া মধুসূদন ইহাতে নাটক রচনা করিয়াছেন।

এই নাটকের আর একটি বিশেষ ত্রুটি এই যে, ইহার কয়েকটি প্রধান চরিত্র যবনিকার অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে—যেমন মরুদেশের রাজা মানসিংহের চরিত্র। মানসিংহ জগৎ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং জগৎ সিংহকেই যদি ইহার নায়ক বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে মানসিংহ ইহার প্রতিনায়ক। কিন্তু প্রতিনায়ক এই নাটকের মধ্যে অনুপস্থিত। যদি কৃষ্ণকুমারীর প্রণয়-ভাজন মানসিংহকে সংস্কৃত নাটকের আদর্শে ধীরোদাত্ত-গুণসম্পন্ন করিয়া কল্পনা করা হইত, তাহা হইলে ইহা দ্বারা জগৎ সিংহের সহিত তাঁহার যেমন বৈপরীত্য সৃষ্টি হইত, তেমনই ইহার বিয়োগান্তক রসও গভীরতর

হইতে পারিত। কাহিনীর দিক দিয়াও এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার অবকাশটুকু নাট্যকার এখানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার মূলেও লেখকের ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা কার্যকরী ছিল। কারণ টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'তে মানসিংহের চরিত্র ধীরোদাত্ত গুণ-সম্পন্ন ছিল না।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র কয়েকটি দৃশ্যে অলৌকিকত্বের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা নাটকের পক্ষে সাধারণত একটি গুরুতর ত্রুটি বলিয়া মনে করা হইলেও, এই ক্ষেত্রে ইহার সৌন্দর্য কতখানি বিনষ্ট করিয়াছে তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। নাটকের পরিণতিটি একটি অলৌকিক স্বপ্ন-বৃত্তান্ত দ্বারা কিয়ৎকাল পূর্বেই সূচিত করা হইয়াছে। স্বপ্ন-বৃত্তান্তকে একটি দৃশ্যের মধ্যে সত্যে পরিণত করা হইয়াছে। সেক্সপীয়রের নাটকেও অলৌকিকত্বের স্থান ছিল ; সমসাময়িক রুচি, সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে বাধ্য। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজেও এই অলৌকিকত্বের উপর বিশ্বাস একেবারে লোপ পায় নাই। এই প্রকার একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র সূচনা হইয়াছিল। অতএব এই সকল অলৌকিক বৃত্তান্তকে কাহিনীর বাহ্যসৌষ্ঠব বলিয়াই গণ্য করা উচিত। কাহিনীর অন্তরের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ নাই, অর্থাৎ নাট্যিক কাহিনী ইহার স্বাভাবিক নিয়মে যথারীতি পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, বাহিরের এই স্বপ্নবৃত্তান্ত দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে নাই। তথাপি কল্পলোকের উপকরণ দিয়া কাব্যসৃষ্টি যতই সার্থকতা অর্জন করে, নাট্যসৃষ্টির মধ্যে তাহা ততই ব্যর্থতা আনিয়া দেয়। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্যেও ইহার নায়িকা-চরিত্রের উপর এই অলৌকিকত্বের প্রভাব ইহার নাট্যিক গুণ যে খর্ব করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে কোন কোন স্বপ্নদর্শনের বৃত্তান্তকে কাহিনীর অঙ্গীভূত মনে না করিয়া বাহ্যিক অলঙ্কার বলিয়া বিবেচনা করিলেই এই নাটকের প্রতি সুবিচার করা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, 'কৃষ্ণকুমারী

নাটকে' মধুসূদন কাব্যের উপকরণ লইয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; সেইজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলা নাটকে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্যেই সুসঙ্গত চরিত্রসৃষ্টির সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে বাংলায় যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটি ব্যতীত বিষয়বস্তু সাধারণত গুরুত্ব-বর্জিত হওয়ার জন্য তাহাতে সমগ্রভাবে কোন চরিত্রসৃষ্টি সুসঙ্গতি লাভ করিতে পারে নাই। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র শর্মিষ্ঠা ও 'পদ্মাবতী নাটকে'র পদ্মাবতী—এই দুইটি চরিত্র কতকটা বাস্তবধর্মী হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সমগ্রভাবে একই নাটকের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রসৃষ্টির সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র পূর্বে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, একই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট করিয়া তোলা নাটকের উদ্দেশ্য হইলেও, প্রত্যেক নাট্যিক চরিত্রই আপেক্ষিক (relative), অর্থাৎ সম্যক্ পরিস্ফুটনের জন্য তাহা চরিত্রান্তরের অপেক্ষা রাখে। .সেইজন্য সমগ্র নাটকের মধ্যে মাত্র একটি চরিত্র পরিকল্পনা সার্থক হইয়া যদি অন্যগুলি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে একটির সার্থকতাও কার্যকরী হইয়া উঠিতে পারে না। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার পূর্বে কোন কোন নাটকে বিচ্ছিন্ন চরিত্র সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিয়া থাকিলেও প্রায় সমগ্র ভাবে নাট্যিক চরিত্র পরিকল্পনার সার্থকতা 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'ই সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। এই দিক দিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই নাটকখানির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

*

২

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র কাহিনী

প্রথম অঙ্ক

জয়পুরের রাজা জগৎ সিংহ বিলাসী এবং রাজকর্ত্তব্যবিমুখ। তিনি বিলাসবতী নাম্নী এক গণিকায় আসক্ত। ধনদাস নামক এক ধূর্ত রাজার অনুচর, যে সর্বদা রাজার ভোগ-জীবনের চরিতার্থতার সহায়ক। সেও বিলাসবতীর প্রতি আসক্তি পোষণ করে। একদিন সে উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর চিত্রপট আনিয়া রাজাকে উপহার দিল এবং বিনিময়ে প্রচুর অর্থ লাভ করিল। রাজা চিত্রপটখানি দেখিয়া কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, ধনদাস এই বার্তা লইয়া উদয়পুররাজ ভীমসিংহের নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

বিলাসবতী রাজাকে প্রকৃতই ভালবাসিত। সে যখন শুনিতে পাইল, রাজা কৃষ্ণকুমারীর রূপযৌবনের খ্যাতি শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়াছেন, তখন সে এই বিবাহে বাধা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। এই বিষয়ে সে তাহার সহচরী মদনিকাকে সহায়িকা রূপে লাভ করিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, কিন্তু মহারাজ সর্বদাই বহিঃশত্রুদ্বারা বিড়ম্বিত; সেইজন্য মহিষী অহল্যা কন্যার বিবাহের বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিবার সুযোগ পান না। মহারাজ সর্বদা উদ্বিগ্ন এবং বিষণ্ণ হইয়া কালযাপন করেন দেখিয়া মহিষীও অন্তরে তাঁহার জন্য গভীর বেদনা বোধ করেন।

বহুদিন পর রাজা ভীমসিংহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রদিগের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে সন্ধি ক্রয় করিয়া সাময়িক

নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। মহিষী কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। কিন্তু মহারাজের মধ্যে এই বিষয়ে কোন ব্যস্ততা দেখা গেল না। কৃষ্ণকুমারী আসিয়া পিতাকে অনুযোগ করিল, তিনি অনেকদিন তাহার উদ্যানে আসেন নাই, সেদিন যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু সেদিনও তিনি অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, রাজকার্যের আহ্বানে পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এদিকে মদনিকা কৌশলে এক জাল পত্র দিয়া মরুদেশের রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর প্রতি আসক্ত করিল। মানসিংহ তাহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে ভীমসিংহের নিকট দূত পাঠাইলেন। মদনিকা পুরুষের ছদ্মবেশ ধরিয়া উদয়পুরে গেল, সেখানে জগৎ সিংহের দূত ধনদাসকে অপমানিত করিল এবং এক জাল চিত্রপট দিয়া কৃষ্ণকুমারীর হৃদয় মানসিংহের দিকে আকৃষ্ট করিল।

তৃতীয় অঙ্ক

মদনিকার কৌশলে কৃষ্ণকুমারীর মন মানসিংহের প্রতি এমন আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তিনি 'জগৎ সিংহের নাম শুনে একেবারে যেন জ্বলে উঠেন।' মদনিকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া সে জয়পুরে ফিরিয়া গেল।

তপস্বিনী কপালকুণ্ডলা কৃষ্ণকুমারীর মনোভাব জানিতে পারিয়া রাণী অহল্যাকে জানাইলেন। ভীমসিংহ স্থির করিয়াছিলেন যে জয়পুরের রাজা জগৎ সিংহকেই কন্যা সমর্পণ করিবেন ; কারণ, তিনি প্রথমেই দূত পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর মনোভাব জানিতে পারিয়া তিনি বিপন্ন বোধ করিলেন। এদিকে মহারাষ্ট্রপতি মানসিংহকে সমর্থন করিয়া উদয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জয়সিংহ এবং মানসিংহ প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কৃষ্ণাকে না পাইলে তাহারা উদয়পুর ধূলিসাৎ করিবেন। রাজা ভীমসিংহের আত্মরক্ষার কোন সামর্থ্য নাই।

চতুর্থ অঙ্ক

মন্ত্রী জগৎ সিংহকে আত্মীয়বিবাদ হইতে বিরত হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না, তিনি রাজা মানসিংহের এক জ্ঞাতি শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়া মানসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

মদনিকা জয়পুরে আসিয়া বিলাসবতীকে তাহার সফলতার কথা জানাইল। জগৎ সিংহ কয়েকদিন বিলাসবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহার নিকট আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ধনদাসের ষড়যন্ত্রের কথা তিনি বুঝিতে পারিলেন। সে যে নিজের স্বার্থপরবশ হইয়া জগৎ সিংহ এবং ভীমসিংহের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা জানিতে তাহার বাকি রহিল না এবং রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিলেন। কিন্তু আত্মমর্যদারক্ষার জন্য যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চম অঙ্ক

'রাজা মানসিংহ অসিস্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছেন' যে, হয় তিনি কৃষ্ণাকে বিবাহ করিবেন, নতুবা উদয়পুরকে ভস্মসাৎ করিবেন। 'রাজা জগৎ সিংহেরও এই পণ।' ভীমসিংহ বিলাপ করিতে লাগিলেন, কেন কৃষ্ণা তাহার ঘরে জন্মিয়াছে!

রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহ আসিয়া সংবাদ দিলেন, 'যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী উভয়েই মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন।' শুনিয়া ভীমসিংহ নিজের মৃত্যু কামনা করিলেন। বলেন্দ্র সিংহও অনুভব করিলেন, 'এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মানুষের অসাধ্য।'

মন্ত্রী কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার পরামর্শ দিলেন। 'ইহা মনুষ্যের কর্ম নহে' বলিয়া বলেন্দ্র সিংহ অস্বীকার করিলেন। রাজা এই কথা মনে করা

মাত্র মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, তারপর বলেন্দ্র সিংহের উপর ইহার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াই নিজে উন্মাদ হইয়া গেলেন।

বলেন্দ্র সিংহ কৃষ্ণার শয়ন-গৃহে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে খড়্গ তুলিলেন; সেই মুহূর্তে কৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল এবং পিতৃব্যকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইল; তারপর যখন জানিতে পারিল, পিতাই তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তখন কৃষ্ণা নিজেই খড়্গাঘাতে আত্মঘাতিনী হইয়া সকল বিবাদের অবসান ঘটাইল। মহিষীও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজা ভীমসিংহ উন্মাদ হইয়া গেলেন।

*

৩

টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'তে কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গ

জেমস্ টড্ প্রণীত *Annals and Antiquities of Rajasthan* (London, 1829) গ্রন্থের একটি প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিয়াছেন। ইহার যে অংশটি মধুসূদন অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

রাণা ভীমসিংহের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছিল। ভাগ্য তাঁহাকে চরম লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল ; কিন্তু রাজা হিসাবে তাঁহার অভিমান, এমন কি পিতা হিসাবে তাঁহার গৌরবের কঠিনতর আঘাত পাইবার তখনও বাকি ছিল। রাজধানীর অনতিদূরেই জয়পুর রাজের বরশোভাযাত্রীদল তাঁবু করিয়াছিল, তাহার দলে প্রায় তিন হাজার লোক ছিল, রাজকুমারীকে রাজা জগৎ সিংহের নিকট সম্প্রদান করিবার সম্মতি পূর্বেই সেখানে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মাড়োয়ারের রাজা মানসিংহ রাজকুমারীর উপর এই বলিয়া নিজের দাবী উপস্থিত করিলেন যে, উদয়পুরের রাজকুমারীকে পূর্বেই মাড়োয়ারের সিংহাসনের অধিকারীর নিকট বাগ্দত্তা করা হইয়াছিল ; সুতরাং মাড়োয়ারের সিংহাসনের অধিকার যাহার উপরই ন্যস্ত হইবে, তিনিই রাজকুমারীকে লাভ করিবেন। যদিও মানসিংহের পূর্ববর্তী রাজার নিকটই কৃষ্ণকুমারীকে বাগ্দত্তা করা হইয়াছিল, তথাপি তাহার অকাল মৃত্যুর জন্য বর্তমানে যিনি মাড়োয়ারের সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছেন, মানসিংহের মতে কৃষ্ণকুমারী তাহারই প্রাপ্য। কারণ, রাজা মানসিংহ মনে করেন যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তে মাড়োয়ারের সিংহাসনের যিনিই অধিকারী হইবেন, ন্যায়তঃ তিনিই রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের অধিকারী। সুতরাং মানসিংহ যদিও অন্যায়ভাবে মাড়োয়ারের

সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করিবার দাবী উপস্থিত করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই দাবী যদি তাঁহার পূর্ণ না হয়, তবে তিনি উদয়পুরের বিরুদ্ধে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। মাড়োয়ারের রাজসভাসদ্‌গণ, চন্দাবৎ-দিগের প্রতিনিধি অজিত ইহারা সকলেই মাড়োয়ারের সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর পরিবর্তে মানসিংহের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অজিতকে এই উদ্দেশ্যে উৎকোচ দিয়া প্রভাবিত করা হইয়াছিল।

রাজকুমারীর নাম কৃষ্ণকুমারী। তাহার পাণিপ্রার্থিরূপে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া জয়পুরের জগৎসিংহ এবং মাড়োয়ারের রাজা মানসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণকুমারী প্রাচীন কালের হেলেনের মতই যেন নিজের এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপরিবারের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। জয়পুর কর্তৃক মহারাষ্ট্রপতি সিন্ধিয়ার একটি আর্থিক দাবী পূর্ণ না করিবার জন্য সিন্ধিয়া এই বিবাহে জয়পুরের দাবীর বিরোধিতা করিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি রাজা মানসিংহের দাবী সমর্থন করিলেন এবং জয়পুরের দূতকে বিদায় করিয়া দিবার জন্য দাবী করিলেন। রাণা ভীমসিংহ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে তিনি তাঁহার রণসম্ভার লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া গেলেন, রাণা নিজের এবং জয়পুরের সৈন্যের সাহায্যে তাহাকে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইলেন; তারপর মানসিংহ আট হাজার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া উদয়পুরের নিকটবর্তী স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে কামানের গোলা ছুঁড়িলে উদয়পুরে গিয়া তাহা পৌঁছাইয়া যায়। রাণা ভীম সিংহের পক্ষে জগৎ সিংহের সঙ্গে কন্যার বিবাহের যে সম্মতি দিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়া অন্যপক্ষের দাবী স্বীকার করা ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। সিন্ধিয়া সৈন্য-সামন্তসহ একমাস সেখানে বাস করিলেন, একদিন একলিঙ্গের মন্দিরে তাহার সঙ্গে রাণার সাক্ষাৎকার হইল।

জয়পুরের রাজা বিবাহে এইভাবে নিরাশ হইবার ফলে তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন এবং এক বৃহৎ সৈন্য সমাবেশ করিলেন। রাজা মানসিংহও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সিংহাসনের অধিকার লইয়া মাড়োয়ারে বিবাদের সূচনা হইল, তাহার ফলে সেখানে মানসিংহের বিরোধী দলের উদ্ভব হইল। মহারাষ্ট্রগণও সেখানে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই বিবাহের ব্যাপারে মতবিরোধ আরও স্পষ্ট হইল এবং সেখানে যাঁহারা মানসিংহের বিরোধী পক্ষীয় ছিলেন, তাঁহারা আরও সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। বিরোধী পক্ষীয়েরা জয়পুরের জগৎ সিংহের দিকে যোগ দিলেন। তাঁহারা মাড়োয়ারের সিংহাসনের একজন উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া তাহাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তাহার স্বপক্ষে লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মানসিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া গেলেন। মানসিংহের সৈন্যসংখ্যা তাহার প্রায় অর্ধেক ছিল, পূর্বোস্তির নামক স্থানে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। মাড়োয়ারের অধিকাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তি সদলে মানসিংহের বিরুদ্ধে গেলেন। মানসিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কোন মতে পলাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার অনুসরণ করিয়া শত্রু-সৈন্য রাজধানী অবরোধ করিল। ছয় মাস শত্রুকে বাধা দেওয়া হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজধানী অধিকৃত হইয়া লুণ্ঠিত হইল। তারপর তাহাদের নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি হইল, জয়পুরের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল, জগৎসিংহ তাঁহার রাজধানীতে পলাইয়া গেলেন।

নবাব আমীর আলি নামক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শয়তানের সাহায্যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মানসিংহ শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিলেন। আমীর আলি পূর্বে মানসিংহের শত্রুপক্ষীয়দিগের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পরে মানসিংহের পক্ষে যোগদান করেন।

মানসিংহ নিজের অবস্থার পুনরুদ্ধার করিয়া লইবার পর এই যুদ্ধের শেষ মীমাংসার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; কারণ,

কৃষ্ণকুমারীর উপর তাঁহার অধিকার তিনি ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। জগৎ সিংহও তাহার উপর হইতে তাহার দাবী পরিত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। আমীর আলি মানসিংহকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এইবার রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য উদয়পুরে স্থানান্তরিত হইল। উদয়পুরের আকাশে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ দেখা দিল।

কৃষ্ণকুমারীর বয়স তখন মাত্র যোল। তাহার জননী চৌউরা রাজপুত বংশের কন্যা। উচ্চ রাজবংশের কন্যা সন্তান কৃষ্ণকুমারী দৈহিক রূপ-লাবণ্য এবং স্বভাব-গুণে 'রাজস্থানের পুষ্প' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। যদিও আজ বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহার নীরব আত্মদানের করুণ কাহিনী রাজস্থানের অধিবাসীরা এখনও অশ্রুজলের সঙ্গে স্মরণ করিয়া স্খলিত বচনে কীর্তন করিয়া থাকে।

রক্তপিপাসু শয়তানের চর পাঠান আমির আলি উদয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেখানে সে সুচতুর অজিত সিংহের সঙ্গে মিলিত হইল। পাঠান তাহার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল যে, রাজকুমারী কৃষ্ণা রাজা মানসিংহকে বিবাহ করুক, অথবা মৃত্যু-বরণ করুক। রাণা ভীমসিংহ মানসিংহের হাতে কন্যাকে সমর্পণ না করিলে তাহার পরিণাম কি ভয়াবহ হইতে পারে, তাহা মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন; তিনি যখন বুঝিলেন, তাঁহার প্রাসাদ ধ্বংস করিয়া শত্রু কৃষ্ণার চরম অপমান করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, মৃত্যুই কৃষ্ণার ভাগ্য-নির্দিষ্ট; ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার তাহার কোন উপায় নাই।

কিন্তু কোনও পুরুষ তাহাকে হত্যা করিতে অসমর্থ হইল, নারী দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইল। উদয়পুরের সম্মান রক্ষার নামে মহারাজ দৌলত সিংকে এই কার্যের ভার লইবার কথা প্রথমে বলা হইয়াছিল, রাণার পিতৃবংশের সঙ্গে তাহার চারি পুরুষের ব্যবধান মাত্র। তিনি শুনিবা মাত্র ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এ'কথা যে বলে

তাহার জিহ্বা খসিয়া পড়ুক। এইভাবে যদি আমার রাণার আনুগত্য রক্ষা করিতে হয়, তবে সেই আনুগত্যে ধিক্’। রাজ-ভ্রাতা মহারাজ জোয়ান দাসকে এই উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হইল। ইহার একান্ত আবশ্যকতার কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলা হইল, আরও বলা হইল যে, সাধারণ লোক এই কাজ করিতে পারিবে না, সুতরাং ইহার ভার তাঁহাকেই লইতে হইবে। তিনি অবশেষে স্বীকৃত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু যখন যৌবনের লাবণ্যে পরিপূর্ণ ক্রীড়াময়ী কৃষ্ণা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হাস্যমুখে আবির্ভূত হইল, তখনই তাহার হাত হইতে ছুরিকা মাটিতে খসিয়া পড়িয়া গেল। কৃষ্ণা অপেক্ষাও তাহার মনের ভাব শোচনীয় হইল, তিনি অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। রাজমহিষী যখন এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার আর্তনাদ প্রাসাদের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল। তিনি কৃষ্ণার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। কৃষ্ণা ভাগ্যের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া রহিল।

হত্যার ষড়যন্ত্র বন্ধ হইল, কিন্তু একেবারে পরিত্যক্ত হইল না। অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুর পরিবর্তে বিষপানে মৃত্যুর আয়োজন হইতে লাগিল। নারীর হস্তে এইবার বিষ প্রস্তুত হইল, পুরুষ এই কার্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। পিতার নাম করিয়া পরিপূর্ণ বিষপাত্র যখন তাহার হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল, তখন নতমস্তকে কৃষ্ণা তাহা গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে পান করিল, তাহার পূর্বে নিজের জন্য একবার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল। উন্মত্ত জননী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, সুন্দরী কৃষ্ণা এক বিন্দু অশ্রুপাত করিল না, বরং জননীকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল, ‘কেন দুঃখ পাও, মা! আমার জীবনের দুঃখ ত আমি শেষ করিতে চলিতেছি, মরিতে আমি ভয় করি না। আমি কি তোমার কন্যা নই? আমি কেন মৃত্যুকে ভয় করিব? জন্ম হইতেই আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত! সংসারে প্রবেশ করিয়াই আমরা বিদায় লইয়া যাই, আমি যে এতদিন বাঁচিয়া ছিলাম, সেইজন্য আমার পিতার নিকট আমি ঋণী।’

যতক্ষণ বিষ রক্তে না মিশিতেছিল, ততক্ষণ কৃষ্ণা কথা বলিল। আর এক পাত্র বিষ তাহার হাতে দেওয়া হইল, সে তাহাও পান করিল, কিন্তু রক্তে যেন বিষ কিছুতেই মিশিতে চাহিতেছিল না। মানুষের সহিষ্ণুতার চরম অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন তৃতীয় পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার হাতে বিষ দেওয়া হইল, এইবার ভয়াবহ পরিণতি হইতে কৃষ্ণার প্রাণ প্রকৃতি আর রক্ষা করিতে পারিল না। রক্তলোলুপ পাঠান এবং অজিত সিংহ কৃষ্ণার শেষ মুহূর্তের জন্য অধৈর্য হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং নিষ্ঠুরতা যেন বার বার পরাজিত হইয়া প্রবলতম বিক্রমে শেষ বারের মত তাহাকে প্রচণ্ডতম আঘাত করিয়া ধরাশায়ী করিল। কশুম্ব নামক এক মারাত্মক পানীয় তাহার উপর বিষরূপে প্রয়োগ করা হইল। কৃষ্ণা করুণ হাস্যে তাহা হাত পাতিয়া লইল, ভাবিল, এইবার যবনিকাপাত হোক, তারপর ধীরে ধীরে তাহা পান করিল। নিষ্ঠুরতম হৃদয়হীন আচরণ নিষ্পন্ন হইল। কৃষ্ণা ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার সেই ঘুম আর ভাঙ্গিল না।

হতভাগিনী জননী কন্যার মৃত্যুর পর আর বেশি দিন বাঁচিলেন না। দেহ ও মনের সকল শক্তি তাঁহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, তিনি আহার পরিত্যাগ করিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রাণহীন দেহ তাঁহার কন্যার অনুগামী হইল।

*

৪

মূলের সঙ্গে সম্পর্ক

যদিও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে মধুসূদন ঐতিহাসিক নাটকরূপেই রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, তথাপি ইহার রচনায় তিনি টড বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে যে সুনিবিড় ঐক্য রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ মূল কাহিনীতে দেখা যায়, মাড়োয়ারের রাজা মানসিংহের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, তাঁহার আচার-আচরণ নাটকীয় সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুসূদন তাঁহার কাহিনী হইতে এই চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মানসিংহ জগৎ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র এবং কাহিনীর করুণ পরিণতির জন্য মানসিংহ-ই সর্বাধিক দায়ী। সুতরাং টডের কাহিনী অনুসরণ করিয়া মধুসূদন যদি তাঁহার নাট্যকাহিনীতে তাহার স্থান রক্ষা করিতেন, তবে তাঁহার নাটকের নাট্যগুণ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইত, তথাপি মধুসূদন এই চরিত্রটিকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

এই বিষয়ে একটি অনুমান করা যাইতে পারে। মধুসূদন যে বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিতেছিলেন, তাহাতে মানসিংহের মত চরিত্র অভিনয় করিবার মত ব্যক্তির হয় ত অভাব ছিল; সেইজন্য তিনি চরিত্রটিকে নেপথ্যে রাখিয়াই তাঁহার নাট্যকাহিনীর পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নাটকে একটি গুরুতর ত্রুটি অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, মানসিংহ এই নাটকের একটি প্রধান চরিত্র—নাট্যকাহিনীর মর্মান্তিক পরিণতির জন্য তাঁহার যতটুকু দায়িত্ব ছিল, অন্য কাহারও তত ছিল না। বিশেষ জেম্‌স্‌ টডের কাহিনীতে এই চরিত্রটি একটি অতি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মধুসূদন তাঁহার নাট্য-

কাহিনী পরিকল্পনা করিবার ফলে তাঁহার কাহিনীর শক্তি যথাযথ প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

জেম্‌স্ টডের কাহিনীতে দেখা যায়, পাঠান আমির খানের চরিত্রটিই প্রকৃত খল (villain) চরিত্র। এমন কি, টডের বর্ণনাতেও তাহার একটি জীবন্ত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও মধুসূদন এই চরিত্রটিকেও তাঁহার নাটকের কাহিনী হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বরং তাহার পরিবর্তে ধনদাস নামক একটি চরিত্রকে খল (villain) রূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আমির আলির চরিত্রকে জেম্‌স্ টড যে ভাবে তাঁহার কাহিনীতে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এক জীবন্ত নাটকীয় রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং এই কাহিনীতে কোন খল চরিত্র কল্পনা করিয়া সৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা ছিল না। পাঠান আমির আলিকে টডের পরিকল্পনা অনুযায়ী উপস্থিত করিলেই তাহা দ্বারাই নাটকের খল চরিত্রের প্রয়োজন মিটিতে পারিত। তবে পাঠান আমির আলিকে এই নাটকের চরিত্র হিসাবে উপস্থিত করিবার সম্পর্কেও সম্ভবতঃ মধুসূদনের আশঙ্কা ছিল যে, কোন মুসলমান চরিত্র হয়ত বেলগাছিয়া নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকদিগের অনুমোদন লাভ করিতে পারিবে না; কারণ, ইতিপূর্বে তাঁহার 'রিজিয়া নাটকে'র পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহার সেই অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। সেইজন্য ইতিহাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় চরিত্রের সন্ধান পাওয়া সত্বেও মধুসূদন ধনদাস নামক একটি হিন্দু চরিত্রের কল্পনা করিয়া তাহাকে দিয়া খল-চরিত্রের আচরণ নিষ্পন্ন করাইয়াছেন। এখানে মধুসূদনের মূলের আনুগত্য স্বীকার করিবার পক্ষে কোন বাধা না থাকিলেও অবস্থার দাসত্ব স্বীকার করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। একটি বিরাট নাট্য-সম্ভাবনাপূর্ণ ঐতিহাসিক চরিত্রকে পরিত্যাগ করিয়া কল্পনা-সৃষ্ট এক দুর্বল চরিত্রের তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

জেম্‌স্ টডের কাহিনীতে বিলাসবতী কিংবা তাহার অনুরূপ

কোন চরিত্রের কোন উল্লেখ নাই। মধুসূদন তাঁহার এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'তে জগৎ সিংহের এক গণিকার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার যে অংশের উপর নির্ভর করিয়া মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জগৎ সিংহের কোনও গণিকার উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং মনে হয়, ইহা মধুসূদনের সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিকল্পনার ফল, টডের কাহিনীর সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

জেম্‌স্ টডের রাজস্থানের কাহিনীতে মদনিকা কিংবা তাহার অনুরূপ কোন চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন কি, টডের কাহিনী পাঠ করিলে দেখা যায়, ইহার যে পরিবেশ তাহার মধ্যে এই প্রকার দুঃসাহসী কোন নারীচরিত্রের আবির্ভাবের অবকাশ খুব বেশি নাই। রাজপুত রমণীরা পাঠান আমল হইতেই সম্পূর্ণ অসূর্যম্পশ্যা, বহির্মুখী জীবনে তাহাদের অধিকার অত্যন্ত সঙ্কুচিত। সুতরাং ইহার পরিবেশে মদনিকার আচরণ অসম্ভব এবং অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। মধুসূদন এই চরিত্রটিকে নিজের কাহিনীর প্রয়োজনীয়তায় সৃষ্টি করিয়াছেন, রাজস্থানের কাহিনীর সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই।

মদনিকার কথায় কৃষ্ণকুমারী মানসিংহের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মধুসূদন উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু টডের রাজস্থানের কাহিনীতে কৃষ্ণকুমারীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, তাহার বয়স মাত্র তখন ষোল। তাহার মনের মধ্যে কাহারও প্রতি কোন প্রেমানুভূতির তখন পর্যন্ত সঞ্চারই হয় নাই। সে তখনও পুষ্পের মত নির্মল ও পবিত্র, কামনা-বাসনা তখনও তাহার অন্তরে কোন দাগ কাটিতে পারে নাই। সেইজন্য তাহার করুণ পরিণতি এত মর্মস্পর্শী; টডের বর্ণনায় এই করুণ রসটি যথাযথ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মধুসূদন টডের কাহিনীর ব্যতিক্রম করিয়া এখানে কৃষ্ণকুমারীকে পিতার সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে মানসিংহের প্রতি সুগভীর আসক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; এমন কি,

বালিকা তাহার এই আসক্তির কথা নির্লজ্জভাবে তপস্বিনীর নিকট প্রকাশ করিয়াছে। টড পরিকল্পিত কৃষ্ণকুমারী তাহা নহে, সেখানে সে নীরবে সহ্য করিয়াছে, হাসিয়া বিষ পান করিয়াছে, নিজের কোন কামনা-বাসনার চিহ্ন দ্বারা তাহার নির্মল চিত্তলোক আবিল করিয়া তুলে নাই। টডের ভাষায় 'meekness of her suffering'-ই তাহাকে মহীয়সী করিয়াছে। তাহার সরল শিশুপ্রকৃতির মধ্যে কোন পরিণত বুদ্ধির স্পর্শ লাগে নাই। কিন্তু মধুসূদন তাহার কৃষ্ণকুমারীকে প্রণয়িনী চরিত্ররূপে উপস্থিত করিয়াছেন। সে এক জাল চিত্রপট দেখিয়াই মানসিংহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই আকর্ষণের কথা তাহার বয়োজ্যেষ্ঠাদিগের নিকটও গোপন রাখিতে পারে নাই। সুতরাং তাহার মধ্যে শিশুসুলভ সরলতার অভাব দেখা দিয়াছে।

টডের বর্ণনায় কৃষ্ণকুমারী বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছে, কিন্তু মধুসূদনের নাটকে সে খড়্গাঘাতে আত্মঘাতিনী হইয়াছে। টডের বর্ণনার গুণে কৃষ্ণকুমারীর বিষপানে মৃত্যুর দৃশ্যটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে, মধুসূদনের খড়্গাঘাতে আত্মহত্যার মধ্য দিয়া সেই করুণ রস যথাযথ প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বিষপানে আত্মহত্যার পরিবর্তে খড়্গাঘাতে আত্মহত্যা অস্বাভাবিক বলিয়াই ইহা করুণ রসের বর্ণনায় তত সার্থক নহে।

বলেন্দ্র সিংহের নামটি জেম্‌স্ টডের রাজস্থানে নাই, তাহাতে মহারাজ জওয়ান দাস নামটি পাওয়া যায়, তাহাকেও ভীমসিংহের natural brother-ই বলা হইয়াছে। তথাপি নামটি পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তপস্বিনী চরিত্রটিও জেম্‌স্-এর রাজস্থানে নাই, মধুসূদন নিজ প্রয়োজনে তাহাকে উদ্ভাবন করিয়াছেন ; কিন্তু কাহিনীর সঙ্গে ইহার সুনিবিড় যোগ স্থাপন করিতে পারেন নাই।

টডের রাজস্থানের কাহিনীতে রাণা ভীমসিংহের পত্নীর কোন নামোল্লেখ নাই। মধুসূদন তাহাকে অহল্যা বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন। টডের রচনায় মহিষী সামান্য স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও তাঁহার চরিত্র যত করুণ এবং বাস্তবধর্মী হইয়াছে, মধুসূদনের রচনায় অহল্যা বিস্তৃততর অংশ অধিকার করিয়াও সেই গুণের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই। টড কেবল কাহিনীই বর্ণনা করেন নাই, কাহিনীকে জীবন্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনার মধ্যে নাটকীয় গুণ এবং কবিত্ব উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রধানতঃ কাব্যগুণ বর্জিত রচনা। কৃষ্ণকুমারীর প্রতি সহানুভূতি মধুসূদন অপেক্ষা টডের কম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। টডের রচনায় কৃষ্ণকুমারীর শেষ দৃশ্যের বর্ণনা অতুলনীয়, মধুসূদনের বর্ণনা সেই তুলনায় নিষ্প্রভ।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, মধুসূদন যে টডের রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বন করিয়াই তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিয়াছিলেন, সে' কথা তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত তাহার এক পত্রে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, 'The plot is taken from Tod, Vol I p. 461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumary'. কেহ আবার লিখিয়াছেন, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিধিধার্থ সংগ্রহে' ১৭৭৯ শকাব্দের পৌষ সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' নামক যে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহা হইতে তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র বিষয়বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন।' কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে যে কৃষ্ণকুমারীর কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র নায়িকা চরিত্রের কোন সম্পর্ক নাই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী মিলনাত্মক, কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী বিয়োগাত্মক, অন্যান্য বিষয়েও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশেষত মধুসূদন নিজে যেখানে টডের 'রাজস্থান কাহিনী' তাঁহার উৎসরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার কথা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

৫

ঐতিহাসিক মূল্য

জেম্‌স্‌ টডের রাজস্থানের কাহিনীকে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াই মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ঐতিহাসিক নাটকরূপে কতদূর সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা বিচার করা যাইতে পারে। অবশ্য এই কথা সত্য, টডের রাজস্থানের কাহিনী পরবর্তী গবেষণায় ঐতিহাসিক বলিয়া গৃহীত হয় নাই ; কিন্তু তথাপি মধুসূদন ইহাকে যে ঐতিহাসিক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেইভাবেই ইহাকে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কয়েকটি উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। কাহিনীর মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তিনি তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন, 'you must remember that the play is a historical one,' দুই এক বার ইহাকে Historical Tragedy বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

যদিও আরও দুই একটি কল্পিত চরিত্রকে স্থান দিলেও 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কথা ছিল না, তথাপি মধুসূদন এখানে ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কে যে কতখানি সতর্কতা দেখাইতে চাহিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতে দেখা যাইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র এগারটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে ছয়টিই অনৈতিহাসিক এবং পাঁচটি মাত্র ঐতিহাসিক। অর্থাৎ ভীমসিংহ, বলেন্দ্র সিংহ, জগৎ সিংহ, অহল্যা-দেবী, কৃষ্ণকুমারী এই পাঁচটি চরিত্র ঐতিহাসিক, ইহাদের মধ্যেও বলেন্দ্র সিংহ এবং অহল্যা দেবী নাম দুইটি ঐতিহাসিক নহে, তারপর সত্যদাস, নারায়ণ মিশ্র (রাজমন্ত্রী), ধনদাস, তপস্বিনী, বিলাসবতী, মদনিকা এই ছয়টি চরিত্রই অনৈতিহাসিক। মধুসূদন অবশ্য তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, বিলাসবতী চরিত্রটির একটি ইঙ্গিত

টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'তে পাওয়া যায়; সেখানে তাহার নাম 'Essence of Camphor' তথাপি উপরে রাজস্থানের কাহিনী হইতে কৃষ্ণকুমারীর যে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ কোন চরিত্রের উল্লেখ নাই। অন্যত্র অর্থাৎ কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গ বহির্ভূত অবস্থায় যদি থাকে, তবে তাহা এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং নাটকের এগারটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে ছয়টি চরিত্রই অনৈতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও যদি এই নাটক ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তবে আরও দুই একটি অনৈতিহাসিক চরিত্র ইহাতে স্থান পাইলেও ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে ইহার কোন ত্রুটি প্রকাশ পাইবার কথা ছিল না। অতএব অন্য কোন কারণে মধুসূদন কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি করেন নাই, ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবের জন্য নহে।

প্রথমেই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক মর্যাদা কতদূর রক্ষা পাইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে; কারণ, ইহার উপরই ঐতিহাসিক নাটকের সার্থকতা প্রধানত নির্ভর করিতেছে।

রাজস্থানের কাহিনীতে ভীমসিংহের চরিত্র মধুসূদন যেমন পাইয়াছেন, তেমনই রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার বিপর্যস্ত অবস্থার উপরই কাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। রাজ্যের আভ্যন্তরিক দুর্বলতার জন্য তিনি বহিঃশত্রুকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিতেছেন, ইহার ফলাফল সম্পর্কে তিনি অচেতন নহেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মূল ঘটনা কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিবার কার্যে তাহার সম্মতি দান। এই বিষয়ে রাজস্থানের কাহিনীতে যাহা আছে, তাহা এই,—'When the Pathan (Amir Khan) revealed his design, that either the princess should wed Raja Man, or by her death seal the peace of Rajwarra, whatever arguments were used to point the alternative, the Rana was made to see no choice

between consigning his beloved child to the Rahtore prince, or witnessing the effects of a more extended dishonour from the vengeance of the Pathan, and the storm of his palace by his licentious adherents ;— the fiat passed that Kisna Komari should die'.

এখানে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিবার প্রয়োজনীয়তার অনিবার্যতা যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' তাহা সেইভাবে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' পাঠান আমীর খাঁর প্রসঙ্গ একেবারে নাই, অথচ এখানে দেখা যায়, সে-ই কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিবার জন্য মূলতঃ দায়ী। মন্ত্রী কর্তৃক প্রদর্শিত একটি বেনামী পত্রের উপর নির্ভর করিয়া রাজা ভীমসিংহ 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' এই ভয়ঙ্কর প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতেছেন। এখানে মন্ত্রী রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য এক বেনামী চিঠির নাম করিয়া এই নৃশংস কার্যে রাজাকে সম্মত করাইবার প্রয়াস পাইয়াছে, রাজা উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত তাহার স্বাভাবিক অবস্থা আর ফিরিয়া আসে নাই; সেই অবস্থায় হত্যা কর্ম সাধিত হইয়াছে। তবে উন্মত্ত হইবার পূর্বে মন্ত্রীর কথায় একবার মাত্র বলিয়াছিলেন, 'না না, কৃষ্ণা থাক্‌তে এ বিবাদ যে মেটে এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হ'লেও সর্বনাশ।' তারপর বলেন্দ্র সিংহের একটি উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি রাণার পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে এই কার্য তিনি সাধন করিবেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভীমসিংহের উপর মধুসূদন প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষ্ণার হত্যার অনুমতি দিবার দায়িত্ব আরোপ করিয়াছেন, রাজস্থানের কাহিনীতে ঘটনা এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে, উপস্থাপিত ঘটনা দ্বারাই এই ভয়ঙ্কর কর্মের অনিবার্যতা প্রকাশ পাইয়াছে; অসহায় ভীমসিংহ ঘটনার নীরব দ্রষ্টা মাত্র হইয়াছেন। তাঁহার অনুমতির আর কোন অপেক্ষা ছিল না; কারণ, ঘটনা

প্রবাহকে রোধ করিবার কোনই শক্তি তাঁহার ছিল না। এই ক্ষেত্রে টডের পরিকল্পনা যে অধিকতর সার্থক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মধুসূদন তাহার ধারা অনুসরণ না করিবার জন্য এই বিষয়ে তাহার শিল্পগত ত্রুটি যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই ইতিহাসগত ত্রুটিও প্রকাশ পাইয়াছে।

টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'তে ভীমসিংহ কখনও উন্মাদ হ'ন নাই, কিংবা শোকার্ত হইয়া তাহার জীবনে কোন মর্মান্তিক ঘটনাও সংঘটিত করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন ভীমসিংহকে সেক্সপীয়রের কিং লিয়র চরিত্রের অনুযায়ী উন্মাদ করিয়াছেন; জেমস্ টডের রাণা চরিত্রের মত নিষ্ক্রিয় অসহায় রূপে উপস্থিত করেন নাই। নিজেই হত্যার আদেশ দিয়া উন্মাদ হইবার মধ্যে পাঠকের সহানুভূতিও তিনি যথাযথ লাভ করিতে পারেন নাই, অথচ টড্ বর্ণিত তাঁহার অসহায় অবস্থা অধিকতর সহানুভূতি উদ্রেক করিতে পারে।

ঐতিহাসিক চরিত্রকে ইতিহাসের পরিচয় অনুযায়ী পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য কল্পিত ঘটনা অবলম্বন করা যাইতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ তাহাতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব পালন করিতে হয়। ভীমসিংহের চরিত্রকে সুপরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহাকে উন্মাদ করিবার প্রয়োজন ছিল কি না, তাহা সংশয়াতীত নহে। তাঁহার সন্তান বাৎসল্য যদি নাট্যকার ইহার ভিতর দিয়া অধিকতর পরিস্ফুট হইবে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে দেখা যাইবে যে-ভাবে তিনি কৃষ্ণাকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বাৎসল্য অকৃত্রিম বলিয়া বোধ হইবে না।

বলেন্দ্র সিংহের চরিত্রটি ঐতিহাসিক হইলেও বলেন্দ্র সিংহ টডের রাজস্থানে নাই। সেখানে তাঁহার নাম মহারাজ জওয়ান দাস। তাহাকে ভীমসিংহের natural brother বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাকে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাইয়া বলা হয়, এই কার্য যে অন্য দ্বারা

অনুষ্ঠিত করা সঙ্গত নহে, সেই সম্পর্কেও তাহাকে অবহিত করা হয়। তিনি তাহাতে সম্মত হন। তাহাতেও তিনি তাহাকে হত্যা করিতে গিয়া যে ভাবে প্রতিহত হন, সেই বিষয়ে মধুসূদনের কাহিনীর সঙ্গে টডের কাহিনীর পার্থক্য দেখা যায়। জওয়ান দাস কৃষ্ণাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যখন তাহার নিকট যান, তখন টডের নিজস্ব ভাষায় 'in youthful loveliness Krisna appeared before him, the dagger fell from his hand, and he returned more wretched than the victim.' কিন্তু মধুসূদন তাহার পরিবর্তে নিদ্রিত অবস্থায় কৃষ্ণার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে খড়্গ তুলিবার কথা লিখিয়াছেন! কৃষ্ণা সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে অতি নাটকীয় (melo-drama) অবাস্তবতা সৃষ্টি হইয়াছে; টড বর্ণিত ঘটনা অধিকতর মানবিক গুণসম্পন্ন এবং বাস্তব। সুতরাং মূলের সঙ্গে ব্যতিক্রম করিবার এখানে কোনই আবশ্যকতা ছিল না।

মহারাজ দৌলত সিং কৃষ্ণাকে হত্যা করিতে ঘৃণাভরে অস্বীকৃত হইবার পর রাজ-ভ্রাতা জওয়ান দাসের উপর সেই ভার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু মধুসূদন মহারাজ দৌলত সিংহের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এই পাপকর্মের ভয়াবহতা এবং অমানুষিক বর্বরতা যে ইতিহাসের নির্দেশ মত প্রকাশ পাইতে পারে নাই, তাহা সত্য। মধুসূদনের বর্ণনায় কৃষ্ণার মৃত্যু যান্ত্রিক নিয়মে সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু টডের বর্ণনায় তাহার মানবিক এবং বাস্তব গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অধিকতর মানবিক জীবন-রস সমৃদ্ধ।

টডের বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে জগৎ সিংহের প্রসঙ্গ বিস্তৃততর অংশ অধিকার করিয়াছে, জয়পুররাজ জগৎ সিংহের নিকট কন্যা সম্প্রদানের প্রতিশ্রুতি বৃত্তান্ত লইয়া কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গের সূত্রপাত হইয়াছে, মানসিংহের বিরুদ্ধতায় রাণা সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। নিজের রাজ-মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তখন জগৎ-সিংহকে মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। মধুসূদন

জগৎ সিংহের প্রসঙ্গ এইভাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি সংস্কৃত শৃঙ্গার-রসাত্মক নাটকের নায়কের আদর্শে, অর্থাৎ মধুসূদনের পূর্ববর্তী নাটক 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র নায়ক-চরিত্র অনুসরণ করিয়া জগৎ সিংহের চরিত্র রূপায়িত করিয়াছেন। আমরা পরে লক্ষ্য করিব যে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াও মধুসূদন তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যরচনার সংস্কার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এমন কি, জগৎ সিংহের একটি ঐতিহাসিক আদর্শ লাভ করা সত্ত্বেও তিনি তাহা অনুসরণ না করিয়া তাঁহার সম্পর্কে সংস্কৃত নাটকের নায়কের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। চিত্রপট দেখিয়া মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর প্রণয়ের বৃত্তান্তও অনৈতিহাসিক, তাহা সংস্কৃত কাব্য-নাটকের নায়িকাদিগের পথ ধরিয়া আসিয়াছে, এইকথা মধুসূদন নিজেও তাঁহার পত্রে স্বীকার করিয়াছেন।

টডের রাজস্থানে জগৎ সিংহ যোদ্ধা, রাজনৈতিক কূটকৌশলে বিশেষ সিদ্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্র। কিন্তু মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' তিনি প্রেমিক, পতিতার প্রতি আসক্ত, এমন কি, পতিতার পদধারণেও তাঁহার বিন্দুমাত্র লজ্জা নাই। এই জগৎ সিংহ টডের জগৎ সিংহ নহে, ইহা 'রত্নাবলী' কিংবা 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র বিদূষক-সহচর রাজা চরিত্র। মধুসূদন রাজস্থান কাহিনীর বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র হইতে আনিয়া তাঁহাকে নারীর প্রেমচ্ছায়া-তলে স্থাপন করিয়াছেন, ইহার ঐতিহাসিক মর্যাদা সেইজন্য রক্ষা পাইতে পারে নাই।

অহল্যা দেবীর ঐতিহাসিক পরিচয়টি রক্ষা পাইয়াছে সত্য, তবে টডের কাহিনীতে তাঁহার কোন নামের উল্লেখ নাই। তাঁহাকে কৃষ্ণার হতভাগিনী জননী বলিয়াই সর্বত্র পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অহল্যা নামটি মধুসূদনের আরোপিত।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র আর কোন চরিত্রেরই কোন ঐতিহাসিক পরিচয় নাই। এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত দুইটি প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র, মানসিংহ এবং পাঠান আমীর খাঁ যবনিকার অন্তরালেই

রহিয়া গিয়াছেন। অথচ দুইটি কাল্পনিক চরিত্রই, যেমন, ধনদাস এবং মদনিকা ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং সামগ্রিক ভাবেও ইহার ঐতিহাসিক গুণ প্রকাশ পাইতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র প্রধান ঐতিহাসিক ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে ইহার কাহিনীর উপসংহারে। জেম্‌স্ টডের বর্ণনায় দেখা যায়, কৃষ্ণকুমারীকে বিষপ্রয়োগ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল, কৃষ্ণা সচেতনভাবেই সেই বিষ পান করিয়াছে; কারণ, এই বিষয়ে তাহার আর কোন উপায় ছিল না। জননীর স্নেহ, পিতার ঐশ্বর্য কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। অন্যের নিকট হইতে বিষের পাত্র হাত পাতিয়া লইয়া তাহা পান করিতে সে বাধ্য হইয়াছে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে আত্মহত্যা করে নাই। কিন্তু মধুসূদনের বর্ণনায় কৃষ্ণকুমারী খড়্গাঘাতে আত্মহত্যা করিয়াছে। মধুসূদনের এই বিষয়ে এই স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার যাহাই কারণ থাকুক না কেন, ইহা যে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক নাটক হিসাবেই 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাহা নহে, ইহার শিল্পগুণেও আঘাত করিয়াছে। কারণ, খড়্গাঘাতে আত্মহত্যা করা ষোল বয়সের বালিকার পক্ষে অবাস্তব, কিন্তু অন্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অসহায় ভাবে বিষ পান করা অধিকতর বাস্তব।

বিশেষত এইখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। জেম্‌স্ টডের বর্ণনায় দেখা যায়, একজন পুরুষ কৃষ্ণকুমারীর মত সরল এবং নিষ্পাপ সৌন্দর্যের প্রতীক্ বালিকাকে আঘাত করিতে গিয়াও ফিরিয়া আসিল, কিন্তু নারীহস্ত তাহাকে বিষ প্রদান করিতে পশ্চাৎপদ হইল না। ইহার পরিকল্পনার মধ্যে একটি সুগভীর রস এবং শিল্পগত সার্থকতা আছে; কিন্তু মধুসূদন যে ভাবে কাহিনীর উপসংহার করিয়াছেন, তাহাতে ইহা কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। বলেন্দ্র সিংহ কৃষ্ণার নিদ্রিত অবস্থায় তাহাকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণা জাগিয়া উঠিবার ফলে তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য হইতে বিরত হইলেন। সে না জাগিলে তাঁহার

খড়্গাঘাতেই তাহার মৃত্যু হইত। জেম্‌স্ টডের পরিকল্পনায় একজন পুরুষ এই কার্য ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, আর একজন স্বীকৃত হইয়াও কৃষ্ণার সম্মুখীন হওয়া মাত্র তাহার হাত হইতে ছুরিকা খসিয়া পড়িয়াছে। ইহাদের উভয়ের আচরণের ভিতর দিয়াই এই কার্যের নৃশংসতা পরিস্ফুট হইয়া কৃষ্ণার প্রতি দর্শকের সহানুভূতি সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু মধুসূদন এই ঐতিহাসিক তথ্য পরিত্যাগ করিবার ফলে কৃষ্ণার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে ততখানি সার্থক হইতে পারেন নাই। টডের বর্ণনায় কোনও পুরুষ কৃষ্ণাকে হত্যা করিতে পারে নাই, নারীই বিষ প্রয়োগে এই কাজ করিয়াছে, কারণ, রাজপুত রমণীরা আত্মসম্মান রক্ষার্থে সহজে মৃত্যুবরণ করিত, সুতরাং ইহা তাহাদের পক্ষে যত সহজ, পুরুষের পক্ষে তত সহজ নহে। নারীর নিষ্পাপ সৌন্দর্যের সম্মুখে পুরুষের নিষ্ঠুর সঙ্কল্প পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। মধুসূদন এই বিষয়টি গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখেন নাই।

সম্ভবতঃ যে নাট্যশালার উপর লক্ষ্য রাখিয়া মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে অধিক সংখ্যক স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়োপযোগী অভিনেতা ছিল না, সেই জন্যই তিনি জেম্‌স্ টড্ নির্দেশিত পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফলে ঐতিহাসিক তথ্য যেমন বিসর্জিত হইয়াছে, তেমনই চরিত্র সৃষ্টিরও সম্যক্ সার্থকতা দেখা দিতে পারে নাই। সুতরাং মধুসূদন ইতিহাসের দোহাই দিয়া দুই একটি চরিত্র অতিরিক্ত যোগ করিয়া কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীকে জটিল করিতে অস্বীকৃত হইলেও ঐতিহাসিক তথ্যও যে তিনি পরিত্যাগ করিয়া যদৃচ্ছা ইহার কাহিনী পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' কৃষ্ণকুমারীর আত্মহত্যার বিষয় উল্লেখ থাকিলেও টডের রাজস্থানে বিষপানে হত্যার কথা উল্লেখ আছে। হত্যা এবং আত্মহত্যার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মধুসূদন এখানেও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পরিত্যাগ

করিবার ফলে কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রের যেমন ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষা পাইতে পারে নাই, তেমনই কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রগত সার্থকতাও প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা যে মধুসূদনের সুগভীর ছিল, তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে সার্থক রচনা নহে; রোমান্টিক ট্রাজিডি হিসাবে ইহা সার্থক কিনা, তাহা এখন দেখা যাইতে পারে। কারণ, ঐতিহাসিক নাটক অপেক্ষা ইহাকে রোমান্টিক ট্রাজিডি বলিয়াই মধুসূদন তাঁহার লিখিত চিঠি পত্রাদিতে বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাই এইবার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।



৬

'ট্রাজিডি' রূপে সার্থকতা

'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচিত হইবার পূর্বেই যদিও একাধিক বাংলা বিয়োগান্তক নাটক রচিত হইয়াছিল, তথাপি কৃষ্ণকুমারী নাটকই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজিডি বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এই দাবী কতদূর সমর্থনযোগ্য তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে ট্রাজিডি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রোমান্টিক ট্রাজিডি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন, 'I have been dramatizing, writing a regular tragedy in prose! The plot is taken from Tod. Vol. I. p 461.' আরও একটি পত্রে আছে,…'what a romantic tragedy it will make'!

দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে পরস্পর সংঘাত সৃষ্টি করিয়া পরিণামে একটির পরিপূর্ণ বিনাশ নির্দেশই ট্রাজিডির উদ্দেশ্য, এই বিনাশ নিয়তির পথে যেমন আসিতে পারে, চারিত্রিক দুর্বলতার পথেও আসিতে পারে। প্রাচীন গ্রীক্ ট্রাজিডির মধ্যে নিয়তিই বিনাশের কারণ, সেক্সপীরীয় নাটকে ব্যক্তিচরিত্রের দুর্বলতা তাহার মূল। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র পরিণতি যে ভাবে আসিয়াছে, তাহাতে এই কথা সহজেই মনে হইতে পারে যে, ইহার মর্মান্তিক পরিণতির জন্য ভাগ্য বা নিয়তিই দায়ী, কাহারও ব্যক্তিগত চরিত্রের দুর্বলতা দায়ী নহে; সুতরাং ইহা যদি ট্রাজিডি রূপে সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে, তবে প্রাচীন গ্রীক্ ট্রাজিডি রূপে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, সেক্সপীরীয় ট্রাজিডি রূপে নহে। কারণ, ট্রাজিডির কোন আদর্শই ভারতীয় সাহিত্যে নাই।

প্রাচীন গ্রীক্ ট্রাজিডিতে একটি বলিষ্ঠ চরিত্রের পতনই ট্রাজিক রসের অবলম্বন রূপে গৃহীত হয়। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' তেমন কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সুমহান্ চরিত্রের যে পতন দেখান হইয়াছে, তাহা নহে। কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুই যদিও এই নাটকের মূল উপজীব্য, তথাপি কৃষ্ণকুমারী চরিত্রটি ইহাতে সক্রিয় ভাবে নায়িকার অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই, নিষ্ক্রিয় থাকিয়া সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে, সেই গুণেই সে নায়িকার মর্যাদা লাভ করিয়াছে মাত্র; কিন্তু নায়িকার আচরণ পালন করিতে তাহাকে দেখা যায় না।

অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার মধ্যে ট্রাজিডির নায়ক-নায়িকা চরিত্রের শক্তি প্রকাশ পায়। নাট্যিক ক্রিয়ার দিক দিয়া ইহার নায়িকা বিলাসবতী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কাহিনীর নায়িকা নহে, কিংবা তাঁহার জীবনের পরিণতি সম্পর্কে নাটকে কোন উল্লেখ নাই।

ইহার নায়ক চরিত্র ভীমসিংহ। ভীমসিংহ চরিত্রের দুর্বলতা অর্থাৎ ব্যক্তিত্বহীনতাই এই নাটকের ট্রাজিক পরিণতির মূল বলিয়া মনে হইতে পারে, যদি তাহাই হয় তবে ইহাতে সেক্সপীরীয় ট্রাজিডির গুণও প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু ভীমসিংহ অবস্থার মধ্যে গা ভাসাইয়া দিয়া চলিয়াছেন, তাহা প্রতিরোধ করিবার কোন শক্তি তাঁহার ছিল না, তিনি তাহার ব্যবহারও করিতে যান নাই। সুতরাং 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র নায়ক এবং নায়িকা চরিত্র উভয়েই নিষ্ক্রিয়। যদিও কাহিনীর উপস্থাপনার গুণে নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও কৃষ্ণকুমারী পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তথাপি ভীমসিংহ নানা কারণেই তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, ভীমসিংহের পরিণতি কাহারও অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই, সুতরাং তাঁহার পরিণতি দ্বারা নাট্য-কাহিনীর গুণাগুণ নির্ধারণ করা যায় না।

ট্রাজিডির মধ্যে যে সংঘাতের আবশ্যক, তাহা এই নাটকে

থাকিলেও তাহা যেমন নায়ক-নায়িকার জীবনে নাই, তেমনই তাহা নানা কারণেই কার্যকর হইতে পারে নাই। ইহার সংঘাত নাটকের যবনিকার অন্তরালে ঘটিয়াছে, প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মধ্য দিয়া ঘটে নাই। কারণ, ইহার সংঘাতকারী একটি পক্ষ সমগ্র কাহিনী ব্যাপিয়া দৃশ্যের অন্তরালে রহিয়াছে। জগৎ সিংহ এবং মানসিংহের স্বার্থ-সংঘাত লইয়া নাটকের বহির্মুখী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু দ্বন্দ্বকারী একটি চরিত্র মানসিংহ সমগ্র নাট্যকাহিনীর মধ্যে - আনুপূর্বিকই অনুপস্থিত। সেইজন্য এই দ্বন্দ্ব কার্যকর হইয়া নাটকীয় পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। বিশেষত ইহারা কেহই নাটকের নায়ক কিংবা প্রতিনায়কের চরিত্র নহে, কিংবা নায়িকা বা প্রতিনায়িকারও চরিত্র নহে। সুতরাং ইহার দ্বন্দ্ব যে স্তরেই উঠুক না কেন, তাহা দ্বারা কাহিনীর ট্রাজিডি-গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। একটি অদৃশ্য শক্তি এই নাটকের মধ্যে যেন নায়কের কাজ করিয়াছে, তাহা অদৃষ্ট বা নিয়তি। কিন্তু তাহা অদৃশ্য এবং একান্ত ভাবমূলক বলিয়া নাটকীয় চরিত্রের মূল্য লাভ করিতে পারে নাই।

কোন কোন বিষয়ে গ্রীক্ ট্রাজিডির সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র ঐক্য থাকা সত্ত্বেও গ্রীক্ নাটকের ট্রাজিডির যে তীব্রতা প্রকাশ পায়, 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' তাহার অভাব দেখা যায়। ট্রাজিডিতে নায়ক-নায়িকা চরিত্রের মধ্যে যে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রামের তীব্রতা এবং তজ্জাত দুঃখদুর্দশার গভীরতা দেখা যায়, তাহার ভিতর দিয়াই নায়ক-নায়িকা চরিত্রের প্রতি পাঠকের দুর্দমনীয় সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র নায়ক-নায়িকা চরিত্রে সেই শক্তির অভাব আছে বলিয়াই ইহারা সেই অনুযায়ী সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

মধুসূদন গ্রীক্ ট্রাজিডির আদর্শ অনুযায়ী নিয়তিবাদ অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিলেও শেক্সপীয়রের নাটকের সংস্কার হইতেও তিনি মুক্ত হইতে পারেন নাই। সেইজন্য দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের ধারাকেও অনুসরণ

করিয়াছেন। নাটকে খল চরিত্র ও উন্মাদ দৃশ্যের অবতারণা, চরিত্রের মনোভাব অনুযায়ী প্রাকৃতিক পটভূমিকা পরিকল্পনার কবিত্বময় প্রয়াস ইত্যাদির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে শেক্সপীয়রের ট্রাজিডির অনুসরণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা একটি অখণ্ড ঐক্যসূত্র বিধৃত নহে বলিয়া সামগ্রিকভাবে ইহাদের দ্বারাও নাটকে ট্রাজিক রস সৃষ্টি হইতে পারে নাই। কারণ, আঙ্গিকের পরস্পর বিচ্ছিন্ন রূপের মধ্য দিয়া নাটকে বিশিষ্ট কোন রস ফুটিয়া উঠিতে পারে না, জীবনের বাস্তবধর্মী অখণ্ড ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই জীবনের করুণ কিংবা হাস্যরস ফুটিয়া উঠিতে পারে। সেইজন্য নাট্যকাহিনীর মধ্যে চরিত্রের ক্রমবিকাশের আবশ্যক। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' চরিত্রের ক্রমবিকাশ কোনক্ষেত্রেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে, কিংবা আদৌ প্রকাশ পাইয়াছে এই কথা বলিতে পারা যায় না। চরিত্রগুলি একই অবিচল অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, তাহাদের উপর বাহিরের ঘটনার আঘাত আসিয়া পড়িতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের আচার-আচরণে কোন পরিবর্তন হইতেছে না, জীবনে কোন নূতন সত্য লাভ করিতে পারিতেছে না।

ট্রাজিডি হিসাবে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সার্থকতা লাভ না করিবার অন্যতম প্রধান কারণ, ইহার নায়ক ভীমসিংহ চরিত্রের নিষ্ক্রিয়তা এবং ব্যক্তিত্বহীনতা। তিনি দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি, মারাঠা দস্যুদলকে উৎকোচ দিয়া তাহাদের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহেন, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার কোন সংকল্পও তাঁহার নাই। এই ব্যক্তিত্বহীনতাই তাঁহাকে ট্রাজিডির নায়ক চরিত্রের অনুপযোগী করিয়াছে, সেক্সপীয়রের কিং লীয়র চরিত্রের প্রখর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনা করিলে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, সুতরাং কিং লীয়রের মত তাহাকে উন্মাদ হইতে দেখিয়া তাহার প্রতি কাহারও সহানুভূতি সৃষ্টি হইতে পারে না। মধুসূদনের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য ট্রাজিডির রীতিনীতির খুঁটিনাটি বিষয়ে পরিচিত না থাকিবার কথা নহে। তথাপি শুধু মাত্র পুঁথিগত জ্ঞান থাকিলেই যে নাট্য-চরিত্র

সৃষ্টির সহায়তা হইতে পারে না, এখানে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। অথচ এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভীমসিংহের চরিত্রকে যথার্থ ট্রাজিডির নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব ছিল না। সেই সম্ভাবনাকে মধুসূদন নাটকে রূপায়িত করিতে পারেন নাই।

মধুসূদন তাঁহার নায়িকা চরিত্র কৃষ্ণকুমারীকেও অবিমিশ্র ট্রাজিডির উপাদানে গঠন করিতে পারেন নাই, ইহার মধ্যে শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের নায়িকার উপাদানও আছে। চিত্রপট দেখিয়া প্রেমে পড়িয়া আত্মহারা হইবার কথা সংস্কৃত নাটকের কাহিনীর প্রভাব-জাত, পাশ্চাত্ত্য ট্রাজিডির নায়িকা হইতে গিয়াও মিলনান্তক সংস্কৃত নাটকের নায়িকার গুণ লাভ করিবার জন্য তাহার চরিত্র অবলম্বন করিয়া একটি অখণ্ড রস বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। গ্রীক, সেক্সপীরীয় এবং ভারতীয় এই তিন বিভিন্নমুখী আদর্শের বশবর্তী হইবার ফলে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র করুণ রস নিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং গ্রীক ট্রাজিডিই হোক, কিংবা সেক্সপীরীয় ট্রাজিডিই হোক, ইহাদের কাহারও অনুযায়ী ইহা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে সেই অনুযায়ীই ইহা রচিত হইয়াছে। এই কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

*

৭

ঘটনার অপ্রাচুর্য

বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় যখন অভিনয়ের দিক দিয়া 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার জন্য মধুসূদনকে ইহার মধ্যে আরও কয়েকটি কল্পিত চরিত্র যোগ করিয়া ইহাকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহার বিরুদ্ধে তাঁহাকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনি এই একটি কথা বলিয়াছেন যে, 'As for variety of action, there is not much of it, to be sure, but the result I could not very well avoid owing to the original barrenness of the plot.' অর্থাৎ মূল কাহিনীতে ঘটনার অপ্রাচুর্য হেতু তিনি ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু জেম্‌স্ টড্ রচিত রাজস্থানের কাহিনীর কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গ যিনিই পাঠ করিয়াছেন, তিনি একথা কখনই স্বীকার করিবেন না যে, ইহাতে ঘটনার অপ্রাচুর্য আছে। প্রকৃত পক্ষে টড্ রচিত রাজস্থানের কাহিনী একান্ত ভাবমূলক কাব্যধর্মী রচনা নহে। বরং তাহার পরিবর্তে বিচিত্র ঘটনা-সঙ্কুল নাট্যধর্মী রচনা। ইহাতে ঘটনার ঘনঘটার রথচক্রতলে রাজস্থানের একটি অনতিমুকুলিত পুষ্পমঞ্জরী নির্মমভাবে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে। অথচ মধুসূদন ইচ্ছা করিয়াই ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহারই একটি নিভৃত ছায়াতলে কৃষ্ণকুমারীর প্রেম-কোমল কাহিনীটি রচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' যেমন বিচিত্র ঘটনার রাজকীয় শোভাযাত্রা লইয়া অগ্রসর হইয়াছে, টড্ বর্ণিত কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গও তেমনই আড়ম্বর পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা রাশির শোভাযাত্রা লইয়া রাজস্থানের পথে অগ্রসর হইয়াছে। টড্ বর্ণিত ঘটনারাশির নায়ক মানসিংহ, তাঁহার প্রধান সহায়ক পাঠান আমীর খাঁ এবং অপ্রধান

সহায়ক মহারাষ্ট্রীয়গণ। মধুসূদন এই তিনটি চরিত্রের একটিকেও নাট্যমঞ্চের ভিতর উপস্থিত করেন নাই। সুতরাং 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' ঘটনার অপ্রাচুর্য সৃষ্টি মধুসূদনেরই কাজ, ইহা 'original barrenness of the plat'-এর ফল স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কি উদ্দেশ্য লইয়া মধুসূদন ইহার কাহিনী এতখানি সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছেন, এখন তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। মানসিংহ, আমীর খাঁ কিংবা কোন মহারাষ্ট্র নায়ককে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিয়া কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টি না করিবার প্রধান কারণ বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রয়োজনীয় অভিনেতার অভাব। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় নিজের নাটক অভিনীত হওয়াই মধুসূদনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ; সেইজন্য চরিত্রের আধিক্যের জন্য যদি সে পথে কোন বাধা সৃষ্টি হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার রচনা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার সংখ্যানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, সেইজন্যই নাটকে ঘটনার অপ্রাচুর্য দেখা দিয়াছে। মাত্র পাঁচ ছয়টি পুরুষ চরিত্রের অভিনেতা এবং চারিটি স্ত্রী চরিত্রের অভিনেতার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে একটি পূর্ণাঙ্গ রোমান্টিক ট্রাজিডি রচনা করিতে হইয়াছে, সুতরাং ঘটনার প্রাচুর্যের দাবী ইহাতে কখনই পূর্ণ করা যায় না।

এই ব্যবহারিক অসুবিধা ব্যতীতও ইহার ঘটনার অপ্রাচুর্যের আরও একটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। মধুসূদনের মানস-কন্যা কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র নিষ্ক্রিয় চরিত্র, বহির্মুখী যে সকল ঘটনা সেদিন রাজপুত জাতির জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে তাঁহার কোন যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। সুতরাং বহির্মুখী ঘটনার মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে গেলে কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র নাটকের মধ্যে গৌণ হইয়া পড়ে, অথচ তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ইহাতে নায়িকার পদে অধিষ্ঠিত করা মধুসূদনের অভিপ্রেত ছিল না। সেইজন্য বিচিত্র ঘটনারাশি দ্বারা

বিক্ষুব্ধ রাজপুত জীবনের সেদিনকার ঐতিহাসিক পটভূমিকা হইতে তিনি তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। বহির্জগতের অলক্ষ্যে সংঘটিত ঘটনারাশির প্রতিক্রিয়া অনিবার্যভাবে তাহার উপর গিয়া পড়িলেও প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিলে কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রের ঐতিহাসিক এবং শিল্পগত মর্যাদা কিছুই রক্ষা পাইতে পারিত না।

মধুসূদন মনে-প্রাণে গীতিকবি। বিস্তৃত ঘটনারাশি এক-লক্ষ্যমুখী করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার নাটকীয় কৌশল তাঁহার জানা ছিল না; সেইজন্য তিনি সেই পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কৃষ্ণ-কুমারীর ক্ষুদ্র জীবনটির মাধুর্য একান্তে উপলব্ধি করিবার পক্ষে ইহা ছাড়া অন্য আর কোন সহজ উপায় ছিল না।

বিচিত্র কর্মের মধ্যবর্তী ঐতিহাসিক এবং নাটকীয় চরিত্র পরিত্যাগ করিলেও মধুসূদন দুইটি কল্পিত চরিত্রকে তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' অনাবশ্যক প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহা ধনদাস এবং মদনিকার চরিত্র। ইহাদের আচরণ বহির্মুখী বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর মর্মান্তিক পরিণতি অনিবার্য করিয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের সকল দৃষ্টিই প্রধানত কৃষ্ণকুমারীর উপরই ন্যস্ত ছিল, কোন চরিত্র কর্মতৎপরতার দিক হইতেই হউক, কিংবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে, ইহা তাঁহার কাম্য ছিল না। সেইজন্য ঘটনার প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি আদৌ প্রবেশ করেন নাই। ঘটনার কোলাহল হইতে দূরে সরাইয়া কৃষ্ণকুমারী চরিত্রকে নিষ্ক্রিয় জীবনের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে লইয়া ঘটনার প্রাচুর্য সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

ইতিহাসের মধ্যে ঘটনার অপ্রাচুর্য থাকিলেই যে ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যেও ঘটনার অপ্রাচুর্য থাকিতে হইবে, তাহাও কোন কথা হইতে পারে না। কারণ, ইতিহাস কোন চরিত্রেরই জীবনের সমগ্র ঘটনা লিখিয়া রাখে না, ঐতিহাসিক নাটকের লেখককে

নিজের কল্পনা দ্বারা তাহাদের শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করিয়া লইতে হয়, এখানেই ঐতিহাসিক নাট্যকারের যথার্থ কৃতিত্ব প্রকাশ পায়; নতুবা ইতিহাসে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির যে সকল ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, কেবল তাহাদের নাট্যরূপ দিয়া কোন সার্থক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করা যায় না। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস এবং কল্পনা দুই-ই সমানভাবে ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়; তবে কল্পনাকে ইতিহাসের পরিচয় অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের মধ্যে যদি ঘটনার অপ্রাচুর্যও থাকে, তথাপি তাহার প্রতি একান্ত আনুগত্য দেখাইয়া ঐতিহাসিক নাটককে সেইভাবেই রচনা করিতে হইবে, তাহা সত্য নহে। সুতরাং মধুসূদন যদি মনে করিতেন যে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র কাহিনীকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করিবার জন্য ইতিহাসের পরিবেশের মধ্যেই কল্পিত চরিত্র এবং ঘটনা যোগ করিবেন, তবে তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার ছিল না। সুতরাং 'original barreness of the plot' এই বিষয়ে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারিত না।

❋

৮

অলৌকিকতা

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্যে কয়েকটি অলৌকিক বৃত্তান্ত আছে, ইহারা কাহিনীর নাট্যগুণ কতদূর ক্ষুণ্ন করিয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি প্রকৃতই তাহা করিয়া থাকে, তবে কেবল ঐতিহাসিক নাটকরূপেই নহে, সাধারণ নাটকরূপেও ইহার মধ্যে ত্রুটি প্রকাশ পাইবে।

ইহার তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেখা যায়, কৃষ্ণা যখন মানসিংহের ভাবনায় ব্যাকুল, তখন সে সহসা মূৰ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে; তপস্বিনী আসিয়া তাহাকে ধরিয়াছেন, কৃষ্ণা সুপ্ত অবস্থায় নিজের মুখ দিয়া যাহা বলিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে, তাহার মূৰ্ছিত অবস্থায় পদ্মিনী তাহার সম্মুখে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, 'যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপনার প্রাণ দিয়ে রাখে সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না'। মূৰ্ছা ভঙ্গের পরও কৃষ্ণা বার বার এক দিব্য সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে, তপস্বিনীকে তাহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছে। তাহাতে রাজপুত রমণী পদ্মিনীর আত্মত্যাগের কথা শুনিতে পাওয়া গেল এবং তাহাকেও এমনই আত্মত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিল। শুনিয়া তপস্বিনী বলিলেন, 'দেখ, মা, আমাকে যা বল্লে, এ কথা আর তুমি কাকেও বলো না'। কৃষ্ণা এ কথা আর কাহাকেও বলিল না।

এই অলৌকিক স্বপ্ন বৃত্তান্ত নাট্যকাহিনীর ধারা যদি নিয়ন্ত্রিত করিয়া না থাকে, তবে তাহা নাটকের কোন ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু এখানে আর একটি বিষয় আছে, নাট্য কাহিনীর পরিণতি সম্পর্কে ঔৎসুক্য (suspense) রক্ষা করিবার যে একটি দায়িত্ব আছে, তাহা এই স্বপ্নবৃত্তান্ত দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু এই অলৌকিক বৃত্তান্ত কাহিনীর ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহা কি বলা যাইতে পারে? কৃষ্ণার আত্মহত্যা করিবার প্রেরণা কি এই অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন হইতে আসিয়াছে, এমন কথা মনে করা যাইতে পারে? যদিও এ'কথা সত্য, ঘটনা যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণকুমারীর প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ই ছিল না, তথাপি শেষ-মুহূর্তে আত্মহত্যা করিবার যে প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে দেখা দিল, তাহা যদি এই স্বপ্নদর্শনজাত হয়, তবে নাট্যকাহিনীর গুণ ক্ষুন্ন হইয়াছে বলিতেই হইবে। কিন্তু এখানে যদি মনে করা যায় যে, স্বপ্ন দর্শন ব্যতীতও আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে একইভাবে প্রকাশ পাইত, তাব ইহার ত্রুটি প্রকাশ পায় না। স্বপ্নদর্শনকে রূপক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ সেই অবস্থায় পদ্মিনীর কথা নির্জনে কৃষ্ণা মনে মনে ভাবিয়াছে। কারণ, পদ্মিনীর আত্মত্যাগের কথা কোন্ রাজপুত রমণী না জানিত? কৃষ্ণার জীবনের সেই সঙ্কট কালে তাহার কথা স্মরণ করা কিছুই আশ্চর্য নহে। সেই ভাবনাই স্বপ্নের রূপ লাভ করিয়াছে। তবে ইতিহাসের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়া নাট্যকার যে কৃষ্ণাকে আত্মঘাতিনী করিয়াছেন, তাহা কি কাহিনীতে স্বপ্নদৃষ্ট পদ্মিনীর আত্মত্যাগের বৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে? কিন্তু তাহা স্বপ্নদর্শন নিরপেক্ষ স্বাধীন ভাবেও হইতে পারে বলিয়াও অনুমান করা যায়।

এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আর একটি অলৌকিক দৃশ্য আছে। ইহাতে চারিটি সন্ন্যাসীর চরিত্র আছে। ইহাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী একটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া রাণা ভীমসিংহের সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেলেন, শেষ পর্যন্ত তাহা সত্য হইল। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণীটি এই প্রকার:

'অদ্য সায়ংকালে ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে। কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো যেন, সে স্থল হ'তে একটা রক্তস্রোত নির্গত হচ্ছে। তৎপরে

আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেখ্‌লেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মী-দেবী দগ্ধ হচ্ছেন, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্চেন। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ'সকল কুলক্ষণ, এতে যে কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই।' ৫।২

এই প্রসঙ্গটি নাটকের কাহিনীর অনিবার্য ধারায় আসে নাই—স্বাধীন ভাবে আসিয়াছে, সেই জন্য সমগ্র কাহিনীর মধ্যে ইহা অসংলগ্ন হইয়া আছে। কাহিনীর ভবিষ্যৎ উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়া এখানেও নাটকীয় গুণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, ইহার অলৌকিকতাও নাটকের ত্রুটির কারণ হইয়াছে। তবে ঘটনা যে ভাবে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাতে ইহার এই পরিণতি অনিবার্য রূপেই দেখা দিয়াছে, সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে নাই, এই মাত্র বুঝিতে হইবে।

এই নাটকে আরও একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত আছে। কৃষ্ণকুমারীর জননী অহল্যা দেবী এই স্বপ্ন দেখিয়াছেন। অহল্যা দেবী বলিতেছেন,

'আমার বোধ হলো, আমি ঐ দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একজন ভীমরূপী বীরপুরুষ একখানি অসিহস্তে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্লে—……আমার কৃষ্ণা যেন সেই পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে, আর ঐ বীরপুরুষ কল্লে কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এ'সে খড়্গাঘাত কত্তে উদ্যত হলো। আমি ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল।' ৫।২

ইহা দ্বারা কাহিনীর পরিণতি সম্পর্কে আর কিছুই গোপন রহিল না। কৃষ্ণার জীবন-সম্পর্কে আশঙ্কা হইতে তাহার স্বপ্নদর্শন অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু নাটকে যে প্রণালীতে মৃত্যু সংঘটিত করিবার আয়োজন হইয়াছে, ইহাতে তাহারই ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হওয়া, আকস্মিক নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠা ইত্যাদি ঘটনা নাট্য-কাহিনীতে অনুসরণ করা হইয়াছে।

সুতরাং নাট্য-কাহিনী সম্পর্কে ইহাতে কৌতূহল দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত শেষ পর্যন্ত কাহিনীতে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য নাটকের বাস্তব গুণও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, ইহা দ্বারা নাট্য-কাহিনীর শিল্পগুণ বিনষ্ট হইয়াছে। তবে এই স্বপ্নদর্শন ঘটনা-নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবে ঘটিয়াছে বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। কারণ, দেখা যায়, অনুরূপ স্বপ্নদর্শন সাহিত্যে সে যুগে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র প্রথমেই কুন্দনন্দিনী যে স্বপ্নদর্শন করিয়াছিল, তাহা শেষ পর্যন্ত সত্য হইয়াছিল; অথচ কাহিনীর শিল্পগুণ তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না, অহল্যার স্বপ্নদর্শনকেও যদি সেইভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তাহা নাট্য-কাহিনীর কোন শিল্পগত ত্রুটি বলিয়া মনে হইবে না।

অনেকে সেক্সপীয়রের নাটকের প্রেত-দর্শনের অলৌকিকতার সঙ্গে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র স্বপ্নদর্শনের তুলনা করিয়াছেন। মধুসূদনের পরিকল্পিত একটি স্বপ্নদর্শনের মধ্যে মৃত চরিত্র স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়াছে, সুতরাং ইহার সঙ্গে সেক্সপীয়রের প্রেত-চরিত্রের গৌণ সম্পর্ক থাকিলেও অন্যান্য স্বপ্নদর্শনের চিত্রগুলি স্বতন্ত্র, তাহাতে কোন প্রেত-চরিত্রের আর্বিভাব ঘটে নাই। তারপর চারিজন সন্ন্যাসী যে অলৌকিক ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেল, তাহাদিগকেও সেক্সপীয়র রচিত ম্যাক্‌বেথ নাটকের ডাইনী চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে না। মধুসূদন অলৌকিকতার ব্যবহারে ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন; সেক্সপীয়রের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইবে না।

*

৯

পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারই অনুকরণে তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিয়াছেন, ইহার ট্রাজিক পরিণতির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে—তাহা সেক্সপীয়রের নাটকই হোক, কিংবা প্রাচীন গ্রীক্ নাটকই হোক কিংবা ইহাদের মিশ্রিত কোন প্রভাবই হোক।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নাটকের জীবনাদর্শ আমাদের ভাষায় গ্রহণ করিবার বিষয়ে মধুসূদনের নিজস্ব কি ধারণা ছিল, তাহা প্রথমেই বিশ্লেষণ করিয়া বুঝা যাইতে পারে। সেক্সপীয়রের নাটক আনুপূর্বিক অনুকরণ করিবার বিষয়ে যে আমাদের বাধা আছে, সেই বিষয়ে মধুসূদন সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁহার এক পত্রে এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন,……'I write under different circumstances. Our social and moral development are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape.' অর্থাৎ আমি যখন (নাটক) লিখি, তখন এক স্বতন্ত্র অবস্থার মধ্যে লিখি। আমাদের সামাজিক এবং নৈতিক আদর্শ স্বতন্ত্র। এই কথা সত্য যে আমরা একই অভিন্ন প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত, তথাপি আমাদের মধ্যে প্রবৃত্তিগুলি তত শক্তিশালী নহে।

সুতরাং অন্ধভাবে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ যে কোনমতেই অনুসরণ করা যাইতে পারে না, এই বিষয়ে মধুসূদন যে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়; সেইজন্য তিনি এই পথ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, হয়ত অজ্ঞাতে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার উপর অন্ধ অনুকরণের ভাব প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি

সচেতনভাবে তিনি যে তাহা করেন নাই, তাহা সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

সেক্সপীয়রের নাটক অনুকরণ করিবার পক্ষে যে আমাদের কি বাধা সেই সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন,······We Asiatics are of a more Romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the *Mid Summer Nights' Dream, Romeo and Juliet* and perhaps one or two more, what play would desereve the name of Romantic? Romantic in the sense in which *Sacoontala* is Romantic? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairy lands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic peoms.······'

ইহার সারমর্ম এই: ইউরোপীয়দিগের তুলনায় ভারতীয়েরা অধিকতর কল্পনাপ্রবণ। সেক্সপীয়রের নাটকগুলি বিচার করিলে দেখা যায়, 'মিড্ সামার নাইট্‌স্ ড্রীম', 'রোমিও জুলিয়েট্' এবং আর সামান্য দুই একটি নাটক ব্যতীত তাঁহার আর কোন নাটকই কালিদাসের শকুন্তলা নাটক যে অর্থে রোমান্টিক, সেই অর্থে রোমান্টিক বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, প্রবৃত্তির প্রাবল্য এবং বীররসের অভিব্যক্তি ইউরোপীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভারতীয় নাটকে কেবলমাত্র সুকোমল মনোবৃত্তি এবং কল্পলোকের স্বপ্নবৃত্তান্ত অবলম্বন করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের নাটকের ক্ষেত্রে যে প্রতিভার সাধারণ বিকাশ

আজিও হইতে পারে নাই, তাহার ইহাই কারণ। আমাদের সাহিত্যে যাহা হইয়াছে, তাহা নাট্যকাব্য মাত্র।

সুতরাং মধুসূদনের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের পার্থক্য কোথায়, সেই বিষয়ে কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। সুতরাং সচেতন ভাবে তিনি যে পাশ্চাত্ত্য ভাব এবং জীবন-দর্শন তাঁহার কোন নাটকে অনুসরণ করিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

তথাপি এই কথা সত্য, পাশ্চাত্ত্য ট্রাজিডির রূপ অনুসরণ করিয়াই তিনি তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বেই সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রভাব সমাজের উপর শিথিল হইয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রকাশিত হইবার ফলে ইহা সংস্কৃত নাট্যরীতির বিরোধী বলিয়া ইহার অভিনয় দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইবার মত দর্শক সে যুগের ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে কেহই ছিল না। বিশেষত ইংরেজি শ্রেষ্ঠ নাটক মাত্রই ট্রাজিডি এবং তাহারই অনুকূলে এদেশের বিদগ্ধ সমাজের রুচি গঠিত হইতেছিল। যাঁহারা নাটকের উৎসাহদাতা ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ইংরেজি সাহিত্যে সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং সাহিত্যে কিংবা সমাজে প্রাচীন ভারতীয় রীতিনীতিসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কেহই ব্যগ্র ছিলেন না। অতএব পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুযায়ী রচিত নাটকের রসাস্বাদনের জন্য ইতিপূর্বেই দেশের রসিক সাধারণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বিশেষত সংস্কৃত নাটকের বৈচিত্র্যহীন নিয়মানুবর্তিতা সকলের পক্ষেই পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংঘাতে সমাজে যে রুচির পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, তাহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে মধুসূদনের সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল। মধুসূদন নিজের প্রতিভা বলে নিজেই অগ্রসর হইয়া গিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নূতন ভাবধারার প্রত্যক্ষ উদ্বোধন করিলেন মাত্র। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বরং প্রথমে পাঠকসমাজ

যে প্রকার অশ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ও আদর্শের দিক দিয়া জাতীয় রীতিবিরুদ্ধ হইলেও তাহাকে সমসাময়িক বাংলার দর্শক সমাজ সেই প্রকার অশ্রদ্ধা ত দূরের কথা বরং পরম ঔৎসুক্যের সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার এই মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও ইহার সাফল্য সম্বন্ধে নাট্যকার পূর্ব হইতে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'If this tragedy be a success, it must ever remain as the foundation stone of our national theatre'।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র আঙ্গিক এবং ভাবগত আদর্শই যে কেবল পাশ্চাত্ত্য প্রভাবানুমোদিত তাহাই নহে, ইহার কোন কোন চরিত্রসৃষ্টির আদর্শও পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রেরণা-সম্ভূত। উদয়পুরের রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহের চরিত্রটি সেক্সপীয়র প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ নাটক *The Life and Death of King John*-এর অন্তর্ভুক্ত রবার্ট ফেল্‌কন্‌ব্রিজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ফিলিপ দি ব্যাস্টার্ড-এর চরিত্রের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। মধুসূদন নিজেও তাহা তাঁহার এক পত্রে স্বীকার করিয়াছেন (মা. ম. জী. ৪৬৫)। এতদ্ব্যতীত মদনিকা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যে পুরুষোচিত গুণ, তাহারও প্রেরণা পাশ্চাত্ত্য নাটক হইতে আসিয়াছে। মদনিকা পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যে সকল দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত মধুসূদন সেক্সপীয়রের নাটক হইতে পাইয়াছেন। সেক্সপীয়র রচিত *As You Like It* নাটকের স্ত্রী-চরিত্র Ganymede পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদন করিয়াছে, তাঁহারই *Merchant of Venice* নাটকের স্ত্রী-চরিত্র Portia পুরুষবেশে অভিনয় করিয়াছিল। ইংরেজি নাট্যশালায় সেক্সপীয়রের সময়ে স্ত্রীর অংশ পুরুষ কর্তৃকই অভিনীত হইত বলিয়া স্ত্রীবেশধারী পুরুষদিগের পুরুষের অভিনয় অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইত না। সেইজন্য সেক্সপীয়র ব্যাপক ভাবে তাঁহার নাটকে এই রীতির প্রচলন করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের সময়েও বঙ্গীয় নাট্যশালার অবস্থা তদনুরূপ থাকার ফলে, তাঁহার পক্ষেও এই রীতির অনুকরণ করা কোন দিক দিয়া অসঙ্গতিপূর্ণ হয় নাই। বাংলা সাহিত্যে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মদনিকা চরিত্রের সুদূরস্পর্শী প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহে'র মধ্যেও অনুভব করা যায়। রাজসিংহের নির্মলা চরিত্রটি সম্পূর্ণভাবে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মদনিকা চরিত্রের উপর নির্ভর করিয়া পরিকল্পিত। এতদ্ব্যতীত নাটকের শেষাঙ্কে কন্যার শোকে উন্মত্ত ভীমসিংহ যে সকল আচরণ করিয়াছেন, তাহা সেক্সপীয়র রচিত 'কিং লীয়র' নামক বিষাদাত্মক নাটকের শেষ দৃশ্যে কন্যার শোকে উন্মত্ত রাজা লীয়রের অনুরূপ বলিয়া স্পষ্টই অনুভব করিতে পারা যায়।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ইউরিপিদিস নামক একজন প্রাচীন গ্রীক্ নাট্যকার খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে 'ইফিজেনিয়া এ্যাট্ অলিস্' নামক এক নাটক রচনা করেন। তাহার কাহিনীর সঙ্গে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনায় এই প্রাচীন গ্রীক্ নাটকখানি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। কিন্তু টডের 'রাজস্থানের কাহিনী' অপেক্ষা এই প্রাচীন গ্রীক্ নাটকের সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠতর, এইকথা বলিবার উপায় নাই। বিশেষত মধুসূদন নিজেই টড্ প্রণীত 'রাজস্থানের কাহিনী' তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র উৎসরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য কোন নাটকের কথা উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং এই ক্ষেত্রে তিনি টডের কাহিনীর পরিবর্তে গ্রীক্ নাটকের কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' গ্রীক্ নিয়তিবাদের যে প্রাধান্য দেখা যায়, তাহাও গ্রীক্ নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল বলিয়া মনে হইতে পারে না। মধুসূদনের মধ্যে নিয়তিবাদে বিশ্বাসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবজাত নহে,

বরং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতার ফল। গ্রীক্ নাটকের কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহার সঙ্গে টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'র কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গেরই অধিক ঐক্য আছে। এমন কি, মধুসূদনের কোন চিঠিপত্র হইতে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যাহাতে মনে হইতে পারে যে মধুসূদন কোনদিন এই গ্রীক্ নাটকটি পড়িয়াছিলেন। কাহিনীটি এইরূপ: ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রী গ্রীক্ নৌবহর অলিসের বন্দরে আসিয়া পৌঁছিবার পর সেখান হইতে আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। রাজপুরোহিত কলচাস দৈববাণী শুনায় যে আগামেমননের কন্যা ইফিজেনিয়াকে দেবী ডায়নার নিকট বলি না দিলে গ্রীক্ নৌবহর সেখান হইতে ট্রয় অভিমুখে যাত্রা করিয়া হেলেনকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। বহু বাধাবিঘ্নের পর ইফিজেনিয়া নিজের দেশের স্বার্থের দিকে চাহিয়া নিজেকে দেবীর নিকট উৎসর্গ করিতে স্থির করিল। গ্রীক্ নাটকের এই মূল কাহিনী ব্যতীত আরও যে সকল ঘটনা এবং চরিত্র আছে, তাহাদের কাহারও মধ্য হইতে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মুখ্য প্রেরণা আসিয়াছে এমন কথা মনে হইতে পারে না। ইফিজেনিয়ার পিতা আগামেমননের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর পিতা রাণা ভীমসিংহের অবস্থাগত সাদৃশ্য থাকিলেও মধুসূদন তাঁহার ভীমসিংহ চরিত্রকে সেই অনুযায়ী গঠন করেন নাই, বরং টডের কাহিনী অনুযায়ীই গড়িয়াছেন।

গ্রীক্ নাট্যকার ইউরিপিদিসের 'ইফিজেনিয়া এ্যাট্ অলিস' নাটকের কাহিনী অবলম্বন করিয়া খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী নাট্যকার রাসিন 'ইফিজিনি' (Iphigenie) নামে একখানি নাটক রচনা করেন। উভয়ের মধ্যে কাহিনীগত ঐক্য থাকিলেও অনৈক্যও বড় কম নহে। এমন কি, কিছু কিছু নূতন নূতন চরিত্র এবং ঘটনাও ইহাতে যুক্ত করা হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। সেইজন্য ইহা

দ্বারাও মধুসূদন প্রভাবিত হইয়া থাকিতে পারেন বলিয়া কেহ অনুমান করিয়াছেন।

গ্রীক্ নাটকে ইফিজেনিয়ার প্রণয়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিনায়িকা চরিত্রের উল্লেখ নাই, কিন্তু ফরাসী লেখক রাসিনের নাটকে ইরিফাইল নামে তাহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, ইহাদের প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত যে পথ অনুসরণ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র কোন ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জগৎ সিংহকে লইয়া বিলাসবতী এবং কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে অনুরূপ কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব গড়িয়া উঠে নাই। গ্রীক্ নাটকে ইফিজেনিয়াকে বলি দিবার জন্য ইফিজেনিয়ার পিতৃব্য আগামেমননকে সর্বদা প্ররোচিত করেন, 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিবার জন্য রাজমন্ত্রীই রাজাকে প্ররোচিত করেন, অবশ্য পিতৃব্য এই কার্য নিষ্পন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ফরাসী নাটকে পিতৃব্যের পরিবর্তে দেশের সৈন্যাধ্যক্ষ ধর্ম এবং দেশের নামে তাহাকে বলি দিবার জন্য রাজাকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। অবশ্য 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' রাজমন্ত্রী এই অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

সুতরাং ইহারও কাহিনীর ধারা অন্য প্রকার, ইহা দ্বারা মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এই কথা বলিতে পারা যাইবে না। মধুসূদনের কোন চিঠিপত্রেই 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা সম্পর্কে যেমন কোন গ্রীক্ নাটকের উল্লেখ নাই, তেমনই কোন ফরাসী নাটকেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ এই কথা সত্য, মধুসূদন গ্রীক্ এবং ফরাসী দুই-ই জানিতেন। ফরাসী নাটক 'ইফিজেনিয়া' অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'সরোজিনী নাটক' রচনা করিয়াছিলেন।

১০

প্রাচ্য প্রভাব

পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে ট্রাজিডি রচনা করা সত্ত্বেও মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্যে সংস্কৃত কাব্য-নাটক রচনার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ, মধুসূদনের মধ্যে যতই হোমার, মিল্টন, দাঁন্তে, সেক্সপীয়র নিজেদের প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনেই ভারতীয় জাতীয় রস-সংস্কারের প্রভাব গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে ট্রাজিডি রচনা তাঁহার লক্ষ্য হইলেও, তাহা রচনা করিবার জন্য তিনি যে ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা কদাচ প্রাচ্য প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। কয়েকটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই দেখা যায়, রাজা জগৎ সিংহ কৃষ্ণকুমারীর একখানি চিত্রপট দেখিয়া তাহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে চোখে দেখিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। পরবর্তী ঘটনায় দেখা যায় যে, কৃষ্ণকুমারীও মানসিংহের একখানি চিত্রপট দেখিয়াই তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছে, তাহাকে কোনদিন চোখে দেখিবার সুযোগ পায় নাই। টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'তে এই প্রসঙ্গ কাহারও সম্পর্কে উল্লেখিত হয় নাই। সুতরাং মধুসূদনের ইহা সম্পূর্ণ নূতন যোজনা। সংস্কৃত কাব্য এবং নাটকের নায়ক-নায়িকাগণই চিত্রপট দর্শন করিয়া প্রণয়াসক্ত হইয়া থাকেন, পাশ্চাত্ত্য কাব্য এবং নাটকের নায়ক-নায়িকাদিগের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায় না। সুতরাং মধুসূদন নিজে হইতে এখানে যে সংস্কৃত কাব্য-নাটকের চরিত্রের অনুকরণে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তিনি নিজেও এই সম্পর্কে পৌরাণিক চরিত্র রুক্মিণীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজা জগৎ সিংহের চরিত্রটি আনুপূর্বিক শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের নায়কের অনুরূপ। তাঁহার চরিত্র রূপায়ণে টডের কিংবা সেক্সপীয়রের আদর্শ মধুসূদন অনুসরণ করেন নাই।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ধনদাসের যে সুদীর্ঘ স্বগতোক্তিটি রচিত হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ, পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুরূপ নহে। মঞ্চোপকরণের অভাবে সংস্কৃত নাটকেই ঘটনার বিবৃতিকারীর স্বগতোক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, পাশ্চাত্ত্য নাটকের সংলাপের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মধুসূদন তাঁহার পূর্ববর্তী দুইখানি নাটকে বিদূষকের স্বগতোক্তি যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত ট্রাজিডি বলিয়া ইহার স্বগতোক্তি রচনায় পাশ্চাত্ত্য ধারা অনুসরণ করেন নাই। মধুসূদন তাঁহার কোন নাটকেই পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে রচিত স্বগতোক্তি ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কারণ, মধুসূদন নাটককে কাব্য হইতে পৃথক্ রাখিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই কার্যে ব্যর্থ হন নাই।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র বিলাসবতী চরিত্রটি মধুসূদন শূদ্রক রচিত প্রসিদ্ধ নাটক 'মৃচ্ছকটিকা' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার নামটি সংস্কৃত গদ্যকাব্য বাণভট্টের 'কাদম্বরী' হইতে পাইয়াছেন। 'মৃচ্ছকটিকা' নাটকে চারুদত্তের প্রতি রাজনটী বসন্তসেনার প্রেম যেমন অকৃত্রিম ছিল, রাজা জগৎ সিংহের প্রতি বারাঙ্গনা বিলাসবতীর প্রেম তেমনই অকৃত্রিম ছিল, অবশ্য এই বিষয়টি ব্যতীত অন্যান্য দিক বিচার করিলে চরিত্র দুইটির আচার-আচরণের মধ্যে অনেক পার্থক্যও দেখা যায়। মদনিকা শৃঙ্গাররসাত্মক সংস্কৃত নাটকের সখী কিংবা সহচরীদিগের একটি সাধারণ নাম। মধুসূদন তাঁহার নামটি সংস্কৃত নাটক হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই অনুযায়ী তাহাকে বুদ্ধিমতী এবং সুচতুরা রূপে কল্পনা করিয়াছেন, তবে তাহার পুরুষবেশ ধারণের পরিকল্পনা অবশ্যই পাশ্চাত্ত্য নাটক হইতে আসিয়াছে।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র তপস্বিনী চরিত্রও সংস্কৃত নাটকের আদর্শে

গঠিত, কোন পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে পরিকল্পিত নহে। তবে তাহার চরিত্র রক্তমাংসের সম্পর্কহীন। তাঁহার কপালকুণ্ডলা নামটিও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে আসিয়াছে বলিয়াই মনে করিতে হয়। তবে তপস্বিনীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইয়াছে, সেই তুলনায় নামটি খুব সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

ধনদাস খল চরিত্র, 'মৃচ্ছকটিকা' নাটকের শ'কার চরিত্রের অনুরূপ। তাহার আচরণ এবং সংলাপ অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্র সুলভ। মধুসূদন তাঁহার পূর্ববর্তী দুইখানি নাটকেই বিদূষক চরিত্রকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনায় তাহার সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই ; অথচ বিয়োগান্তক নাটক বলিয়া পরিপূর্ণ বিদূষক চরিত্রের স্থানও ইহাতে দিতে পারেন নাই। সেইজন্য ধনদাসের মধ্য দিয়াই সেইকার্য যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন, এই সূত্রে ধনদাসকে বিয়োগান্তক নাটকের বিদূষক বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে রচিত ট্রাজিডি হওয়া সত্ত্বেও 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র কাহিনী বর্ণনায় মধুসূদন প্রাচ্য রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং সংস্কৃত কাব্য-নাটকের বহু প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলন করিয়া মধুসূদন যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নানাভাবে তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' তাহার ব্যাপক প্রকাশ দেখা যায়। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় :

ধনদাস। নলরাজা যে হংসকে দূত ক'রে পাঠিয়েছিলেন, তার সোনার পাখা ছিল ; এ দাসের কি আছে, মহারাজ! ১।১

তপস্বিনী। মহিষি! সুবর্ণকান্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়।... দেখুন, স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি পর্যন্ত ক্লেশ না সহ্য করেছিলেন।

অহল্যা। রাজপদ যদি সুখদায়ক হতো, তা হ'লে কি আর ধর্মরাজ, রাজ্যত্যাগ ক'রে মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন। ২।১

১১

দেশাত্মবোধ

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'ই বাংলা নাট্যসাহিত্যে সর্বপ্রথম দেশাত্মবোধের বিকাশ দেখা যায়। তবে এই কথা সত্য, দেশাত্মবোধকে এই নাটকে মুখ্যভাবে অবলম্বন করিবার যে সুযোগ ছিল, মধুসূদন তাহার পরিপূর্ণ ব্যবহার করেন নাই। প্রাচীন গ্রীক্ নাটক 'ইফিজেনিয়া এ্যাট্ অলিসে' দেশ এবং জাতির কল্যাণে ইফিজেনিয়ার আত্মোৎসর্গ করিবার বিষয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্যেও দেশ এবং জাতির বৃহত্তর কল্যাণে কৃষ্ণার আত্মবলিদানের কথা প্রচার করিবার সুযোগ ছিল, কিন্তু মধুসূদন এখানে টড্‌কে অতিক্রম করিয়া যান নাই, যদি গ্রীক্ নাটককে অনুসরণ করিতেন তবে তিনি সম্ভবতঃ তাহার প্রভাব স্বীকার করিতেন, কিন্তু ইহাতে তিনি তাহা করেন নাই। সুতরাং দেশাত্মবোধ কৃষ্ণকুমারী নাটকের মূল লক্ষ্য নহে, তথাপি কোন কোন চরিত্রের মুখে এই বিষয় যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মধুসূদনের টড্‌কে অনুসরণ করিবার ফল নহে, তাহা মধুসূদনের যুগচেতনার ফল ; কারণ, ইতিপূর্বেই ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলালের মধ্য দিয়া এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' তাহা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চরিত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথমত জগৎ সিংহের মন্ত্রীর মুখে দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি যখন দেশ-বৈরিদলের দ্বারা দেশ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছেন, তখন রাজা জগৎ সিংহকে 'ঘরাও বিবাদ' পরিত্যাগ করিয়া সকলকে দেশরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবার পরামর্শ দিতেছেন (১।১)।

রাণা ভীমসিংহ ভারতের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তপস্বিনী চরিত্রের মুখেও এই আশা প্রকাশ পাইয়াছে,

> ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাক্‌বে না। যে পুরুষোত্তম সাগর মগ্না বসুধাকে বরাহ রূপ ধ'রে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এই পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? ২।১

কৃষ্ণার হাতে একটি গোলাপ ফুল দেখিয়া রাণা ভীমসিংহ ভাবিতেছেন,

> যে সর্পের সহকারে আমরা মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্চে। ২।১

তারপর চকিতে বাহিরে দুন্দুভি ধ্বনি শুনিয়া কোন আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন,

> আঃ! এ ভারতভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে। আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বহিতে থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘট্‌লো। ২।১

রাণা ভীমসিংহের মনে পরাধীন এবং দুর্গত ভারতবর্ষের চিন্তা নানা ভাবে উদিত হইয়া তাঁহাকে সর্বদা বিমর্ষ করিয়া রাখিয়াছিল।

বলেন্দ্র সিংহ যদিও এই নাটকের মধ্যে একটি অত্যন্ত হীনকার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মুখেও স্বদেশের হিতসাধনের কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে,

> মহারাজের কিংবা স্বদেশের হিতসাধনে যদিও আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তা'তেও আমি প্রস্তুত আছি। ৫।১

পূর্বেই বলিয়াছি, যদিও নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের রচনাতেই দেশাত্মবোধের অভিব্যক্তি প্রথম দেখা গিয়াছে, তথাপি বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বেই তাহার প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ড কবিতা এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যায়িকা কাব্য উভয় শ্রেণীর রচনার মধ্যে ইতিপূর্বেই ইহার অভিব্যক্তি হইয়াছিল। তবে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' দেশাত্মবোধকে মুখ্য করিয়া কাহিনী রচনা

করিতে পারিতেন, এমন কি, কৃষ্ণকুমারীর মুখে দেশাত্মবোধক বক্তৃতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন ; তথাপি তিনি সে পথে অগ্রসর হন নাই। কারণ, দেশাত্মবোধ তখনও জাতির জীবনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। কেবলমাত্র কাব্যের ভাব-বিলাসিতার মধ্যেই তাহার তখন অবস্থান ছিল। মধুসূদনই ইহাকে কাব্যের ভাববিলাসিতার ক্ষেত্র হইতে নাটকাহিনীর জীবন্ত ক্ষেত্রে মুক্তি দিলেন।

ইফিজেনিয়ার কাহিনী অবলম্বন করিয়া মধুসূদনের পরবর্তী কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সরোজিনী' নামে দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহার কাহিনীর সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র কাহিনীর যে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' দেশাত্মবোধের সম্যক্ বিকাশ না হইবার প্রধান কারণ, জাতির চিত্তে তখন পর্যন্ত এই ভাবনা কোন সক্রিয়-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সময় তাহা অনেকখানি সম্ভব হইয়াছিল। ইহার অন্যতম কারণ, মধুসূদনের 'রাজস্থানের কাহিনী'র প্রতি আনুগত্য। যে কৃষ্ণকুমারী চরিত্রের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আন্তরিক হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার উপর কোন অসঙ্গত আচরণ আরোপ করিবারও তিনি স্বভাবতই পক্ষপাতী ছিলেন না। সেইজন্য তিনি এই বিষয়ে যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা তিনি অন্যান্য চরিত্রের মধ্য দিয়াই করিয়াছেন।

১২
বাস্তবতা ও কাব্যগুণ

মধুসূদন তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, আমাদের সাহিত্যে নাটক বলিতে যাহা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে নাটক নহে, নাট্যকাব্য। কিন্তু তিনি যাহাতে সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত নাটকই রচনা করিতে পারেন, সেই দিকে সতর্ক থাকিবেন। তাঁহার নিজের ভাষায় 'I shall endeavour to create characters which speak as nature suggests and not mouth mere poetry.' তিনি তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা সম্পর্কে এই লক্ষ্যে কতদূর স্থির ছিলেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে বার বারই রোমান্টিক ট্রাজিডি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রোমান্টিক ট্রাজিডিতে কাহিনীর পরিবেশ রোমান্টিক থাকিলেও তাহার চরিত্র সৃষ্টিতে যদি বাস্তব গুণ প্রকাশ না পায়, তবে তাহা কখনও নাটক হইতে পারে না। অর্থাৎ কাহিনী কাল্পনিক হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু ইহার মধ্যে যে নরনারীর চরিত্রগুলি থাকিবে, তাহাদের আচার-আচরণ বাস্তব জীবনোচিত হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য যথার্থ রচনা শক্তি থাকিলে পৌরাণিক বিষয়বস্তু লইয়াও সার্থক নাটক রচিত হইতে পারে। বাইবেলের বিষয়বস্তু লইয়া ইউরোপীয় সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের নাটক রচিত হইয়াছে। সেক্সপীয়রের নাটকগুলিও রোমান্টিক বিষয়বস্তু লইয়াই রচিত; কিন্তু তাহাদের চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে যে বাস্তব গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই উৎকৃষ্ট নাটক রূপে ইহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কবিত্ব থাকিলেই যে রচনা নাটক হইতে কোন বাধা সৃষ্টি করে, তাহা নহে; কারণ, সেক্সপীয়রের নাটকগুলিও কবিত্ব বর্জিত

নহে, তিনি একাধারে যেমন কবি ছিলেন, তেমনই অন্য দিক দিয়া বাস্তব জীবনবোধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটকগুলি রচিত হইয়াছে। কবিত্বের মধ্যেও যদি বাস্তব জীবনবোধের সচেতনতা থাকে, তবে তাহা দ্বারা সার্থক নাটক রচিত হইবার পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি হইতে পারে না।

তবে এই কথা সত্য, মধুসূদন নিজে কবি হওয়া সত্ত্বেও কবিত্ববোধকে যথাযথ সংযত করিয়াই তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার অধিকাংশ চরিত্রেরই সংলাপের ভাষায় কাব্যভাষাও ব্যবহৃত হয় নাই। তবে যেখানে তিনি সেক্সপীয়রকে একেবারে অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, সেইখানেই সেই অনুসরণের সূত্রেই সেক্সপীয়রের রচনার পথ ধরিয়াই কবিত্বের ভাব তাঁহার রচনার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। যেমন, রাজা ভীমসিংহের উন্মাদ দৃশ্য কিংবা কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু দৃশ্যের প্রাকৃতিক পটভূমিকা। নিম্নোদ্ধৃত অংশে যে কবিত্ব ও কল্পনার স্পর্শ আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা সেক্সপীয়রের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেমন,

(ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জন)

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি পামরের গর্হিত কর্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ ক'রেছেন, আর চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আবরণ পরিত্যাগ করে চামুণ্ডারূপে গর্জন কচ্ছেন। উঃ কি ভয়ানক ব্যাপার, কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ তুমি আমায় গ্রাস কত্তে উদ্যত হয়েছ? উঃ মেঘবাহন অন্ধকারকে ঐ পুনঃ পুনঃ দীপ্তিমান্ কশাঘাত ক'রে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্ছেন।··· ৫।২

এই কবিত্ব সেক্সপীয়রের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল, নতুবা মধুসূদন যেখানে স্বাধীনভাবে কাহিনী এবং সংলাপ রচনা করিয়াছেন, সেখানে এতখানি কবিত্বের প্রশ্রয় খুব অল্পই দিয়াছেন।

কেবল সেক্সপীয়রের নাটকের অনুকরণের ফলেই যে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' কবিত্ব প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই নহে—সংস্কৃত নাটকের অনুকরণের জন্যও তাঁহার নাটকের নানা স্থানে কবিত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকের আদর্শকে অনেক ক্ষেত্রেই মধুসূদন বাধ্য হইয়া অনুসরণ করিয়াছেন, সেইজন্য তাহা তাঁহার নিজস্ব রচনার বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র তপস্বিনী চরিত্রটি ভাবমূলক, ইহাকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে তাঁহার সংলাপ কাব্য-ভাবাপন্ন নহে, তাঁহার আচার এবং আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নাই; সেইজন্য অবাস্তব হওয়া সত্ত্বেও নাটকে ইহা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতে পার নাই।

মধুসূদন বলিয়াছেন, 'In the Sarmistha, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere poet.' ইহার একমাত্র কারণ, 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' তিনি সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' সংস্কৃত নাটকের প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতের পরিবর্তে যে সেক্সপীয়রকে অনুসরণ করিয়াছেন, সেখানেই কবিত্ব অসঙ্গত অধিকার স্থাপন করিয়াছে। সেক্সপীয়র কাব্যের সঙ্গে নাটকের যে সহজ সমন্বয় সাধন করিয়া লইতে পারিয়াছেন, মধুসূদন তাহা পারেন নাই বলিয়াই সেক্সপীয়রের এই বিষয়ক অনুসরণ মধুসূদনের রচনার অন্যতম ত্রুটির কারণই হইয়াছে, তাহার কোন গুণ প্রকাশ করিতে পারে নাই। যেখানে মধুসূদন সকল প্রভাব মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে সংলাপ রচনা করিয়াছেন, সেখানে তিনি কবিত্ব সর্বদাই বর্জন করিয়াছেন এই কথা সত্য।

১৩
হাস্যরস

মধুসূদন তাঁহার পূর্ববর্তী দুইখানি মিলনাত্মক নাটকে সংস্কৃত নাট্য-রীতি অনুসরণ করিয়া বিদূষকের মধ্যস্থতায় স্থূল হাস্যরসের অবতারণা করিলেও তাঁহার বিয়োগাত্মক রচনা 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' স্বভাবতই এই বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছেন। ট্রাজিডিতে হাস্যরসের অবতারণা সম্পর্কে মধুসূদনের যে ধারণা ছিল, সেই সম্পর্কে তিনি নিজেই এক পত্রে লিখিয়াছেন, 'As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being comic; in my humble opinion such a thing could not be keeping with the nature of the play. But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it'.···এই বিষয়ে তিনি সেক্সপীয়রকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' সংস্কৃত নাটক অনুযায়ী কোন বিদূষক চরিত্র না থাকিলেও ইহার একটি খল চরিত্র ধনদাস অনেকখানি এই বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ধনদাসের এই নাটকে দ্বৈত ভূমিকা রহিয়াছে। প্রথমত সে ইংরেজি নাটক অনুযায়ী খল বা villain চরিত্র, দ্বিতীয়ত সে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক; এই উভয়ের মিশ্র উপাদানে তাহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' আর একটি যে চরিত্র হাস্যরসিকের ভূমিকায় প্রায়শই অবতীর্ণ হইয়াছে, সে একটি স্ত্রীচরিত্র, নাম মদনিকা। অনুরূপ স্ত্রীচরিত্রের কল্পনা মধুসূদন সেক্সপীয়রের নাটক হইতেই পাইয়াছেন। মদনিকা বিলাসবতীর সহচরী; রাজা জগৎ সিংহের সঙ্গে বিলাসবতীর প্রেমের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য তাহার সহায়িকা

হইয়াছে। সে অত্যন্ত চতুরা, তাহার চাতুর্যের মধ্য দিয়া অনেক সময় হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার সংলাপ সর্বত্রই হাস্যরসের স্পর্শে সমুজ্জ্বল। সে এই নাটকে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার হাস্যরসের স্পর্শে কাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ সরস হইয়া আছে। বিশেষত যে সকল অংশে পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে ধনদাসের সঙ্গে ছলনা করিয়াছে, সেই সকল অংশের হাস্যরস কাহিনীর করুণরসের প্রবাহকে ব্যাহত করিয়া দিয়াছে।

এই নাটকের অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে মরুদেশের দূতও কাহিনীর হাস্যরস সৃষ্টিতে সহায়ক হইয়াছে। ধনদাসের সঙ্গে তাহার বিবাদের বিবরণ হাস্যরসাত্মক পরিকল্পনার উপর স্থাপিত।

ট্রাজিডির মধ্যে যে সকল চরিত্র হাস্যরস সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত বিদূষক শ্রেণীর চরিত্র হইতে পারে না, তাহাদের হাস্যরসের পরিবেষণ তাহাদের কেবলমাত্র কোন বহির্মুখী আচরণ নহে, তাহা অন্তর্মুখী সুগভীর কোন স্বার্থসিদ্ধির ছলনা মাত্র। সেক্সপীয়রের ট্রাজিডির fool কিংবা clown শ্রেণীর চরিত্রগুলিও অধিকাংশ তাহাই। তাহাদের হাস্যরসের অন্তরালে হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দন প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনায় এই শ্রেণীর কোন হাস্যরসাত্মক চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এই কথা বলিতে পারা যাইবে না; তথাপি সম্পূর্ণ বিদূষক প্রকৃতির কোন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও বলা যাইবে না। আগেই বলিয়াছি, ধনদাস সংস্কৃত নাটকের বিদূষক এবং সেক্সপীয়রীয় নাটকের খল চরিত্রের মিশ্র উপাদানে সৃষ্ট। অর্থাৎ মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য ট্রাজিডি অনুযায়ী 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিতে গিয়াও সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাহার ফলে তিনি ধনদাসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য নাটকের খল-চরিত্রের রূপও যেমন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন নাই, তেমনই সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের রূপটিও যথাযথ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

খল-চরিত্রগুলি অনেক সময় তাহাদের উদ্দেশ্য গোপন করিবার জন্য বাহিরে এক ছদ্ম আবরণ ধারণ করিয়া থাকে, ধনদাস তাহা করে নাই। রাজা জগৎ সিংহ ধনদাসকে 'সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়' বলিয়া জানে; কিন্তু নাটকে সে যে আচরণ করিয়াছে, তাহা এই পরিচয়োচিত নহে, বরং তাহার আচরণ হইতে তাহাকে এক ধূর্ত বণিক্ বলিয়া মনে হয়। সে অর্থের দাস, প্রতারণাই তাহার অর্থ-লাভের একমাত্র পথ। তাহার হাস্যরসের অন্তরালে তাহার এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য গোপন হইয়া আছে। এই স্বার্থসিদ্ধি করিতে গিয়া সে মদনিকার নিকট যে ভাবে পরাজিত হইয়াছে, তাহা এই নাট্যকাহিনীর হাস্যরস সৃষ্টির পোষকতা করিয়াছে।

মদনিকার হাস্যরস সৃষ্টির অন্তরালে তাহার নিজের কোন স্বার্থ নাই। কেবলমাত্র তাহার সহচরী বিলাসবতীর স্বার্থরক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সে নানা দুঃসাহসিক এবং হাস্যরসাত্মক আচরণ করিয়াছে। সে খল-চরিত্র নহে, তাহার নিজের কোন স্বার্থ দ্বারা সে তাড়িত নহে, সুতরাং তাহার আচরণ তাহার জীবনের গভীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, কেবলমাত্র কাহিনীর উপরিস্তরে বিস্তার লাভ করিয়া তাহা দ্বারা লঘু তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, জীবনের সুগভীর তলদেশে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

সুতরাং মধুসূদন যে বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া কোন দৃশ্যই তিনি বর্ণনা করেন নাই, তাহা সত্য নহে। পুরুষবেশিনী মদনিকা এবং ধনদাসের সংলাপ কোন কোন দৃশ্যে আদ্যোপান্তই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা সর্বত্রই হাস্যরসাত্মক এবং তাহা দ্বারা কাহিনীর বিয়োগাত্মক পরিণতির রস-নিবিড়তা যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহা মনে হইতে পারে না। অর্থাৎ মধুসূদন যতটুক হাস্যরস তাঁহার রচিত এই বিয়োগান্তক নাটকে পরিবেষণ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অধিক পরিমাণেই তিনি তাহা পরিবেষণ করিয়াছেন। তাহার ফলেই ইহার কাহিনীর করুণ রসের নিবিড়তা আদ্যোপান্ত রক্ষা

পাইতে পারে নাই। সেক্সপীয়রকে এই বিষয়ে যে তিনি আদর্শ করিবেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তাহাও তিনি করিয়া তুলিতে পারেন নাই। প্রধানত সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রের সংস্কার তাঁহাকে এই বিষয়ে বাধা দিয়াছে।

ট্রাজিডিতে সেক্সপীয়র কর্তৃক হাস্যরসের ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া মধুসূদন তাঁহার উক্ত পত্রেই লিখিয়াছেন, 'The only piece of criticism I shall venture upon, is this ; never strive to be comic in a tragedy ; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in less important scenes, so as to have an agreeable variety. This, I believe, to be Shakespeare's plan.

মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র মধ্যে হাস্যরস বিষয়ে এক সংযত আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন, তাহা কদাচ বলিতে পারা যায় না। প্রথমত কাহিনীর কেবলমাত্র শেষ অঙ্ক ব্যতীত সর্বত্রই হাস্যরসাত্মক সংলাপের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার ফলে চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত কাহিনী করুণ রসের দিক হইতে নিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই। এই বিষয়ে সেক্সপীয়রের কোন ট্রাজিডির সঙ্গে ইহার কোন তুলনাই হয় না। বিশেষত অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে হাস্যরসের অবতারণার যে পরামর্শ তিনি দিয়াছেন, তাহাও তিনি তাঁহার উক্ত নাটকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ, ধনদাস এবং মদনিকা উভয়েই নাটকের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাহাদের আচার-আচরণ এবং সংলাপের মধ্যে সর্বত্রই এই নাটকে হাস্যরস প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং মধুসূদন তাঁহার পত্রে যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, নাটকে তাহাকে রূপ দিতে পারেন নাই।

*

১৪

চরিত্র-বিচার

কৃষ্ণকুমারী চরিত্রকে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র নায়িকা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কিন্তু ইহার মধ্যেও একটু বিশেষত্ব আছে, সাধারণত

কৃষ্ণকুমারী

পাশ্চাত্ত্য নাটকের নায়িকা চরিত্র যাহা হইয়া থাকে, কৃষ্ণকুমারী তাহা নহে। সে সংস্কৃত নাটকের নায়িকার অনুরূপ চরিত্র। মধুসূদন ইতিপূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত যে 'রত্নাবলী' নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার নায়িকা রত্নাবলী চরিত্রের প্রভাব হইতে তিনি শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণকুমারী তাহারই আদর্শে পরিকল্পিত। ইহা যেমন সেক্সপীয়রের কোন ইংরেজি নাটকের আদর্শে রচিত নহে, তেমনই জেমস্ টডের যে 'রাজস্থানের কাহিনী' হইতে তিনি তাঁহার নাট্যকাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কৃষ্ণকুমারী চরিত্র অবলম্বনেও আনুপূর্বিক পরিকল্পিত নহে।

কৃষ্ণকুমারী সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটকের নায়িকার মতই কাহিনীতে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই। তাহার কোন আচরণ দ্বারা কাহিনীর ধারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তথাপি সমগ্র নাট্যকাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য কৃষ্ণকুমারী। তাহার করুণ পরিণতিতেই কাহিনীর পরিণতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাহাকেই নাটকের নায়িকা বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়।

মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র সম্পর্কে বলিয়াছেন—'The Princess, I hope, is dignified yet gentle,' রাজপুত রাজকুমারীর চারিত্রিক মর্যাদা রক্ষা করিয়া মধুসূদন তাহার চরিত্র সৃষ্টি করিতে কতদূর সার্থক হইয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। মদনিকার কৌশলে মানসিংহের প্রতি প্রণয়াবদ্ধ হইবার পর কৃষ্ণকুমারী একদিন নেপথ্য হইতে একটি সঙ্গীত গাহিতেছিলেন, তাহার প্রতি তপস্বিনী তাঁহার জননীর দৃষ্টি আকর্ষণ

করিলেন, উভয়েই গানটি মনোযোগের সঙ্গে শুনিলেন; কারণ, তপস্বিনী বলিলেন 'দেখুন, মহিষি! রাজনন্দিনীর মনের ভাব এখনই প্রকাশ হবে'। কৃষ্ণকুমারীর গানটি এই:

তারে না হেরে আঁখি ঝুরে
প্রাণ হরে কামশরে জরজরে;
রজনী দিবসে মানসে নাহি সুখ,
মনোদুঃখ তোমা বিনে, সই, কহিব কাহারে।
মলয় পবন দাহন সদা করে,
কোকিলের কুহুরবে তার হৃদয় বিদরে। ৩৷২

ইহাতে যে পূর্বরাগের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ নহে, বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ হইলেও হইতে পারে; এমন কি, ইহাকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যার পূর্বরাগও বলা যাইতে পারে। সুতরাং মধুসূদনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র এখানে সৃষ্টি হয় নাই, এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

তপস্বিনীর নিকট মানসিংহের প্রতি তাহার অনুরাগের কথা প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণকুমারী রাজপুত রাজকুমারীসুলভ চরিত্রের পরিচয় কতখানি রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাও বিবেচনার বিষয় হইতে পারে। বিবাহে সে স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছে, মাতাপিতার অভিপ্রায় অনুসারে জগৎ সিংহের নিকট তাহার বিবাহের প্রস্তাব সে অনুমোদন করে নাই; সে বরং তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছে,

মা, আমি কি অপরাধ করেছি যে, তোমরা আমাকে জলে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছ? (রোদন) ৩৷২

এখানে কৃষ্ণকুমারী প্রগল্‌ভা নায়িকার মত আচরণ করিয়াছে, মধুসূদন যে তাহাকে gentle বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে তাহার সেই পরিচয়ও রক্ষা পাইতে পারে নাই।

জেমস্ টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'তে কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র যথার্থই মধুসূদনের ভাষায় dignified and gentle, কিন্তু মধুসূদন তাহাকে তেমন করিয়া গড়িতে পারেন নাই ; পাশ্চাত্ত্য নাটকের নায়িকার আদর্শের সঙ্গে এখানে প্রাচ্য নাটকের নায়িকার চরিত্রের সহজ সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই বলিয়াই ইহাতে এই ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

মাতাপিতার অভিমতের বিরুদ্ধে তাহাদের অনভিপ্রেত ব্যক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কৃষ্ণকুমারী পরোক্ষে তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, পাঠকের উপরও ইহা অলক্ষিতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; তাহার ফলে, গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সে দর্শকের সামগ্রিক সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহার মৃত্যু যত করুণই হোক, তাহা অতি-নাটকীয় বা melo-dramatic হইলেও যথার্থ ট্রাজিডির রসসিক্ত হইতে পারে নাই।

সংস্কৃত নাটকের নায়িকাদিগের মতই চিত্রপট দেখিয়া কৃষ্ণা মানসিংহের প্রতি সুগভীর প্রেমে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে নিজেও ইহা ভাবিয়া বিস্ময়বোধ করিয়াছে,

> আমি যাকে কখন দেখি নাই, যার নাম এখন শুনি নাই, যার সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই, তার জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন? ৩।২

পাশ্চাত্ত্য আদর্শে ট্রাজিডি রচনা করিতে গিয়াও মধুসূদনকে প্রাচ্য আদর্শে এখানে তাহার নায়িকা চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইয়াছে ; সুতরাং ইহা দ্বারা যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, পরিপূর্ণ পাশ্চাত্ত্য নায়িকা চরিত্রও যেমন হয় নাই, তেমনই পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাটকের নায়িকাও হইতে পারে নাই। নায়ককে চোখে দেখিয়া নায়িকার প্রেমে পড়িবার রীতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) উপন্যাস হইতেই প্রথম সুরু হইয়াছিল।

মধুসূদন তখনও এই বিষয়ে প্রাচীন ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। জেম্‌স্‌ টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'-তে এই প্রসঙ্গ একেবারেই নাই, তাহাতে বরং কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র অধিকতর গৌরবান্বিত (dignified) হইয়াছে।

তথাপি কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র সৃষ্টি একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে, এই কথা বলিতে পারা যায় না। কৃষ্ণা এই বিষাদান্তক নাটকের নায়িকা। পিতা ভীমসিংহের সংসার অনিশ্চয়তা এবং অশান্তি দ্বারা বিক্ষুব্ধ, বাহ্যবিক্ষোভের তাড়নায় ভীমসিংহ তাঁহার পারিবারিক জীবন উপেক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য হইতেছেন। রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে তাঁহার এই নাটকে প্রথম সাক্ষাৎকারেই কন্যার অভিমান-ক্ষুব্ধ অভিযোগ শুনিতে হইল, 'পিতা, আপনি অনেকদিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা' আজ একবার চলুন।' ইহা হইতেই রাজপরিবারে থাকিয়াও কৃষ্ণকুমারী যে কি ভাবে জীবন যাপন করে, তাহার আভাস পাওয়া গেল। তাহার উপর তাহার মাতার সতর্কতার অবধি নাই, কিন্তু শেষ এই সতর্কতাও কার্যকরী হইল না। রাজপ্রাসাদের অন্তরালে অধিকাংশ কুমারী রাজকন্যা যে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়, কৃষ্ণার জীবনেও তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল বলিয়া মনে হয় না। নিঃসঙ্গতা হইতেই তাহার মনে বিষাদের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং বিষাদ-মগ্ন ভাবই তাহার জীবনের করুণ পরিণতির সহায়ক হইয়াছে। কৃষ্ণার চরিত্র যদি সদাপ্রফুল্ল ও হাস্যময় হইত, তাহা হইলে তাহার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি আরও করুণ হইত। স্নেহ-সম্পর্কহীন নিঃসঙ্গ জীবনে সে নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের ভার বহন করিয়া গিয়াছে।

মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' যে একটি মাত্র চরিত্রকে টডের রাজস্থানের কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গের চরিত্রের অনুযায়ী অনেক-

ভীমসিংহ

খানি সার্থক রূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা রাণা ভীমসিংহের চরিত্র। ভীমসিংহের চরিত্রের শেষাংশ সেক্সপীয়রের নাটক *King Lear*-এর নায়ক-চরিত্র রাজা

লীয়রের শেষাংশের অনুরূপ। কিন্তু তাহা আনুপূর্বিক রাজা লীয়রের চরিত্রের অনুসরণে রচিত নহে। কারণ, সেক্সপীয়রের পরিকল্পিত রাজা লীয়রের যে চরিত্রগত দৃঢ়তা দেখিতে পাই, ভীমসিংহে তাহার লেশমাত্র নাই। কন্যা কর্ডিলিয়ার মৃত্যুর পর রাজা লীয়রের ভীষণ শোকোন্মত্ত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহার জীবনের পরিণতিকে যে প্রকার শোচনীয় করিয়া নাট্যকার সেখানে উপস্থিত করিয়াছেন, ভীমসিংহের চরিত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভীমসিংহের চরিত্রের প্রধান ত্রুটি এই যে, তাহার মধ্যে কোন আকর্ষণীয় গুণ নাই; অথচ তাহাকেই নাটকের নায়ক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার চরিত্রে চাঞ্চল্য আছে, রাজা লীয়রের মত স্থৈর্য নাই। মধুসূদন ভীমসিংহকে ইতিহাসে 'A sad and serious man' রূপেই পাইয়াছিলেন; নাটকেও তাঁহার চরিত্রগত এই ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ভীমসিংহ অবস্থা-বিপর্যয়ে পড়িয়া লাঞ্ছনার ভাগী হইয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার নৈতিক ও মানসিক বল ক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মহারাষ্ট্রদস্যুকে তিনি উৎকোচ দিয়া রাজ্য নিরাপদে রাখেন, মানসিংহকেও ভয় করেন, জগৎ সিংহকেও ভয় করিয়া চলেন। বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িলে দুই চোখ বুজিয়া থাকাই বিপদ হইতে মুক্তির উপায় বলিয়া তাঁহার ধারণা। তাঁহার চরিত্রগত দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই মন্ত্রী কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিবার মত এক জঘন্য ও নির্মম প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইল। যে ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধের উপর রাজপুত বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের মহিমা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার চরিত্রে তাহার লেশমাত্রও ছিল না। সেইজন্য কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিবার প্রস্তাবে সম্মতি দিতেও যেমন তিনি পশ্চাৎপদ নহেন, তেমনি তাহার মৃত্যুশোকও তিনি স্থিরভাবে সহ্য করিতে অক্ষম। উন্মাদনাই তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হইয়াছিল।

কিন্তু টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'তে তাঁহার উন্মাদ হইবার

কথা নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা সেক্সপীয়রের নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।

পূর্বেই বলিয়াছি, রাজা ভীমসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহের চরিত্রটি সেক্সপীয়রের রচিত *King Jhon* নামক নাটকের ফিলিপ

বলেন্দ্র সিংহ

দি ব্যাস্টার্ড চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। বলেন্দ্র সিংহ ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, কৃষ্ণকুমারীর হত্যাকে ভ্রাতার আদেশ বিবেচনা করিয়া বিনা দ্বিধায়ই এই জঘন্য কার্যে সে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তারপর কৃষ্ণকুমারীর নিকট যখন ধরা পড়িয়াছে, তখনও নিঃসঙ্কোচে এই কার্যে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে গিয়া এই ব্যাপারে তাহার ভ্রাতার নির্দেশের উল্লেখ করিয়া দিয়াছে। একটু নির্বোধ সরলতা তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাংলা নাট্যসাহিত্যে বহুকাল পর ইহার অনুরূপ আর একটি চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বিসর্জন' নাটকের নক্ষত্র রায়ের চরিত্র।

সাধারণত খল-চরিত্রের প্রেরণায় ট্রাজিডিতে এই শ্রেণীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়া থাকে এবং এই শ্রেণীর হত্যার পিছনে সুগভীর পারিবারিক বা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থাকে। এখানে তাহাদের কিছুই নাই। বলেন্দ্র সিংহ নিজের কোন স্বার্থের প্রেরণায় এই নৃশংস কার্যে অগ্রসর হইয়া যান নাই, তবে তিনি কিসের বশবর্তী হইয়া এই নৃশংস কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? তিনি রাজার নিকট এই বিষয়ে নিজে উল্লেখ করিয়াছেন :

> মহারাজের কিংবা স্বদেশের হিতসাধনে যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। ৫।১

কিন্তু যাহারা রাজভক্তি কিংবা দেশভক্তির জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে, বলেন্দ্র সিংহ তাহাদের চরিত্রের লোক নহেন; তাই তিনি কৃষ্ণার মত নিরপরাধের হত্যার কার্যে অগ্রসর হইয়া গেলেন। যাহারা রাজার জন্য কিংবা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়, তাহারা

রাজকন্যাকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করিয়া রাজসেবা কিংবা দেশ সেবা কিছুই করিতে পারে না; বলেন্দ্র সিংহও করিতে পারে নাই। সে দুর্বল চিত্ত ব্যক্তি, স্বদেশের হিতসাধনের কথা তখন নূতন এই দেশে আসিয়াছে। ইহা তাহার মুখে না সাজিলেও মধুসূদন তাহার মুখে ইহা দিয়াছেন, কিন্তু সেইজন্যই তাহার চরিত্রকে গৌরবান্বিত করিতে পারেন নাই।

নাটকে বলেন্দ্র সিংহের আচরণটি অতি-নাটকোচিত বা melo-dramatic। ঘুমন্ত কৃষ্ণাকে হত্যা করিবার জন্য খড়্গ তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'তে এই প্রসঙ্গ অধিকতর কাব্যধর্মী এবং সার্থক। রাজমন্ত্রী সত্যদাসের চরিত্রকে এই নাটকের অন্যতম খল-চরিত্র বলা যায়। কারণ, কৃষ্ণ-

সত্যদাস

কুমারীকে হত্যা করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্য সে-ই রাজাকে সর্বাধিক প্ররোচনা দিয়াছে। বলেন্দ্র সিংহকে সে-ই প্রত্যক্ষভাবে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে। রাজ্যের স্বার্থের জন্য সে সকল প্রকার মানবিক অনুভূতি বিসর্জন দিয়াছে। এই নিষ্ঠুর কার্যে সে মিথ্যা কথা এবং এক জাল পত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে। মন্ত্রী পরিচয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; কিন্তু আচরণে চণ্ডালের অধম।

আগেই বলিয়াছি, ট্রাজিডির খল-চরিত্র কোন গোপন স্বার্থের বশবর্তী হইয়া নায়ক কিংবা নায়িকার করুণ পরিণতি অনিবার্য করিয়া তুলে। কিন্তু এখানে মন্ত্রীর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল, তাহা নহে; তিনি রাজ্যের স্বার্থই দেখিয়াছেন, তবে রাজার উপরও তাহার রাজ্যের স্বার্থ বড় হইয়াছে। তাহার চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব।

সংস্কৃত নাটকের মন্ত্রীর চরিত্র এই আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাঁহারা স্বভাবতই বিচক্ষণ, কিন্তু তথাপি ব্যক্তিত্বহীন এবং রাজা ও রাজ-পরিবারের সকলেরই মঙ্গলাভিলাষী, সুতরাং এই মন্ত্রী চরিত্রের মধ্যে মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য নাটকের রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিত্ব

সম্পন্ন মন্ত্রী চরিত্রেরই প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। ধনদাস এবং মদনিকা গৌণভাবে এই নাটকের ট্রাজিক পরিণতির মূল; কিন্তু মন্ত্রী মুখ্যভাবে ইহার ট্রাজিডি সংঘটিত হইবার কারণ। সুতরাং খল-চরিত্র হিসাবে তাহার কার্যকারিতা এই নাটকে অধিক বলিয়া অনুভূত হইবে। তথাপি তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ইহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া, তাহার খল-প্রকৃতি তত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ধনদাসের চরিত্র এই নাটকের অন্যতম খল-চরিত্র। পূর্বেই বলিয়াছি, ধনদাসকে নাট্যকার 'সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (১১১)। কিন্তু তাহার আচরণ সর্বত্র ইহার বিরোধী। তাহার প্রথম পরিচয় বারনারী বিলাসবতীর মুখে এই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে:

ধনদাস

> তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম নষ্ট করালে? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবু ধর্মপথে ছিলেম;··· ১১২

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক দুঃখী লোকের মেয়ের সর্বনাশ করা তাহার কাজ। সুতরাং ইহা 'সদ্বংশ জাত ক্ষত্রিয়ে'র কাজ নহে। ইহা খল-চরিত্রেরই যথার্থ কাজ হইতে পারে। প্রতারণা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। বিলাসবতীকে ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া আনিয়া সোনার পিঞ্জরে রাখিয়া অর্থ সংগ্রহও তাহার পাপ-ব্যবসায়ের অন্তর্গত হইয়াছে। বিলাসবতীর উপর রাজা জগৎ সিংহের এমন অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে বিলাসবতীর উপর তাহার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। সেইজন্য এখন কৌশলে রাজার দৃষ্টি অন্য দিকে আকৃষ্ট করিয়া বিলাসবতীর উপর তাহার নিরঙ্কুশ অধিকার পুনরায় স্থাপন করিতে সে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অর্থ-লালসা এবং রূপ-লালসা এই দুইটি তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য; সেইজন্য বিলাসবতীকেও সে রাজার হাতে সম্পূর্ণ তুলিয়া দিতে পারে না, বিশেষত বিলাসবতী

রাজার প্রতি সুগভীর আসক্তিবশত তাহাকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেইজন্য রাজার লক্ষ্য অন্যদিকে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সে এমন এক সুচতুর কৌশল অবলম্বন করিল যে রাজার দৃষ্টি কৃষ্ণকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাহার সঙ্গে তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে বিলাসবতীর প্রতি উদাসীন করিতে চাহিল। ধনদাস সুচতুর ; কিন্তু বিলাসবতীর পুরুষবেশী সহচরী মদনিকাকে সে চিনিতে পারিল না, তাহা তাহার চরিত্রের এই পরিচয় অনুযায়ী নহে।

শেষ পর্যন্ত রাজা ধনদাসের কৌশল বুঝিতে পারিয়া তাহার দণ্ড দিলেন, সে শাস্তি ভোগ করিয়া অনুতপ্ত হইল। পাপীর দণ্ডভোগের যে সনাতন ধারা আছে, তাহাতেই সে নিক্ষিপ্ত হইল। চরিত্রটির মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত নীতিশিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে। মধুসূদন ধনদাস সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. ধনদাস তাহার বাক্যে কিংবা আচরণে ইয়াগোর ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই।

জয়পুরের রাজা জগৎ সিংহের চরিত্রটি তাহার রাজমর্যাদা অনুযায়ী সৃষ্ট হইতে পারে নাই। মধুসূদন তাঁহাকে এক পত্রে তাঁহার বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাকে ইতিহাস অনুযায়ী চিত্রিত করিয়াছেন এবং ইতিহাসে তিনি তাহাকে 'a somewhat silly and voluptuous fellow' রূপে পাইয়াছেন। কিন্তু টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'র কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গে তাহার চরিত্র যতটুকু স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে এই পরিচয় অনুযায়ী কিছুতেই মনে হইতে পারে না। বরং তাহাতে তাহার একটি অত্যন্ত সক্রিয় অংশ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ব্যক্তিত্বেরও তাহাতে কোন অভাব বোধ হইবে না। মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের নায়ক চরিত্রের অনুরূপ করিয়া জগৎ সিংহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইতিহাস অনুযায়ী সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

জগৎ সিংহ

জগৎ সিংহ বিলাসবতীর উপর আসক্ত থাকা সত্ত্বেও ধনদাসের নিকট হইতে কৃষ্ণকুমারীর চিত্রপট দেখিবামাত্র 'এমন রূপ আমি কখনও দেখি নাই' বলিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়া তাহার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তিনি রাজকার্যে উদাসীন, কৃষ্ণকুমারীর চিত্রপট দেখিবার পর হইতে বিলাসবতীকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করিবার জন্য মানসিংহের বিরোধী পক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের নায়ক-চরিত্রের প্রভাবই তাহার উপর সর্বত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সকল রাজমর্যাদা বিসর্জন দিয়া তিনি বারনারী বিলাসবতীর পদধারণ করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে সাধারণ নাগর জনোচিত আচরণ করিয়াছেন। তিনি রাজপুত রাজা হওয়া সত্ত্বেও সুদৃঢ়ভাবে তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে কিংবা সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিতে কখনও দেখা যায় না। বরং তাঁহাকে বারনারীর প্রমোদকক্ষে সাধারণ নাগরের বেশেই বেশী দেখা গিয়াছে। শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের ছায়ায় মধুসূদন এখানে রাজপুত ক্ষত্রিয় বীর চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন, এবং শৌর্যবীর্যের মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ করিতে পারেন নাই। বিলাসবতী তাঁহার প্রতি আন্তরিক আসক্ত হইলেও জগৎ সিংহ তাহার প্রতি বহুপত্নীক রাজার মতই ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাদের সকলই সংস্কৃত নাটকের প্রভাবের ফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে এই নাটকে মদনিকার চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা সক্রিয়। তবে এই নাটকে তাহার অর্ধেক আচরণ পুরুষের ছদ্মবেশেই

মদনিকা

সে নিষ্পন্ন করিয়াছে, সুতরাং আনুপূর্বিক স্ত্রীচরিত্র-রূপে তাহার চরিত্রকে কল্পনা করা যায় না। তাহার চরিত্রের অতি-পৌরুষেয় ভাব যে সেক্সপীয়রের নাটকের প্রত্যক্ষ ফল, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। রাজপুত সমাজ জীবনের সঙ্গে তাহার সহজ সামঞ্জস্য স্থাপন যে সম্ভব হইয়াছে, তাহা মনে

হইতে পারে না। বারাঙ্গনার সহচরী রূপে তাহার চরিত্রের গতিবিধির স্বাধীনতা স্বাভাবিক হইতে পারে, তথাপি পুরুষ বেশে তাহার অবাধ গতি অতি রোমান্টিকতার পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। সে সুচতুরা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী বলিয়া নাট্যকার কল্পনা করিয়াছেন। মধুসূদন বলিয়াছেন, 'Madanika is my favourite'; ইতিহাসের কোন বন্ধন ইহাতে স্বীকার করিতে হয় নাই বলিয়া মধুসূদনের কবি-কল্পনা এখানে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে; চরিত্রের অবাস্তবতাও অনেক সময় পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। তাহার কৌশলে মরুদেশের রাজা মানসিংহ কৃষ্ণকুমারীকে চোখে না দেখিয়াই লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, উদয়পুরের রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীও মানসিংহকে চোখে না দেখিয়াই তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল, উভয় রাজ-পরিবারে সমানভাবে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়া সে কাহিনীর অগ্রগতিতে এক অতি সক্রিয় অংশ লইয়াছে। কিন্তু সে পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যখন ধনদাসকে প্রতারণা করিয়াছে, তখনই তাহার পরিকল্পনা সর্বাধিক অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে। ধনদাস অপেক্ষাও সে ধূর্ত, এই কথাই এখানে নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন। পুরুষের ছদ্মবেশে সে যখন ধনদাসের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করিয়াছে, তখন কাহিনীর করুণ রসের নিবিড়তা যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা নাটকের অন্যতম একটি ত্রুটি বলিয়া মনে হইবে।

মদনিকা কৃষ্ণকুমারীর সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইলেও তাহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্না, বারবার তাহার ক্রূর সঙ্কল্পের মধ্যে তাহার এক সহানুভূতির ভাব প্রকাশ করিয়াছে। মদনিকা নামটির মধ্যে যেমন মধুসূদন সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটকের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন, তেমনই বিলাসবতীর সঙ্গে তাহার ব্যবহারে সংস্কৃত নাটকের সহচরীর ভাবও অনেক সময় প্রকাশ পাইয়াছে।

বারাঙ্গনা বিলাসবতীর চরিত্র মধুসূদন শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিকা' নাটকের বসন্তসেনার অনুকরণে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন;

কিন্তু বসন্তসেনার মধ্যে প্রেম, ত্যাগ এবং শেষ পর্যন্ত তাহার আত্মোৎসর্গের যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, বিলাসবতীর মধ্যে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বিলাসবতী নামটি মধুসূদন বাণভট্টের 'কাদম্বরী' গদ্যনাট্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই আদর্শে তাহার চরিত্র গড়িবার তাহার কোন অভিপ্রায় ছিল না।

বিলাসবতী

ধনদাসের কথায় শুনিতে পাওয়া যায়, বিলাসবতী অতি দরিদ্র অবস্থায় ছিলেন, তাহার উপকারের ফলেই সে ইন্দ্রাণীর সুখভোগ করিতেছে। কিন্তু বিলাসবতী ধর্মপথ পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া অনুতপ্ত। এই নাটকে বিলাসবতী প্রেমিকা মাত্র, জগৎ সিংহের প্রতি তাহার প্রেমে নিষ্ঠা আছে। তাহার চরিত্র যথাযথ সক্রিয় নহে, তাহার স্বার্থে সক্রিয়ভাবে যাহা করিবার, তাহা মদনিকাই করিয়াছে। সেইজন্য বিলাসবতীর চরিত্রটি মদনিকার ছায়ায় অনেকখানি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভীমসিংহের মহিষী অহল্যার চরিত্র টডের রাজস্থানের কাহিনীতে যেমন প্রধান অংশ গ্রহণ করে নাই, মধুসূদনের নাটকেও তাহা করিতে পারে নাই। অথচ তাহার কন্যার দুর্ভাগ্যের কথা বিচার করিলে তাহারও ইহাতে একটি প্রধান অংশ থাকিবার কথা ছিল। একমাত্র সন্তান কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু তিনি অসহায় ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, রাজ্যের মহিষী হইয়াও তাহা প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। প্রতি মুহূর্তে কন্যার জীবনের আশঙ্কায় তিনি চমকিত হইয়াছেন। বাঙ্গালী জননীর সন্তানস্নেহবোধ তাঁহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, রাজপুত রমণীর চরিত্র তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। এই নাটকে কৃষ্ণকুমারী এবং তাহার জননীর মৃত্যু হইলেও জননী সেই পরিমাণে প্রাধান্য পান নাই। পূর্বেও বলিয়াছি, অহল্যা নামটি টডের রাজস্থানে নাই, কিন্তু চরিত্রটি আছে। মধুসূদন অহল্যা নামটি যোগ করিয়াছেন।

অহল্যা

তৃতীয় অধ্যায়

গ। সামাজিক প্রহসন

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে প্রহসন রচনার প্রবর্তক এবং তিনি এই বিষয়ে এমন এক শক্তিশালী ধারা স্থাপন করিয়াছিলেন যে প্রায় পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর কাল বাংলা সাহিত্যে তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়। মধুসূদন কোন পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করেন নাই সত্য, কিন্তু প্রহসন দুইখানির মধ্যেই তাঁহার সেই যুগের সমাজ-দর্শনের রূপ প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহাদেরই প্রেরণায় পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছেন। দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ রচনা 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর উপর মধুসূদনের প্রহসনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরোধেই মধুসূদন প্রহসন দুইখানি রচনা করিয়াছিলেন, এই কথা সত্য। তবে তাঁহারা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যেই ইহাদিগকে রচনা করিবার পরামর্শ দিলেও নানা কারণে ইহারা সেখানে অভিনীত হয় নাই। অন্যত্র অভিনীত হইয়া প্রশংসিত হইয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে যে কয়খানি প্রহসন শ্রেণীর রচনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদের একটিও পাশ্চাত্ত্য আদর্শে সুসংহত কাহিনীবদ্ধ হইয়া রচিত হয় নাই। রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত প্রহসন শ্রেণীর রচনা 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটক' যথার্থ প্রহসন যেমন নহে, তেমনই পাশ্চাত্ত্য আদর্শেও রচিত নহে। প্রহসনের পাশ্চাত্ত্য আদর্শ বলিতে প্রধানত ফরাসী সাহিত্যে রচিত প্রহসনের কথাই বুঝায়। কারণ, ফরাসী সাহিত্যে রচিত প্রহসন সে যুগে সকল

দেশের সাহিত্যের প্রহসনের আদর্শ হইয়াছিল। মধুসূদনও তাঁহার প্রহসন রচনায় ফরাসী সাহিত্যের প্রহসনের দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর জীবনের উপর ফরাসী প্রহসন রচনার রীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে আরও বহু প্রহসন রচয়িতা বাংলা সাহিত্যে এই পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অমৃতলাল বসু উল্লেখযোগ্য।

*

এক । 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' (১৮৬০)

নব্য বাংলার বাস্তব স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করিয়া মধুসূদন তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনখানি রচনা করেন। ইহাতে সমসাময়িক কলিকাতার নাগরিক জীবনের একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। মধুসূদন এই সমাজ-জীবনের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন; সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে কিছুই অতিরঞ্জন কিংবা কল্পনার সংমিশ্রণ ছিল না। সেইজন্য যে জীবন এবং চিত্র ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যেমন শক্তিশালী, তেমনই জীবন্ত। তবে কোন কোন বিষয়ে মধুসূদনের যে অজ্ঞতা না ছিল, তাহাও নহে; কেবলমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রে চিত্রগুলি অবাস্তব হইয়াছে।

কেহ মনে করিয়াছেন, মধুসূদন কোন জীবিত চরিত্রকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার প্রহসন দুইখানি রচনা করিয়াছেন। তাহা সত্য হইতে পারে, ইহাও সেই চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার অন্যতম কারণ। কিন্তু তাহার ফলেই বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যোক্তাগণ ইহার অভিনয় করিতে শেষ পর্যন্ত অসম্মত হইয়াছিলেন। ইহাদের রুচিবোধও মধুসূদনের অন্যান্য নাটকগুলির অনুরূপ ছিল না। মধুসূদনের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালব্ধ রুচি এবং নীতিবোধ ইহাতে বিসর্জিত হইয়াছিল। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই:

কর্তা মহাশয় পরম বৈষ্ণব, তিনি অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনেই বাস করেন। পুত্র নববাবু কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশোনা করিয়া থাকেন। নববাবু বিবাহিত, তাহার স্ত্রীর নাম হরকামিনী। নববাবু তাঁহার কয়েকজন ইয়ার বন্ধু লইয়া 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, সভার উদ্দেশ্য মদ্যপান ও বারবনিতা সঙ্গ। একবার কর্তা মহাশয় বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। নববাবুকে সর্বদা চোখে

চোখে রাখেন ; সেইজন্য নববাবুর পক্ষে সভায় যাতায়াত করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। কালীবাবু নববাবুর ইয়ার বন্ধু, তুল্য মদ্যপ। তিনি কর্ত্তা মহাশয়কে বলিয়া নববাবুকে একদিন 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় লইয়া গেলেন। কর্ত্তাবাবুর একটু সন্দেহ হইল, তিনি তাঁহার একজন অনুচর বৈরাগীকে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় নববাবুর সন্ধান লইতে পাঠাইলেন। বৈরাগী গিয়া দেখিল, সেখানে গণিকাদিগের বাস। নববাবু উৎকোচ দিয়া বৈরাগীর মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। অধিক রাত্রে মদ্যপান করিয়া নেশার ঝোঁকে আবোল-তাবোল বকিতে বকিতে নববাবু গৃহে ফিরিলেন। কর্ত্তা মহাশয় দেখিয়া সমস্তই বুঝিলেন এবং পরদিনই কলিকাতার বাস উঠাইয়া দিয়া সকলকে লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

প্রায় অনুরূপ বিষয় লইয়া ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গদ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল ; কিন্তু এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া প্রহসন রচনা বাংলা সাহিত্যে এই সর্বপ্রথম। অবশ্য এইকথা স্বীকার করিতেই হয় যে, উক্ত গদ্য রচনাগুলির মধ্যেও প্রহনের অনেক গুণ বর্ত্তমান ছিল এবং তাহাদের কোনটিই পূর্ণাঙ্গ প্রহসন না হইলেও অনুরূপ বিষয়বস্তু লইয়া বাংলা সাহিত্যে প্রহসন রচনা করিবার পথ ইহারাই প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ইহাদের প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই যে বাবু চরিত্রটি প্রাধান্য লাভ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া তখনকার কলিকাতার সমাজ জীবনের একটি বিশেষ রূপ প্রকাশ করিয়াছে, মধুসূদনের নববাবু চরিত্রও তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে।

প্রত্যক্ষদৃষ্ট সমসাময়িক কলিকাতার নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়াই মধুসূদন তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন রচনা করিয়াছেন। মধুসূদনের মধ্যে বাস্তব জীবনানুভূতি যে কত প্রবল ছিল, তাহা তাঁহার এই দুইখানি প্রহসন হইতেই জানিতে পারা যাইবে। এই বিষয়টি বিশ্লেষণ

করিবার জন্য ইহাদের একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

নববাবুকে অবলম্বন করিয়াই এই প্রহসন। নববাবু 'ইয়ং বেঙ্গলে'র যোগ্য প্রতিনিধি; তিনি 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা। এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধু কালীবাবু বলেন, 'আমাদের কলেজ থেকে কেবল ইংরেজি চর্চা হয়েছিল, তা' আমাদের জাতীয় ভাষা ত কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্য স্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।' সমসাময়িক কোন অনুরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করিয়াই মধুসূদন 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র উদ্দেশ্য এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সভার এক অধিবেশনে নববাবু যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার ভিতর দিয়াই 'ইয়ং বেঙ্গলে'র মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

> 'জেণ্টেল্‌ম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি, আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে; জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা, মন এক করে এ দেশের সোসিয়াল রিফরমেশন যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।
>
> জেণ্টেস্‌ম্যান, তোমাদের মেয়েদের এডুকেট কর,—তাদের স্বাধীনতা দাও—জাতিভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দাও—তা হ'লে এবং কেবল তা হ'লেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে,—নচেৎ নয়।'

যাই হউক, বক্তৃতা শেষে নববাবু 'লেট অস্ এঞ্জয় আওয়ার-সেল্‌ভস্' বলিয়া মদ্যপান ও বারবনিতাসঙ্গ দ্বারা সভার কার্য শেষ করিলেন।

তারপর নববাবুর আর এক দৃশ্য। তিনি মদ্যপান করিয়া রাত্রে গৃহে ফিরিলেন, ইহার পূর্বে একদিন তিনি এই অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া

বয়স্থা ভগিনীকে চুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এতে দোষ কি? সাহেবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?' তাহার পর হইতে বাড়ীর মেয়েরা তাহার সম্মুখে বাহির হয় না। স্ত্রী পর্যন্ত তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া যান। মত্ত অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সে দিনও সে বারবনিতার মত ব্যবহার করিল, পিতাকে 'মদ ল্যাও' বলিয়া ডাকিল।

সকল দিক দিয়া নববাবুর চরিত্রটি নাট্যকার বাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন, এই চরিত্রটিই পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে একটি শিক্ষিত মাতাল চরিত্রসৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হইবে যে, নববাবু সে যুগের নব্য শিক্ষিত সমাজের একজন প্রতিনিধি মাত্র, তাহার ভিতর দিয়া বিশিষ্ট কোন পরিচয় রূপ লাভ করিতে পারে নাই; মধুসূদনের এই নির্বিশেষ চরিত্রটিকে অবলম্বন করিয়াই দীনবন্ধু তাঁহার নিমচাঁদের বিশিষ্ট রূপ দিয়াছেন। প্রহসন রচনায় মধুসূদনের একটি প্রধান গুণ—তিনি তাঁহার চিত্রগুলিকে অতিরঞ্জিত করেন নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র কোন চিত্রই অতিরঞ্জিত নহে; এই সম্পর্কে ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন, 'ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদের জানিত কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।' মধুসূদন জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই নববাবুর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দীনবন্ধুর যে অতিরঞ্জনের প্রবণতা ছিল, মধুসূদনের তাহা ছিল না; সেইজন্য নব্য বাংলার একটি যথাযথ পরিচয় ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম অবস্থায় এই দেশের নব্য শিক্ষিত সমাজ যে কিরূপ বিপর্যস্ত হইয়াছিল, মধুসূদন নিজেও তাহার প্রমাণ; অতএব তাঁহার হাত হইতে নব্য বাংলার এই যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বাস্তব মূল্য অনস্বীকার্য।

নববাবুর মধ্য দিয়া নব্য বাংলার পরিচয় যেমন প্রকাশ

পাইয়াছে, তেমনই কর্তা মহাশয়ের চরিত্রের ভিতর দিয়া সেকালের সমাজের আর একটি দিকের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি ধর্মভীরু এবং পরম বৈষ্ণব, কিন্তু সেইজন্য সাংসারিক বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ নহেন। তিনি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি। পুত্রের চরিত্রে তাঁহার প্রথম হইতেই সন্দেহ হইতেছিল। কারণ, তিনি বৃন্দাবনবাসী হইলেও জানেন, 'এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই।' এই জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি সকলকে লইয়া বৃন্দাবন চলিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। পিতা ও পুত্রের চরিত্রের মধ্যে যে একটি সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই ক্ষুদ্র প্রহসনখানির নাট্যিক গুণ বর্ধিত হইয়াছে। কর্তা মহাশয়ের চরিত্র-পরিকল্পনাও মধুসূদনের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল বলিতে হইবে; কারণ, তাঁহার মধ্য দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই দেশীয় একটি বিশিষ্ট সামাজিক চরিত্রের রূপ প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় চরিত্রের সর্বশেষ পরিচয়, ইহার পরই নববাবুর যুগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে বাধা দিবার জন্য আর সমাজে কেহ তখন অবশিষ্ট ছিল না।

অন্যান্য পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে পুলিশ সার্জেণ্টের চরিত্রটি বড় জীবন্ত হইয়াছে। চোর সন্দেহে বৈরাগীকে ধরিয়া তাহার ঝুলি হইতে সে চারিটি টাকা পাইয়া তাহা আত্মসাৎ করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে অব্যাহতি দিল। তাহার কথাবার্তা ও আচরণের মধ্য দিয়া লেখকের যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। দুইটি মুসলমান মুটিয়ার ভাষায় আলালী ভাষার প্রভাব অনুভব করা যায়।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র স্ত্রী-চরিত্রগুলির কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে নববাবুর স্ত্রী হরকামিনী এবং তাহার বিবাহিত ভগিনী প্রসন্নময়ীই প্রধানা। একটি দৃশ্যে চারিটি যুবতীর তাস খেলার চিত্রটি বড়ই বাস্তব হইয়াছে। তাস খেলায় অভিজ্ঞতার দিক দিয়া নাট্যকার চারিটি চরিত্রকেই একাকার করিয়া ফেলেন নাই, ইহাতে প্রত্যেকের নিজস্ব এক

একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নৃত্যকালী পাকা খেলোয়াড়, কমল একেবারে কিছুই নয়, প্রসন্ন এবং হরকামিনী মাঝামাঝি ; কথাবার্তার ভিতর দিয়া ইহাদের মুখভঙ্গিটি পর্যন্ত যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ইহাদের কাহাকেও চিনিতে ভুল হয় না। এই পরিবারটির কর্তা মহাশয় পরম বৈষ্ণব, পুত্র পাঁড় মাতাল, যুবতী বধূ ও কন্যাগণ তাস খেলিয়া আলস্যে সময় অতিবাহিত করে—অপরিসর রচনার ভিতর দিয়াও মধুসূদন ক্ষুদ্র পরিবারটির জীবনের এই বৈচিত্র্যগুলি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদনের একটি প্রধান গুণ এই যে, তাঁহার প্রহসনের মধ্যে নীতিকথাটি অত্যন্ত গৌণ হইয়া পড়িয়া ইহার বাস্তব রসটিই উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, নতুবা তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকার রামনারায়ণ কৌলীন্যের দোষ কীর্তন করিয়া নাটক রচনা করিতে গিয়া বারবার বল্লালের নাম করিয়া অভিসম্পাত দিয়াছেন ; মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে তাহার কিছু-ই করেন নাই। যদিও মদ্যপানের কুফল প্রদর্শনই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিশিষ্ট উদ্দেশ্য, তথাপি এই প্রহসনের কোথাও এই বিষয়ক কোন বক্তৃতা নাই, কেবল মাত্র নাট্যিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়াই ইহার অপকার দেখান হইয়াছে। এই বিষয়ে রামনারায়ণ হইতে মধুসূদন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর শিল্পী। মধুসূদন যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালীর সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন ; সেইজন্য ইহার পারিবারিক জীবন-সম্পর্কে তাঁহার পরিণত অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। তাহারই ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ননদ-ভাজ প্রসন্নময়ী ও হরকামিনীর কথাবার্তার ভিতর দিয়া স্বাভাবিক শালীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহাদের ব্যবহার এবং কথাবার্তা কোন কোন স্থলে অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত হইয়াছে। পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মধুসূদনের এই দোষটি অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যেও ননদ-ভাজের অনুরূপ কথোপকথনের ব্যবহার করিয়াছেন।

ইহাতে তাঁহার প্রহসনগুলির নৈতিক আবহাওয়া অনেকটা দূষিত হইয়াছে; কিন্তু মধুসূদনের চিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহা সমগ্রভাবে তাঁহার প্রহসনের নৈতিক আবহাওয়া বিনষ্ট করিতে পারে নাই।

হরকামিনীর চরিত্রটিও দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নায়িকা কুমুদিনী চরিত্রের অগ্রদূত। হরকামিনী মাতাল স্বামীকে গৃহমধ্যে মূর্ছিত দেখিয়া যে বলিয়াছিল, 'এই কলকাতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, তার সীমা নাই'—ইহাই দীনবন্ধুকে 'সধবার একাদশী'র প্রেরণা যোগাইয়াছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র একটি প্রধান গুণ এই যে উদ্দেশ্য-মূলক রচনা হইয়াও ইহার মধ্যে মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে করে নাই—কাহিনীটিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অবশ্য নিতান্ত অপরিসর রচনা বলিয়া চরিত্রগুলি সম্যক্ বিকাশলাভ করিতে না পারায় ইহার রসস্ফূর্তি সম্ভব হয় নাই। তথাপি নূতন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া ইহা সর্বপ্রথম প্রহসন রচনা বলিয়া ইহার স্থান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে যে পত্রে একখানি প্রহসন রচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে উল্লেখ করিয়াছিলেন,—'I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the 'Shermistha' and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both at the same time and with the same actors'.

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র কোন বিষয় লইয়া প্রহসন রচনা করিতে হইবে, তাহাও সুনির্দিষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার ভাষায় একটি গার্হস্থ্য জীবনভিত্তিক প্রহসন রচনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মধুসূদন 'একেই কি বলে

সভ্যতা'য় যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র গার্হস্থ্য কিংবা পারিবারিক জীবনাশ্রিত কোন রচনা তাহা বলিতে পারা যাইবে না। বাংলার একটি সমসাময়িক বৃহত্তর সমস্যা ইহার অবলম্বন হইয়াছিল।

গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবনাশ্রিত প্রহসন বলিতে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণভাবে সামাজিক প্রহসনই মনে করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যে যে সকল প্রহসন প্রচলিত ছিল, তাহা যদি রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মনঃপূত হইত, তবে তিনি মধুসূদনকে নূতন কোন প্রহসন রচনার জন্য স্বভাবতঃই অনুরোধ করিতেন না। সুতরাং রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটক'ই হোক, কিংবা উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' হোক, কিংবা প্রচলিত অন্য কোন প্রহসনই হোক, তাহাদিগের মধ্যে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মতে অভিনয়-যোগ্য কিছুই ছিল না। এমন কি, দেখা গেল 'একেই কি বলে সভ্যতা'ও যখন রচিত হইল, তখন ইহাও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অভিলাষ অনুযায়ী বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইল না। সুতরাং গার্হস্থ্য কিংবা পারিবারিক জীবনবিষয়ক যে প্রহসন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র অভিনয় করিতে চাহিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহা রচনা করিতে পারেন নাই বলিয়াই ইহার অভিনয় বেলগাছিয়া নাট্যশালায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইবে।

※

দুই। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)

'একেই কি বলে সভ্যতা'র পর মধুসূদনের অন্যতম প্রহসন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়। তাঁহার পূর্ববর্তী প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে কোনও নীতি-প্রচারমূলক উদ্দেশ্য থাকিলেও, ইহার মধ্যে দৃশ্যত তেমন কিছু নাই; তবে তৎকালীন সমাজের এক শ্রেণীর বকধার্মিককে উপলক্ষ্য করিয়া যে ইহা রচিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য এই শ্রেণীর বকধার্মিক সেই যুগেই যে শুধু বর্তমান ছিল, এই যুগে নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না; ইহা একদিন ছিল এবং চিরদিনই থাকিবে। সেইজন্য তাঁহার এই প্রহসনখানির নিত্যকালীন মূল্য আছে। মানব-প্রকৃতি চিরদিনই এক, বাহির হইতে সামাজিক নীতি ও ধর্ম সর্বদাই তাহাকে চোখ রাঙ্গাইতে থাকিলেও, সে অন্তরের ভিতর তাহাদের শাসন কোনদিনই স্থায়ী ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। এই প্রহসনখানির ভিতর দিয়া মানব-প্রকৃতির এমনই একটি চিরন্তন দুর্বলতার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার মূল্য তাঁহার পূর্ববর্তী প্রহসনখানি অপেক্ষা অধিক। কিন্তু এই কথা মধুসূদনের অনেক সমালোচকই স্বীকার করেন নাই। এখানে প্রহসনের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে:

ভক্তপ্রসাদবাবু একজন প্রাচীন ব্যক্তি, তাঁহার ধনের অভাব নাই; কিন্তু তিনি কৃপণ ও পরপীড়ক। হানিফ গাজি তাঁহার একজন মুসলমান রায়ৎ, অজন্মায় তাহার ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সে বৎসরের পুরা খাজনা শোধ করিতে পারিতেছে না, সামান্য কিছু শোধ করিয়া অবশিষ্ট অংশের জন্য তাঁহার নিকট মাফ চাহিতেছে, তিনি মাফ করিতে চাহিতেছেন না। এমন সময় গদাধর নামক ভক্তপ্রসাদের একটি অনুচর তাঁহার কানে কানে জানাইল যে, হানিফের গৃহে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী

আছে, সে চেষ্টা করিলে তাহাকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিতে পারে। শুনিয়া ভক্তপ্রসাদ হানিফের খাজনার অবশিষ্ট অংশ মাফ করিয়া দিলেন।

গদাধর ভক্তপ্রসাদের পুঁটি নাম্নী এক কুট্টিনীকে হানিফের স্ত্রীর নিকট পাঠাইল। হানিফের স্ত্রীর নাম ফতেমা। ফতেমা তাহার স্বামীকে ইহা জানাইয়া দিল। শুনিয়া হানিফ ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল। বাচস্পতি গ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তিনি স্ত্রীর শ্রাদ্ধের জন্য ভক্তপ্রসাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভক্ত তাঁহাকে মাত্র পাঁচটি টাকা দিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। বাচস্পতি হানিফের নিকট হইতে ভক্তপ্রসাদের কুমতলবের কথা জানিতে পারিলেন; শুনিয়া তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য হানিফের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এই পরামর্শক্রমে একদিন রাত্রিকালে ফতেমা পুঁটির সঙ্গে এক নির্জন শিবমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল, হানিফ ও বাচস্পতি প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদের অনুসরণ করিল। ভক্তপ্রসাদের সেই স্থলে ফতেমার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইবার কথা। যথাসময়ে নাগর সাজিয়া ভক্তপ্রসাদ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন—ফতেমার প্রতি তিনি তাঁহার প্রণয়-নিবেদন করিলেন, এমন সময় হানিফ গোপন স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভক্তপ্রসাদকে কিছু উত্তম মধ্যম দিল—বাচস্পতি আসিয়াও সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। ভক্তপ্রসাদের লজ্জার আর সীমা রহিল না। তিনি হানিফ ও বাচস্পতিকে টাকা দিয়া মুখ বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন কুকাজ প্রাণ থাকিতে আর কোনদিন করিবেন না।

এই কাহিনীটি সম্বন্ধে মধুসূদনের জীবনী-লেখক স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, 'মধুসূদন "একেই কি বলে সভ্যতা"র ন্যায় "বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ"ও তাঁহার কোন কোন পরিচিত ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ভক্তপ্রসাদরূপে কল্পিত হইয়াছেন,

হানিফ গাজি, পাঁচী তেলিনী প্রভৃতি নামগুলিও তাঁহার স্বগ্রামের কোন কোন স্ত্রীপুরুষের নাম হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল।'

প্রহসনের মধ্যে ভক্তপ্রসাদের চরিত্রটিই প্রধান। ভক্তপ্রসাদ প্রজাপীড়ক জমিদার, বিগত শতাব্দীর বাংলার পল্লীগ্রামস্থ ভূস্বামীদিগের একটি ক্ষুদ্র আদর্শ। দরিদ্র প্রজা হানিফ গাজি দেশে অজন্মার জন্য তাহার দেয় এগার সিকে খাজনার পরিবর্তে তিন সিকে দিতে চায়। সেইজন্য তাহাকে তিনি জমাদারের জিম্মায় পাঠাইয়া দিতেছেন। কিন্তু ভক্তপ্রসাদের একটি দুর্বলতা ছিল, এই দুর্বলতার কথা তাঁহার অন্তরঙ্গ গদাধর জানিত। হানিফ যখন নিষ্কৃতির জন্য গদাধরের শরণাপন্ন হইল, গদাধর তখন ভক্তপ্রসাদের দুর্বলতাটুকুর সুযোগ লইতে মনস্থ করিল। সে গিয়া ভক্তপ্রসাদকে বলিল, হানিফ গাজি এইবার এক সুন্দরী যুবতীকে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। তাহার 'বয়স বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে হয়নি, আর রং যেন কাঁচা সোনা।' ভক্তপ্রসাদ বাহিরে মালা জপিয়া চলিলেন, মনে মনে একটি কুৎসিত সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ হানিফকে ডাকিয়া তাহার বকেয়া খাজনা মাফ করিয়া দিলেন, তাঁহার কু-অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া দিবার ভার গদাধরের উপর অর্পণ করিলেন।

স্বর্গত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ভক্তপ্রসাদ সম্পর্কিত উক্ত পরিকল্পনাকে অসম্ভব বলিয়া মধুসূদনের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান আপত্তি হইয়াছে, 'গোঁড়া হিন্দুরা অপরাপর অপকর্মে রত হইলেও জাতিভ্রংশকর যবনী-সংযোগে কখনই ওরূপ ব্যগ্র হন না।' কিন্তু ইহা সত্য নহে। লম্পটের নিকট 'জাতিভ্রংশকর' বলিয়া কিছু নাই। ভক্তপ্রসাদের মত ভণ্ডের একটি চরম পরিচয় প্রকাশ করিবার জন্যই মধুসূদন এখানে তাঁহার সম্পর্কে মুসলমান কৃষক-রমণীর কথা আনিয়াছেন। ইন্দ্রিয়পরবশ ব্যক্তির কোন প্রকার ধর্মাধর্মজ্ঞান থাকে না; অতএব এই চরিত্রটির স্বাভাবিকতায় সন্দিগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই। বিগত শতাব্দীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ

মুসলমানের নাম শুনিবা মাত্র শিহরিয়া উঠিতেন, মধুসূদনের শিক্ষা ও সংস্কার এই মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল বলিয়াই তিনি এখানে নির্বিচারে এই মুসলমান কৃষক নারীর চরিত্রটি আনিয়া যোগ করিয়াছেন। ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্যের চরম অবস্থা বর্ণনা করিবার পক্ষে এখানে এই চরিত্রটি নিঃসন্দেহে পরম সহায়ক হইয়াছে বলিতে হইবে।

ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে হানিফ গাজির চরিত্রটি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার মুখের ভাষার ভিতর দিয়া, তাহার রূপটি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে দরিদ্র কৃষক, খাজনা অনাদায়ের জন্য জমিদারদের নিকট সে হাত যোড় করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য সেই অন্যায়কারী জমিদারের গায়েও হাত তুলিতে তাহার বাধে নাই। তাহার মধ্যে রক্তমাংসের একটি মানুষের পরিচয় জীবন্ত হইয়া আছে। তাহার ধমনীতে রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়াছে। ফতেমার মুখ হইতে জমিদারের দুরভিপ্রায়ের কথা শুনিবামাত্র যেন তড়াক্ করিয়া তাহার মাথায় রক্ত উঠিয়া গেল, কী ভাষায় তাহার এই ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে, দেখুন,—'এমন গরুখোর হারামজাদা কি হিঁদুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারিগো জানে মাল্লে, তাগোর সব লুটে নিয়ে, তারপর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এন্‌ছাপ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়্‌বো। বেটার এত বড় মকদুর।'

কি অপূর্ব শক্তিশালী ভাষা! এই ভাষার ভিতর দিয়া ক্রুদ্ধ হানিফের মুখের ভঙ্গিটি পর্যন্ত যেন দেখা যাইতেছে, ধমনীতে তাহার উত্তপ্ত রক্তের প্রবাহ যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। হানিফ চরিত্রটি পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধুর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটকের তোরাপ নামক মুসলমান কৃষকের চরিত্রটি ইহার উপরই ভিত্তি করিয়া যে রচিত হইয়াছিল, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তোরাপের

ভাষায়ও হানিফেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। কুট্টিনী পুঁটি হানিফকে বলে, 'মিন্‌যে যেন যমের দূত।' নাট্যকার তাহার ভাষা ও আচরণের ভিতর দিয়া তাহার এই পরিচয় সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়া মধুসূদনের যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

ভক্তপ্রসাদকে শিক্ষা দিবার জন্যই বাচস্পতির পরামর্শে সে তাহার স্ত্রীকে দিয়া এক ফাঁদ পাতিল, কিন্তু ইহাতেও তাহার অন্তর সায় দিতে পারিল না—স্ত্রীকে দিয়া ফাঁদ পাতার ব্যাপারটা যেন তাহার কাছে কেমন ঠেকিতেছে। সেইজন্য সে বাচস্পতিকে বলিল, 'লেকিন আমার সাম্‌নে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখন সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টাম্মে ছিঁড়ে ফেল্‌বো।' বাচস্পতিও তাহা বুঝিলেন, 'বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়।' হানিফের চরিত্রটি নাট্যকার এইভাবে সকল দিক হইতেই জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এমন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া রচিত সজীব চরিত্র ইতিপূর্বে বাংলা নাটকে আর দেখা যায় নাই।

ফতেমার চরিত্রটি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। কুট্টিনী আসিয়া যখন তাহার নিকট ভক্তপ্রসাদের প্রস্তাবের কথা বলিয়াছে, তখনই সে স্বামীর নিকট তাহা বলিয়া দিয়াছে, ইহা হইতেই এই বিষয় সম্পর্কে তাহার মনোভাব বুঝিতে পারা যাইবে। সে দরিদ্র হইয়াও সম্মান ও ধর্মরক্ষার জন্য অর্থের লোভ সংবরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাচস্পতি এবং তাহার স্বামীর ফাঁদ পাতিবার কার্যে সহায়তা করিবার জন্য রাত চারিটার সময় ভাঙ্গা শিবমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইতেও সে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা তাহার পক্ষে কিছুই অসঙ্গত হয় নাই; কারণ, সে তাহার স্বামীর অজ্ঞাতে কিছুই করিতেছে না; এমন কি, রাত্রি চারিটার সময়ও ভাঙ্গা শিবমন্দিরের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে তাহার স্বামীও তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। সে যাহা

করিতেছে, তাহা সে তাহার স্বামীর আদেশ মতই স্বামীর সম্মুখেই করিতেছে। তথাপি নাট্যকার এই বিষয়ে যে তাহার একটি অস্বস্তিবোধ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। গভীর রাত্রে ভগ্ন শিব-মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া সে বলিতেছে, 'ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, এ বোনের মদ্দি সাপেই খাবে, না কি হবে, কিছু কতি পারি নে।' তারপর ভক্তপ্রসাদের সম্মুখে তাহার আচরণও বড় সুন্দর—একদিক দিয়া তাহার স্বামীর নির্দেশ, অপর দিক দিয়া তাহার নিজস্ব ধর্মবোধ, এই উভয়ের মধ্য দিয়া তাহার যে আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাস্তব বলিয়াই এতখানি চিত্তাকর্ষক। গভীর রাত্রে নির্জন বনমধ্যে এক ভগ্ন দেউলের সম্মুখে এক লম্পটের নিকট হইতে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য সে যে সংগ্রাম করিতেছে, তাহার চিত্রখানি নাট্যকার যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কুট্টিনীর চরিত্র হিসাবে পুঁটির চরিত্রটিও সুন্দর এবং স্বাভাবিক হইয়াছে। ইহা হইতে বাংলার পল্লীর জনসাধারণের বিচিত্র জীবন সম্পর্কেও সে মধুসূদনের কত সুগভীর পরিচয় ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দীনবন্ধুর প্রসিদ্ধ নাটক 'নীল-দর্পণে'র কুট্টিনী পদী ময়রাণীর চরিত্রটি ইহার উপরই ভিত্তি করিয়া রচিত। এমন কি, পদী ময়রাণীর মুখে যেন পুঁটিরই ভাষা পর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়।

কেবল প্রহসনখানির মধ্যে অস্বাভাবিক যদি কিছু হইয়া থাকে, তবে তাহা হানিফের ভক্তপ্রসাদকে কেবলমাত্র 'মুষ্ট্যাঘাত' করিয়াই নিষ্কৃতি দান—এখানে তাহাকে প্রায় হত্যা করিবার মত উত্তেজনার কারণ তাহার ছিল, হয়ত অন্য কেহ এই দৃশ্যে উপস্থিত না থাকিলে সে তাহাই করিত; কিন্তু গদাধর ও পুঁটি এখানেই ছিল, অবশ্য তাহা হইলে প্রহসনের লঘু পরিবেশটিও আবিল হইয়া উঠিত। ভক্তপ্রসাদের সঙ্গে হানিফের ইহার পরবর্তী আচরণটুকু যে অস্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কারণ,

তখন তাহার আর 'হাস্যমুখে' ভক্তপ্রসাদের সঙ্গে কপটতা করিবার মত মনোভাব থাকিবার কথা নহে। বিশেষতঃ তাহার চরিত্রের মধ্যেও সেইরূপ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র প্রধান গুণ এই যে, সেই যুগের অন্যান্য প্রহসনের মত ইহার মধ্যে কোন মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে নাই, সমাজ-সংস্কারের কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়াও ইহা রচিত বলিয়া অনুভূত হয় না। ভক্তপ্রসাদের যে পরিণতি ইহাতে দেখান হইয়াছে, তাহা অনুরূপ অবস্থায় সকল চরিত্রের মধ্যে সকল সময়েই সম্ভব। ভক্তপ্রসাদের প্রবৃত্তির মধ্যে একটি চিরন্তন মানবিক দুর্বলতাই প্রকাশ পাইয়াছে; ইহা সেকালে যেমন ছিল, একালেও তেমনই আছে।

এই প্রহসনখানির মধ্যে পীতাম্বর তেলীর স্ত্রী ভগী ও তাহার মেয়ে পাঁচীর একটি প্রসঙ্গ আছে—এই পাঁচীর কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটকের ক্ষেত্রমণির কাহিনীর একাংশের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ভাষা সম্পর্কেও কিছু বলা আবশ্যক। ইহার মধ্যেই বাংলা প্রহসনে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে গ্রাম্যভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। ইতিপূর্বে রামনারায়ণ 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকে' সামান্য একটি চরিত্রের মধ্যে মাত্র এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। অবশ্য 'আলালের ঘরের দুলালে'ও এই ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি এই ভাষার যে একটি নাটকীয় মূল্য আছে, তাহা মধুসূদনই সর্বপ্রথম অনুভব করিলেন। তিনি তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের মধ্যে এই গ্রাম্যভাষা এত বিস্তৃত ভাবে ব্যবহার করিবার সুযোগ পান নাই; কারণ, তাহা নাগরিক জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত; কিন্তু 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' পল্লীজীবনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত বলিয়া ইহাতেই গ্রাম্য ইতর ভাষা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই ধারাটিরই অনুসরণ করিয়া পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁহার

'নীল-দর্পণ' নাটকে এই গ্রাম্যভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। দীনবন্ধুর পরিকল্পিত গ্রাম্য চরিত্রগুলির ভাষার মধ্যে মধুসূদনের এই প্রহসনখানিরই অনুরূপ প্রকৃতির চরিত্রসমূহের ভাষার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই প্রহসনখানিই দীনবন্ধু মিত্রকে তাঁহার 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নামক প্রহসন রচনার প্রেরণা দান করিয়াছিল বলিয়া অনুভূত হয়। উভয়ের নামকরণের মধ্যেও বিশেষ বৈসাদৃশ্য নাই। মধুসূদন তাঁহার 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র প্রথম নামকরণ করিয়াছিলেন 'ভগ্নশিব মন্দির।' পরে এই নাম পরিবর্তিত হয়।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'ও বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। ইহার নিন্দিত রুচিবোধই ইহার কারণ, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তাঁহার একখানি প্রহসনও অভিনীত না হইবার ফলে মধুসূদন যে কি পরিমাণ নিরাশ হইয়াছিলেন, তাহা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত তাঁহার একটি চিঠি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি তাঁহাকে তাহাতে লিখিয়াছিলেন, 'Mind, you broke my wings once about the farces.' মধুসূদনও যে একান্ত অন্তরের প্রেরণায় ইহাদিগকে রচনা করেন নাই, তাহাও তিনি তাঁহার এক পত্রে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,…'I half regret having published those two things.' ইহাদের দ্বারা তিনি নিজেও সুখী হইতে পারেন নাই, তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগকেও সুখী করিতে পারেন নাই।

*

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। মধুমালা (১৯৩৬)
২। শব্দ ও উচ্চারণ (১৯৩৬)
৩; মনের আগুন (১৯৩৬)
৪। আজব বেদে (১৯৩৬)
৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (১৯৩৯ ; ৫ম সং যন্ত্রস্থ)
৬। *An Introduction to the Study of Medieval Bengali Epics* (1940)
৭। কাব্যসঞ্চয় (১৯৪৩, তৃতীয় সং ১৯৪৬)
৮। শিক্ষার পথে (১৯৪৬)
৯। *Early Bengali Suiva Poetry* (1950)
১০। বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল (প্রথম সং ১৯৫৪, ২য় সং ১৯৬২)
১১। বাংলার লোক-সাহিত্য প্রথম খণ্ড (১৯৫৪, তৃতীয় সং ১৯৬২)
১২। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (১৯৫৫, ৩য় সং ১৯৬৭)
১৩। রামকৃষ্ণ দাসের শিবায়ন (১৯৫৬), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৫৮, ৩য় সং ১৯৫৯)
১৫। গোপীচন্দ্রের গান (১৯৫৯, ৩য় সং ১৯৩৫)
১৬। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৯৫৯, ২য় সং ১৯৬২)
১৭। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটক' (১৯৫৯)
১৮। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত কথা (১৯৫৯, ৪র্থ সং ১৯৬০)
১৯। তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' (১৫৯৯, ২য় সং ১৯৬৪)
২০। গীতিকবি শ্রীমধুসূদন (১৯৬০)
২১। বাংলার লোকশ্রুতি (১৯৬০)
২২। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (১৯৬১)
২৩। বনতুলসী (১৯৬১)
২৪। তারকনাথ গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা' (১৯৬২, ২য় সং ১৯৬৫)
২৫। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' (১৯৬২ ২য় সং ১৯৬৩)

২৬। বাংলার লোক-সঙ্গীত, ১ম খণ্ড (১৯৬২),
২৭। সেকালের কথা ও কাহিনী (১৯৬২, ২য় সং ১৯৬৩)
২৮। বাংলার লোক-সাহিত্য, ২য় খণ্ড (১৯৬৩)
২৯। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৬৩)
৩০। যতীন্দ্রপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৬৩)
৩১। বাংলার লোক-সঙ্গীত ২য় খণ্ড (১৯৬৩)
৩২। বাংলার লোক-সঙ্গীত ৩য় খণ্ড (১৯৬৪)
৩৩। বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন (১৯৬৪)
৩৪। মহাকবি শ্রীমধুসূদন (১৯৬৪)
৩৫। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা' (১৯৬৪, ৩য় সং ১৯৬৮)
৩৬। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১৯৬৪)
৩৭। সোভিয়েতে বঙ্গ সংস্কৃতি (১৯৬৪)
৩৮। বাংলার লোক-সঙ্গীত, চতুর্থ খণ্ড (১৯৬৫), বেঙ্গল মিউজিক কলেজ প্রকাশিত
৩৯। বাংলার লোক-সঙ্গীত, ৩য় খণ্ড (১৯৬৫) —ঐ
৪০। বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর, ১ম খণ্ড, (১৯৬৬)
৪১। রবীন্দ্র-নাট্য-ধারা (১৯৬৬)
৪২। বাংলার লোক-সাহিত্য ৪র্থ খণ্ড (১৯৬৬)
৪৩। বাংলার লোক-সঙ্গীত, ৫ খণ্ড (১৯৬৬)
৪৪। বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৬)
৪৫। বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর, প্রথম ভাগ (১৯৬৬)
৪৬। বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর, ৩য় খণ্ড (১৯৬৭)
৪৭। বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর ৪র্থ খণ্ড (১৯৬৭)
৪৮। বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর, দ্বিতীয় ভাগ (১৯৬৭)
৪৯। লোক-শ্রুতি : লোক-সাহিত্য সংকলন (১৯৬৭)
৫০। নাট্যকার শ্রীমধুসূদন (১৯৬৮)